আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

(১৯১৯—বর্তমানকাল পর্যন্ত)

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,

এম. এ., এল-এল. বি., পি-এইচ্-ডি.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের তৃতীয় পত্রে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' (১৯১৯ হইতে বর্তমানকাল) পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পড়িবার কোন ব্যবস্থা এই পাঠ্যসূচীতে করা হয় নাই। বিভিন্ন দেশের বর্তমান যুগের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস না জানিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস পড়িবার ব্যবস্থা কতটা সুযৌক্তিক হইয়াছে, তাহা আমার আলোচনা-বহির্ভূত।

যাহা হউক বর্তমানে স্নাতক পরীক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর করিয়া থাকে। সেজন্য এই পুস্তকখানি রচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

যে-সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে তাহাদের কাজে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তকখানির ক্ষেত্রেও আমার সমকর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহানুভূতি পাইব ভরসা করি। পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। ইতি—

কলিকাতা,
২১শে জুলাই, ১৯৬১

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচনা

(Introduction)

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) : বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পৃথিবী—পৃথিবী কেন, সমগ্র সৌরজগৎটাই যেন স্বল্প-পরিসর হইয়া গিয়াছে। দূর আজ নিকট হইয়াছে। মহাশূন্যে মানুষ আজ কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। চাঁদে মানুষ একাধিকবার পদার্পণ করিয়া মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করিয়াছে। প্রকৃতি আজ মানুষের দাসানুদাসে পরিণত। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দেশসমূহ আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক্ দিয়া পরস্পর পরস্পর কর্তৃক প্রভাবিত। পৃথিবীর বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য, সহযোগ ও সহৃদয়তার মাধ্যমে এক বৃহত্তর সভ্যতা গড়িয়া তোলাই যদি সভ্য জগতের আদর্শ হয় তাহা হইলে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী আজ সভ্যতার চরম আদর্শের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

পৃথিবীর বিভিন্নাংশের পরস্পর নির্ভরশীলতা

সংঘর্ষ আর সমন্বয়ের পথেই অগ্রগতি সম্ভব। রুদ্ধ জলাশয়ে যেমন স্রোত নাই, জোয়ার-ভাটা থাকে না, সংঘর্ষ-বিহীন বা রুদ্ধ মানব-ইতিহাসেরও তেমনি কোন প্রবাহ বা অগ্রগতি থাকিবে না। ভাবজগৎ, বস্তুজগৎ, সর্বক্ষেত্রেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তথাপি সংশয় জাগে, মানব জাতি হয়ত বা এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখেই ছুটিয়া চলিয়াছে। নিছক যুক্তিবাদের দিক্ দিয়া বা ভাববাদী কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে সর্বজাগতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নততম, শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ, বিবাদ-বিদ্বেষহীন ঐকবদ্ধ মানবগোষ্ঠী রচনা তথা 'ঐকবদ্ধ পৃথিবী' গড়িয়া তোলাই আন্তর্জাতিকতার চরম আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে এই ভাববাদ বারবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আদর্শ তথা যুক্তিবাদীদের রচিত চিত্র বাস্তবের চিত্র অপেক্ষা ভিন্নরূপ বলিয়াই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা, নানা

সংঘর্ষ আর সমন্বয়—অগ্রগতির পন্থা

আদর্শ ও বাস্তব

সংঘাত লাগিয়াই আছে। বাস্তব জগতে কল্পনাজগৎ (Utopia) রচনা হয়ত কোনদিনই সম্ভব হইবে না। তাই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কল্পনা ও বাস্তবের যথাসম্ভব কার্যকরী সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। যুক্তিবাদকে বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত করিয়া এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ইহাই হইল প্রকৃত পন্থা।

আদর্শ ও বাস্তবের সামঞ্জস্য—আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিকতা (Individual and Internationalism): কিছুকাল পূর্বাবধি আন্তর্জাতিকতা তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা যে-কোন সাধারণ মানুষের চিন্তা বা জিজ্ঞাসা বহির্ভূত ছিল। প্রতি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিবর্গ ছিলেন এ বিষয়ের একমাত্র কর্ণধার। যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাইবার বা শান্তিস্থাপনের ক্ষমতা ছিল প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রীয় বিভাগের হস্তে, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে উহা চালাইয়া যাইবার দায়িত্ব দেশের ব্যক্তিমাত্রকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহন করিতে হইত। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ভাবিবার বা সমাধানের উপায় চিন্তা করিবার একমাত্র অধিকার ছিল পেশাদারী কূটনীতিকগণের ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের, কিন্তু বর্তমান জগতে এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ একজন সাধারণ মানুষও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক সমস্যার জটিলতা বা ফলাফল তাহার দৈনন্দিন জীবনের গতিকেও নানাভাবে প্রভাবিত ও ব্যাহত করিতে পারে। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতীয় জনসাধারণকে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির কুফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। আণবিক বোমার সর্বনাশাত্মক ফলাফলের ভীতি পৃথিবীর সকল অংশের লোককেই ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি, ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা যথাক্রমে জগৎবাসীর ঘৃণা ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতেছে। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, অবিচার, বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের অনমনীয় মনোভাব ও একচ্ছত্র আধিপত্য পৃথিবীর সর্বত্র ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ পৃথিবীর জনসাধারণের

পররাষ্ট্র বিভাগ ও কূটনীতিকগণের দায়িত্বের ধারণার পরিবর্তন

আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক

মনে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক ভিন্ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব পৃথিবীব্যাপী প্রতিফলিত হইতেছে। ব্যক্তি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড বা ভারত—যে-কোন দেশেরই হউক না কেন, আজ সে স্পষ্টভাবেই হউক আর অস্পষ্টভাবেই হউক, একথা জানে যে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার পতন, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন, ইন্দোচীনে কমিউনিজমের জয়, কমিউনিস্ট চীন ও ভারতের সৌহার্দ্য নাশ প্রভৃতি তাহার নিজস্ব এবং নিজের পারিবারিক জীবন, শান্তি, সমৃদ্ধি সব কিছুকেই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে সমর্থ। আজ পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলেক্স্ প্রভৃতির মাধ্যমে সংবাদ বিতরণ ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে জনসাধারণের মূকত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে সবাক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান ব্যপারে ব্যক্তি আজ আর অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর স্বার্থ, সমৃদ্ধি, ধনপ্রাণের নিরাপত্তা যে-সকল কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে সেগুলির যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিমাত্রেই আজ অল্প-বিস্তর সচেতন। এই সচেতনতার উপরই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের জনকল্যাণ-মূলক সমাধান নির্ভরশীল।

ব্যক্তি অসহায় দর্শক নহে—সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations) : বাঁধা-ধরা সংজ্ঞা দ্বারা কোন শাস্ত্রেরই প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বলিতে যে সঠিক কি বুঝায় তাহাও কোন সংজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বুঝাইয়া বলা সহজসাধ্য নহে। তবে মোটামুটি এবং কতকটা ব্যাপক অর্থে, জাতীয় স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহার-পদ্ধতিকে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বলা যাইতে পারে। জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতির বাহ্যিক প্রতিফলনই হইল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। এইরূপ স্বার্থ বা আদর্শ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার কার্যকলাপই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কার্যকলাপ তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আবার 'শক্তি' (Power), 'আদর্শ' (Ideology) প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে।

সংজ্ঞা

শক্তি দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণীত হইয়া থাকে এই মতবাদে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে শক্তি ব্যক্তিগত ক্ষমতা, জাতিগত ক্ষমতা, বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। মধ্য-যুগের ইওরোপীয় ইতিহাসে পোপ ও সম্রাটের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য, হিট্‌লার-মুসোলিনির একক অধিনায়কত্ব প্রভৃতি ব্যক্তিগত শক্তির প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান জাতির মধ্যে যে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাহাকে জাতীয় শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। খনিজ তৈল, কয়লা, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় সমর্থন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াও শক্তির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, দৈহিক শক্তি যথা, গোলা-বারুদ ও নানাপ্রকার মারণাস্ত্রের প্রাচুর্য হেতু অর্থাৎ এই ধরনের শক্তি অর্জনের ফলে অপরাপর অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তিবর্গের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়া যে ক্ষমতা অর্জন করা হয় তাহাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'শক্তি'র (Power) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা হইল দৈহিক শক্তির (Force) উপর নির্ভরশীল প্রাধান্য। আবার অপরাপর দেশের এবং নিজের দেশের জনসমাজকে কোন নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী চলিতে বা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারিলে যে ক্ষমতা অর্জন করা যায় তাহাও 'শক্তি'র (Power) পর্যায়ভুক্ত। নানাপ্রকার কূটচালে অপরাপর রাষ্ট্রের কার্যকলাপ অর্থাৎ পররাষ্ট্রীয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা অর্জন করা যাইতে পারে তাহাও এক ধরনের শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির (Power) প্রকাশ যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা যুদ্ধের ভীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।*

শক্তি
(Power)

কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি বা ক্ষমতার দিক দিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বিবাদ-বিসম্বাদ বিশ্লেষণ করা যায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শক্তি এবং আদর্শ এই দুইয়ের সংমিশ্রণের ফলে ঘটিয়া থাকে।† বস্তুত, শক্তি হইল রাষ্ট্রের আদর্শকে কার্যকরী করিবার উপায় মাত্র। এই উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রমাত্রেই নিজ

আদর্শ
(Ideology)

---

* Vide Friedmann: *An Indrotuction to World Politics*, Chapter I.

† "Most international conflicts show a mixture of power politics and ideological factors." *Idem.*

নিজ আদর্শ কার্যকরী করিয়া থাকে। মধ্যযুগের 'ক্রুসেড্' বা ধর্মযুদ্ধের আদর্শ ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য স্থাপন ও যীশুখ্রীষ্টের সমাধি স্থান মুসলমানদের অধিকার হইতে জয় করিয়া লওয়া। ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইওরোপে নিজ নিজ রাজবংশের একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন, অপরাপর দেশের উপর রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন প্রভৃতি যুদ্ধের আদর্শস্বরূপ ছিল। ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের দ্বন্দ্ব আদর্শগত দ্বন্দ্বেরই উদাহরণ মাত্র। শ্রেণীবৈষম্যহীন এক সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন হইল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আদর্শ। এই আদর্শ সিদ্ধির জন্য আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সব কিছুই অনুসরণীয়। সাম্যবাদী আদর্শের পাশাপাশি পাশ্চাত্য-দেশীয় গণতন্ত্রভিত্তিক ধনতান্ত্রিকতা বা উদার ধনতন্ত্র (Liberal Capitalism) এবং প্রাচ্যাঞ্চলের গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) আধুনিক জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আদর্শেরই প্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির নাৎসিবাদ ও ইতালির ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি একক প্রাধান্যের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতনের পর হইতে আধুনিক জগতের আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের তথা সমস্যার অন্যতম প্রধান-টি হইল গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব। এই আদর্শগত বিভেদ সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; স্বভাবতই শক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে পৃথিবীর বর্তমান আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে 'আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব মাত্রেই শক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে উদ্ভূত'—ফ্রিড্ম্যান্ (Friedmann)-এর এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব

আধুনিক কালের সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব—গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের দ্বন্দ্ব

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের পশ্চাতে ভাল বা মন্দ, নৈতিক বা অনৈতিক—কোন-না-কোন প্রকার উদ্দেশ্য তথা আদর্শ থাকে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সকল উদ্দেশ্য বা আদর্শ রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পূর্বেকার আদর্শ বর্তমানে স্বার্থপর, নৈতিকতাবর্জিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের যে বিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের নূতন নূতন আদর্শ লইয়া বিবাদ-

বিসম্বাদ চলিবেই। মানুষ দেবতায় রূপান্তরিত না হইলে এই ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান আশা করা দুরাশা মাত্র। আর যতদিন এই সমস্যা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন আদর্শ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োগ থাকিবে এবং শক্তির প্রয়োগে নৈতিকতা গৌণ স্থান অধিকার করিবে। বাস্তব জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মানসিক ক্ষমতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিছক আদর্শবাদকে কতকটা বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়া পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার মধ্যেই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের উপায় নিহিত আছে। অপরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নিজ আদর্শকে বলপূর্বক অপরের উপর চাপাইবার মনোবৃত্তি দূরীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান ঘটান সম্ভব।

উপসংহার

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার স্বরূপ (Nature of the present International Problems): সভ্যতার আদিকাল হইতেই যুদ্ধ মানুষের সর্বাধিক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন যুগের নীতিবাদীরা যুদ্ধকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পাপাত্মক কার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কূটনীতিকেরা যুদ্ধ সর্বনাশাত্মক একথা স্বীকার করিলেও স্বাধীনতা, জাতীয় সম্মান, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র পন্থা এবং জাতির প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের সর্বশেষ উপায় বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। আর একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের যদি কোন প্রয়োজনই না থাকিত তাহা হইলে মানব সভ্যতার আদি কাল হইতে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমাজে অপরিহার্য হইয়া উঠিত না। অধ্যাপক ইগেল্‌টন-এর মতে বহু শতাব্দী ধরিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ মিটান বা কোনপ্রকার অন্যায় ও অসঙ্গত পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থাই হইল যুদ্ধ। অনুরূপ অধ্যাপক শট্‌ওয়েল-এর মতে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধই হইল একমাত্র পন্থা, অবশ্য অপর দেশ আক্রমণ করিবার মধ্যে যে অন্যায় নিহিত থাকে তাহাও যুদ্ধের মধ্যেও রহিয়াছে। দেশপ্রেমিকগণ যুদ্ধ দেশপ্রেম প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করিয়াছেন, কবি আদর্শ বা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাকে মনুষ্যত্বব্যঞ্জক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। জনসাধারণের কোন কোন অংশ যুদ্ধকালীন সহজলভ্য চাকরি, মুনাফা প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা ভোগের উপায় হিসাবে যুদ্ধকে সমর্থন করিয়াছে। সৈনিকগণের নিকট যুদ্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তেজনাপূর্ণ আকর্ষণ বলিয়া মনে হইলেও প্রধানত তাহাদের নিকটই যুদ্ধের বীভৎসতা পূর্ণমাত্রায়

যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা

প্রকটিত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধজয়ের আনন্দলাভের মনোবৃত্তি যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ নর-নারীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ-সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও যুদ্ধের ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সকলেই উহা পরিত্যাজ্য বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। যুদ্ধ অনুচিত জানিয়া বা উপলব্ধি করিয়াও যুদ্ধনীতি সমর্থন করিবার উপরি-উক্ত বিভিন্ন যুক্তি রহিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ সভ্য জগতের সর্বাধিক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজিতে গিয়া সামরিক শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতিই যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখিবার একমাত্র পন্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সামরিক শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখিয়া অর্থাৎ position of strength হইতে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা যায়। আদর্শবাদীরা অবশ্য যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধরোধ করিবার নীতির পক্ষপাতী নহেন। 'বিশ্বরাষ্ট্র' অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলে এবং মানুষমাত্রকেই সম-অধিকারে স্থাপন করিলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সমস্যার সমাধান হইবে একথা আদর্শবাদীরা মনে করেন। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর, আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। ইউনাইটেড ন্যাশনস্ (United Nations) ইহারই এক অতি দুর্বল পদক্ষেপ। এই আদর্শের সহিত বাস্তব জগতের পার্থক্য অনেক, এজন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান এবং মৌলিক সমস্যাই হইল যুদ্ধরোধের সমস্যা।*

বর্তমান জগতে সর্বপ্রধান ও মৌলিক আন্তর্জাতিক সমস্যা—যুদ্ধরোধ করিবার সমস্যা

যুদ্ধরোধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ

বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ

বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম রূপ হইল আদর্শগত দ্বন্দ্ব—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের তথা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব প্রধানত পাশ্চাত্ত্য দেশীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথা, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি এবং সাম্যবাদী চীন ও রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে। বস্তুত, পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ আজ দুইটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হইয়া

আদর্শগত সমস্যা—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র

* Vide G. Hardy : *A Short History of the International Affairs*, p. 1.

পড়িয়াছে। এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর সামরিক মারণাস্ত্রের ধ্বংসকারী ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অনুগত মিত্রশক্তি লাভ প্রভৃতি অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় রূপ লাভ করিয়াছে। ইদানীং উপরি-উক্ত আদর্শগত দ্বন্দ্ব-প্রসূত পরস্পর-বিদ্বেষী দুইটি দল ভিন্ন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (uncommitted nations) নামে অপর একটি দলের উদ্ভব হইয়াছে। বিবদমান দল দুইটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ও সেগুলির মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা এই তৃতীয় দলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরস্পর-বিরোধী শিবিরে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অপর সমস্যা হইল পরাধীনতা, জাতিগত প্রাধান্য ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের অবসান ঘটাইয়া মানুষ ও জাতি-মাত্রেরই সম-অধিকার স্থাপন করা। শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কৃত্রিম ধারণা দূর করা এবং কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের সহিত তাহাদের এক পর্যায়ে স্থাপন করাও বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম আদর্শ হিসাবে বিবেচ্য।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়দের সমতার সমস্যা

আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের অন্যতম প্রধান হইল পরস্পর-বিদ্বেষ-প্রসূত যুদ্ধাত্মক পরিস্থিতি ও প্রভাবের চাপ (war tensions) হইতে পৃথিবীকে মুক্ত রাখা। কূটনৈতিক কার্যনীতিতে এই ধরনের চাপ বা tension বজায় রাখিয়া জাতিকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত রাখিবার ব্যবস্থা স্বীকৃত বটে, কিন্তু জাগতিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা এক অতি কৃত্রিম অবস্থা সন্দেহ নাই। এইরূপ পরিস্থিতি ও প্রভাব যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিবে, বলা বাহুল্য। যুদ্ধের সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র, বিশেষ-ভাবে পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুত হইতে থাকিলে যুদ্ধের করাল ছায়া হইতে পৃথিবী মুক্ত হইতে পারিবে না। এজন্য স্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রধান এবং প্রথম পন্থা হইল আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ। অবশ্য নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আধুনিক বিশ্বরাজনীতির অন্যতম প্রধান জটিল সমস্যা একথা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য, আদর্শগত পার্থক্য, জাতিগত বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া লইয়া জগতের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নয়নের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান হয়ত সম্ভব হইতে পারে, অন্যথায় নহে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী (World after the First World War): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—'১৮) আন্তর্জাতিক ইতিহাস তথা মানব-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বস্তুত, ইহাই ছিল সর্বপ্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের প্রতি পাঁচজনের একজন যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল আর আহত হইয়াছিল প্রতি তিনজনের একজন। যুদ্ধাহতদের মোট সত্তর লক্ষ লোক চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত সংখ্যক লোক যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল তাহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক প্রাণ হারাইয়াছিল একমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এই হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল মিত্রপক্ষের—অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি জার্মানি-বিরোধী দেশগুলির। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত হতাহতের স্থান পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নীতি চালু করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে বহু উদীয়মান বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি উইলফ্রিড আওয়েন (Wilfrid Owen) ও রবার্ট ব্রুকের (Robert Brooke) নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বেসামরিক জনসাধারণও এই যুদ্ধের সরাসরি কুফল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিমান আক্রমণ, খাদ্যাভাব, মহামারী প্রভৃতির ফলে বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে মোট হতাহতের সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের মোট সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কোন কোন দেশে—যেমন ফ্রান্সে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সুস্থ, সবল পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস পাইয়াছিল যে, পরবর্তী যুগে সেই সকল দেশের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। মোট ব্যয়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশালতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে মোট ব্যয় হইয়াছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। মানুষের প্রাণনাশে কি পরিমাণ সামগ্রী ও সম্পত্তি ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ের বিরাট অঙ্ক দৃষ্টে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল পৃথিবীর সর্ব-প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War)। জাতীয় শিল্প, জাতীয় সম্পত্তি, সর্বশ্রেণীর

যুগান্তকারী ঘটনা

হতাহতের বিশাল সংখ্যা

বেসামরিক জন-সংখ্যার প্রাণনাশ

মোট ব্যয়ের পরিমাণ

সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (First Total War)

জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইবার ফলে উহা পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বরাজনীতির এক আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ইওরোপীয় রাজনীতি-ই আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বরাজনীতি বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে 'লীগ অব্ ন্যাশনস্' (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বেও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়াই গঠিত ছিল। 'কন্সার্ট অব্ ইওরোপ' (Concert of Europe)-এর দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু লীগ অব্ ন্যাশনস্-এর অভিনবত্ব ছিল এই যে, ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিগণকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না।

ইওরোপীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রূপান্তরিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংকীর্ণ এবং স্বার্থপর জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ জার্মানির পরাজয় গণতন্ত্রের সাফল্যের নির্দেশক, সন্দেহ নাই। গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রধানত গণতান্ত্রিক দেশ ও জাতিসমূহের জয়লাভহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির চরম বিজয়সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়লাভে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রের মৃত্যুর পূর্ব-ছায়া পতিত হইয়াছিল।* বস্তুত,

* "To all appearance, the peace settlement of 1920 marked the decisive victory of those liberal principles which dominated the preceding epoch. Yet in fact, as was soon t demonstrated, liberalism was on its deathbed .....There was a large transfer of allegiance to Socialism; alternatively or simultaneously there was a widespread repudiation of democracy But Liberalism, the force which had won the war and made. the peace, was completely out of fashion." Hardy: *A Short History of the International Affairs*, p. 4.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির সাফল্যের পর-ই গণতন্ত্রের স্থলে সমাজতন্ত্রবাদ এবং ক্রমে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি এক-নায়কত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা যতই অদ্ভুত এবং স্বয়ংবিরোধী বলিয়া মনে হউক না কেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গণতন্ত্র ও উদারনীতির চরম জয়, এবং পতনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। মধ্যাহ্নের পরই অস্ত শুরু হয়, গণতান্ত্রিকতা তথা উদারনীতির মধ্যাহ্ন যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভে পরিলক্ষিত হয়, তেমনই উহার পরবর্তী অবস্থাই ছিল গণতন্ত্রের অস্তকাল। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও একই নীতির কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে ফরাসী বিপ্লবের অবদান উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ উপেক্ষা করিয়া প্রতিক্রিয়ার চরম বিজয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু সাময়িক্ভাবে প্রতিক্রিয়া জয়লাভ করিলেও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা উনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্টাংশে এই প্রতিক্রিয়াকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অনুরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে স্বৈরতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল উহা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি-চুক্তিতে আপাত-দৃষ্টিতে প্রতিহত হইলেও এবং গণতন্ত্র তথা উদারনীতির জয়লাভ ঘটিয়াছে মনে হইলেও ইহার অল্পকাল পরেই পুনরায় যুদ্ধের পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী ধারা ইওরোপে প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি হইতে শেষ পর্যন্ত একথাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন জাতিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করিয়া তোলা সম্ভব নহে। জার্মানিকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছা মিত্রপক্ষের যতই বেশি থাকুক না কেন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি জার্মানবাসীর শ্রদ্ধা টলান সম্ভব হয় নাই।†

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—সমাজতন্ত্রবাদ, নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান

ইতিহাসের নজির

---

* *Ibid*, p. 4.

† "It became apparent soon after the conclusion of the peace settlement that democracy could not successfully be imposed merely by threats...Germany as events showed could not be converted from an autocratic monarchy into a well functioning democratic republic simply by the desire of the Allies to make it so." Langsam: *The World Since 1919*, p. 84.

বিজয়ের মুহূর্তে গণতন্ত্রের এইরূপ অপমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে লেখকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। E. H. Carr-এর মতে বড় বড় যুদ্ধ মাত্রই কতকটা বিপ্লবাত্মক। সেগুলি পূর্বতন জরাগ্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করিয়া থাকে। ক্রমে বিশ্বযুদ্ধের ফলেও পূর্বতন জরাগ্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া এক নূতন ব্যবস্থার সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু Gathorne Hardy ও Sir Norman Angell-এর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে উদারনীতির উপর গঠিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল একথা বলা চলে না। গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর কারণ হইল এই যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিতে গিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অপরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে—যুদ্ধজয়ের সুবিধার জন্য—সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তোলা হইয়াছিল। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিগত মূল্যায়নের যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল উহার অনভিপ্রেত ফল হিসাবেই একক অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও দলগত একক অধিনায়কত্ব (Party Dictatorship) প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, উপসংহারে একথা বলা চলে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে গণতন্ত্রের পতনের সূচনা হইয়াছিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপরাপর উল্লেখযোগ্য ফলাফল হইল নিম্নলিখিত রূপের :

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কারণ সম্পর্কে মতানৈক্য

(১) এই যুদ্ধ ইওরোপের চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া ইওরোপে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত চারিটি সাম্রাজ্য ছিল জার্মানি, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও তুরস্ক। প্রথম যুদ্ধাবসানের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে মোট ১৮টি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থাও যে দেখা দিয়াছিল উহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জার্মানি, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও তুরস্ক—চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অবসান—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি

---

* Gathorne Hardy : pp. 4-5 ; Carr : *Conditions of Peace*, p. 8 ; Sir Norman Angell, *Preface to Peace*, p. 56.

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অংশ-গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবার ফলে এবং জাতি মাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) অধিকার থাকা চাই—এই নীতির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে জটিল আকার ধারণ করিল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির জটিলতা বৃদ্ধি

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিচুক্তির মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। ফলে, এই সকল নীতি পরাধীন দেশমাত্রেই ক্রমশ বিস্তারলাভ করিলে সেই সকল দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। মিশর, ভারত, কোরিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্নাঞ্চলে এই ধরনের আন্দোলন শুরু হয়।

পরাধীন দেশমাত্রেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পৃথিবীর জনসাধারণ একথা স্বভাবতই মনে করিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে হয়ত আর যুদ্ধ ঘটিবে না। লীগ অব্ ন্যাশন্‌স-এর প্রতিষ্ঠায় তাহাদের সেই আশা ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে যে সকল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেগুলি নূতন নূতন ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়াছিল। ফলে, প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে। করভারে জর্জরিত জনসাধারণের চির-শান্তির আশা ধূলিসাৎ হয়। ইহা ভিন্ন, লীগ অব্ ন্যাশন্‌স্ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পশ্চাতে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের কার্যকরী সমর্থনের অভাব পৃথিবীর জনসাধারণের মনে হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক স্থায়ী-শান্তি সম্পর্কে জন-সাধারণের আশাভঙ্গ

(৪) যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য দেশের উৎপাদন ক্ষমতা স্বভাবতই বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রতি দেশেরই শ্রমিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাধিক মাত্রায় অবহেলিত হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর-কালে পৃথিবীর—বিশেষত ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছিল যে, দেশের যুবক সম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে হয়ত বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় সর্বনাশাত্মক যুদ্ধের অবসান ঘটান সম্ভব হইবে। ফলে, যুব-সম্প্রদায় ও শিশু-শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র যুব-সম্প্রদায় রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠে। জার্মানি, ইতালি, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুব-আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যুদ্ধ-নিরোধের উপায় হিসাবে প্রায় সকল দেশের যুব-সম্প্রদায়কেই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। কারণ দেশরক্ষার শক্তি ও প্রস্তুতি যদি পূর্ণ মাত্রায় থাকে তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র যুদ্ধ সৃষ্টির সাহস পাইবে না, এই ধারণা তখন সকল দেশেই বদ্ধমূল ছিল।

শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের প্রতি বিশেষ মনো-যোগ : যুব-আন্দোলন

যুদ্ধ-নিরোধের উপায় হিসাবে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে পরস্পর সহযোগিতা ও সমবায়ের (co-operation) গুরুত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ যে শিক্ষালাভ করিয়াছিল তাহা যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন দেশের বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছিল।

সমবায় (Co-operation) ব্যবস্থার গুরুত্ব

(৭) যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুদ্ধকালে করা হইয়াছিল সেগুলিকে শিল্পোন্নয়ন, চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত, পরিবহন প্রভৃতিতে খাটাইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—উহার সুফল

(৮) সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাধিক সচ্ছল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল। এই যুদ্ধের পর হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে থাকে। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ক্রমেই বিশ্বরাজনীতিতে আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিকক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন এবং লীগ অব্ ন্যাশন্স্-এর সদস্য

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি : ল্যাটিন আমেরিকার অস্তিত্ব অনুভূত

পদলাভের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব ক্রমেই অনুভূত হইতে থাকে। প্রাচ্যাঞ্চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাপানে সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এক নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবী ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সহিত যুদ্ধোত্তর নূতন পৃথিবীর নানা বিষয়েই পার্থক্য ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর তুলনামূলক আলোচনা (Comparison between the Pre-War World with the Post-War World): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই জাতীয়তাবাদ, শিল্পোন্নতি, ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় ও শক্তি-সাম্য এই কয়টি মূলনীতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মেটারনিক্ ব্যবস্থা (Metternich System) সাময়িক কালের জন্য জাতীয়তাবাদকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিতে সমর্থ হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদের সাফল্য শুরু হয়। ইতালির জাতীয় ঐক্য, জার্মানির জাতীয় ঐক্য, বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী অগ্রগতি এই সাফল্যের উদাহরণ-স্বরূপ। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প-শ্রমিক (Industrial proletariat) সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ঘটাইয়াছিল এবং শ্রমিক কল্যাণ আইন-কানুনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া ও ইতালি, ইওরোপ তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ঔপনিবেশিক ও নৌ-শক্তি ব্রিটেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বভাবতই ব্রিটেন অংশ গ্রহণ না করিলে কোন যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধ নামে অভিহিত হইবার দাবি করিতে পারিত না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বাবধি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কতকটা

জাতীয়তাবাদ

শিল্পোন্নতি

রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রধান শক্তিসমূহ

এইরূপেই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে পরিস্থিতি এইরূপ থাকিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তিসমূহের প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। প্রাচ্যাঞ্চলে জাপানের অভ্যুত্থান, আমেরিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থভুক্ত অংশসমূহে আত্মনির্ভরশীলতা ও জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি আপাতদৃষ্টির অন্তরালে পৃথিবীর রাজনীতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। যাহা হউক, এই পরিবর্তন চলিতে থাকিলেও বিশ্বরাজনীতি বলিতে তখনও ইওরোপীয় রাজনীতিকেই বুঝাইত। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ—এক কথায় ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ কিছুকাল অন্তর অন্তর সম্মেলনে সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান তথা যুদ্ধ হইতে পৃথিবীকে নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মূলত, এই সকল রাষ্ট্রের স্বার্থে যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত থাকা স্থিরীকৃত হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় থাকিলেও ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে উহা দ্বারা সাতটি ইওরোপীয় যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল।* যাহা হউক, এই ব্যবস্থাও আবার পরস্পর সন্দেহ-বিদ্বেষ হইতে মুক্ত ছিল না। কারণ যখনই কোন একটি রাষ্ট্র অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিত বা ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ব্যাহত করিতে উদ্যত হইত তখনই অপরাপর শক্তিবর্গ যুগ্মভাবে অত্যধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দমন করিতে অগ্রসর হইত। এই শক্তি-সাম্য বা Balance of Power হইতে সন্দেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতির সৃষ্টি হইলেও একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থা দ্বারা শান্তি রক্ষা সম্ভব ছিল। Gathorne Hardy-র মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই শক্তি-সাম্য নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছিল।† বিসমার্কের অধীনে জার্মানির একে একে তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ শক্তি-সাম্য নীতির

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের সাময়িক সম্মেলন

শক্তি-সাম্য নীতি—উহার দোষ-গুণ

শক্তি-সাম্য নীতি পরিত্যক্ত—জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপরিহার্য

---

* Vide : Mowat : *The European State System*, p. 80.
Also Gathorne Hardy : *A Short History of International Affairs*, p. 10.

† Gathorne Hardy, p. 11.

মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, অথচ তদানীন্তন ইওরোপীয় শক্তিসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অন্তর্মুখী থাকিয়া পরবর্তী যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার পৃথিবীকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

শিল্পোন্নতি—অর্থনৈতিকক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

প্রথমত, শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি পৃথিবীর বিভিন্নাংশকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল করিয়া পৃথিবীকে ক্ষুদ্র-পরিসর করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় মহাদেশের বাহিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উত্থানে ইওরোপ মহাদেশের রাজনৈতিক তথা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব ক্ষমতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থানের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পূর্বেকার রাষ্ট্রবর্গের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি স্বভাবতই কমিয়া গিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে সকল ইওরোপীয় রাষ্ট্র ইওরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির—যেমন, জার্মান সাম্রাজ্য, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্য—পতনের ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইওরোপের মানচিত্রে যুদ্ধোত্তর যুগে নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের নামাঙ্কিত হইয়াছিল। একমাত্র পূর্ব-ইওরোপে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস—এই সাতটি রাষ্ট্রের স্থলে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আল্‌বানিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস—এই চৌদ্দটি রাষ্ট্রের নাম যুদ্ধোত্তর যুগের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।† ইওরোপীয় মহাদেশ ও ইওরোপীয় কন্‌সার্ট-এর প্রতিপত্তির অবসান ঘটিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সর্বজাগতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই স্বীকৃত হয়। পূর্বেকার পাঁচ অথবা ছয়টি ইওরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক রাজনীতির

ইওরোপীয় মহাদেশ ও শক্তিবর্গের প্রাধান্য হ্রাস

নূতন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

সর্বজাগতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা

*"What the First World War discredits is not the Balance of Power, but short-sightedness of isolationism." *Ibid*, p. 10.

†Gathorne Hardy, p. 13, *fn*.

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ
যুদ্ধের পূর্বে জার্মানির সীমারেখা
নূতন সীমারেখা
জার্মানি কর্তৃক হস্তান্তরিত স্থান
গণভোট সাপেক্ষ অঞ্চল
ফ্রান্স
স্পেন
পোল্যাণ্ড
রুমানিয়া
ইতালি
আফ্রিকা
কৃষ্ণসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
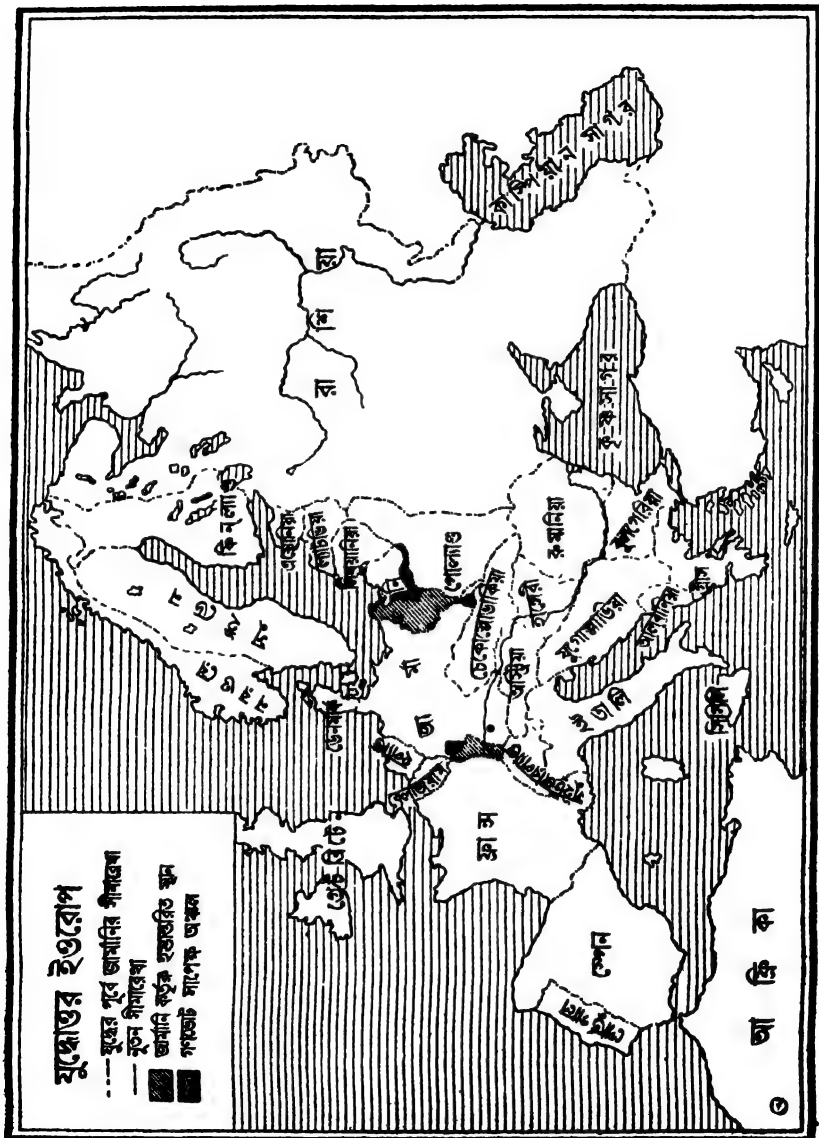
নিয়ন্ত্রণের স্থলে এখন উহার দশগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের উপর সেই ক্ষমতা ন্যস্ত হয়।

তৃতীয়ত, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌-এর সনির্বন্ধতায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণের ফলে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র এবং জাতি আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এ যেমন স্থান পাইয়াছিল, তেমনি এই গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিশেষভাবে পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের অদম্য প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার (Internationalism and Nationalism) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়।*

গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তাবাদ

নূতন সমস্যা

চতুর্থত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের মনে এক নূতন মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি যুদ্ধ-বিগ্রহাদি একপ্রকার জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্মানির রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক ট্রিস্‌ট্‌স্কি যুদ্ধ জাতীয় শক্তি, চেতনা ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন। মানবদেহে যেমন কিছুকাল পর পর শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বলকারক ঔষধের প্রয়োজন হয়, তেমনি রাষ্ট্রদেহের জন্য অনুরূপ ঔষধ প্রয়োজন হয়। ট্রিস্‌ট্‌স্কির মতে এই ঔষধ-ই হইল যুদ্ধ। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ এবং চরম পন্থা হিসাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা বলিয়াই বিবেচিত হইত। কন্‌সার্ট-অব্‌-ইওরোপ প্রভৃতি ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ লইয়া গঠিত ছিল এবং এই সকল রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরেই কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়াছিল। যুদ্ধ করা-না-করার মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি 'যুদ্ধের জনপ্রিয়তা'

---

*"Simultaneously with the adoption of this world-wide democratic Internationalism, the war, with the deliberate encouragement of the American President, had resulted in the complete and apparently final triumph of nationalism. The problem was to harmonize these two inconsistent principles." *Ibid*, p. 14.

ছিল মূল বিবেচ্য বিষয়, জগতের শান্তি বা জগৎবাসীর নিরাপত্তা তাহাদের নিকট ছিল অবান্তর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা এবং অভাবনীয় লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় যুদ্ধের প্রতি ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের ও জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভীতির ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ফলে, যুদ্ধের সর্বনাশাত্মক ক্ষমতা সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে সকলের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আমরা দেখিতে পাই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর প্রতিষ্ঠায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর সন্ধির সহিত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট্ উইল্‌সনের যে চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া উহা গঠিত হইয়াছিল সেগুলিতে আন্তর্জাতিক 'শান্তি' (peace) কথাটির কোনও উল্লেখ ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষা করাই ছিল এই শর্তাবলীর প্রধান এবং মূল উদ্দেশ্য। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের উপর নির্ভরশীল লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ জাতীয়তার উপরই অধিকতর জোর দিয়াছিল। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার যাবতীয় চেষ্টার স্থলে রাষ্ট্রবর্গ পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতি রাষ্ট্রের রাজ্যসীমা ও সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা বিধান করিবে এই ব্যবস্থা করিয়া আন্তর্জাতিকতার স্থলে জাতীয়তার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। তদুপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র (Covenant) প্রত্যাখ্যান করার ফলে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর আন্তর্জাতিক রূপ কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল। সর্বশেষে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ সম্পর্কে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, উহার প্রকৃত ক্ষমতা কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের হস্তে সীমাবদ্ধ থাকিবার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর গুরুত্ব স্বভাবতই হ্রাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার ফলে যুদ্ধের প্রতি পরিবর্তিত মনোভাব : লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর প্রতিষ্ঠা

জাতীয়তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে আন্তর্জাতিকতা ব্যাহত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের চুক্তিপত্র প্রত্যাখ্যানের ফলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর আন্তর্জাতিক রূপ ব্যাহত

পাইয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌কে 'কন্‌সার্ট-অব্‌ ইওরোপ' (Concert of Europe)-এরই এক নূতন সংস্করণে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন, সোবিয়েত রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশকেও লীগের সদস্যপদ বহির্ভূত রাখিবার ফলে লীগ অব ন্যাশনস্‌ রাষ্ট্রবর্গের আদর্শগত বিভেদ এবং পরাজিতের প্রতি প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি গ্রহণ করিবার ফলে লীগ-অব-ন্যাশনসের সর্বজাগতিক আবেদন বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা ইওরোপীয় একটি সংস্থায় পরিণত হইয়াছিল। জাপানের লীগ কাউন্সিলে সদস্যপদ লাভ লীগের এই চরিত্রের তেমন কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই।

উপসংহার ঃ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

তথাপি লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্যাসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি যে জাগিয়াছিল তাহার পরিচায়ক সন্দেহ নাই এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত প্রতীকে পরিণত হইবার আশা যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। লীগ অব ন্যাশনস্‌-এর বিফলতা ইহার প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই হ্রাস করে নাই। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ইহা অনস্বীকার্য।

প্রথম অধ্যায়

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন : শান্তি-চুক্তি
(Paris Peace Conference : Peace settlement)

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for the Peace): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইওরোপীয় দেশসমূহে গুজব রটিয়া যায় যে, শান্তির আলোচনা শুরু হইয়াছে, শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হইবে। অবশ্য উহা শুধু গুজবই ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইল্‌সন্ শান্তির প্রস্তাব করেন এবং জার্মানি যুক্তিসম্মত শর্তে শান্তি স্থাপনে রাজী না হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে অর্থাৎ ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির সপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এইরূপ ইঙ্গিতও দেন। কিন্তু জার্মানি বা মিত্রপক্ষ সেই সময়ে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী না হওয়ায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। পর বৎসর (জানুয়ারি ২২, ১৯১৭) প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ মার্কিন সিনেটের নিকট এক বার্তায় যুদ্ধাবসানে শান্তি স্থাপন কি ধরনের হইবে বা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে নিজ মত ব্যক্ত করেন। এই বার্তায় তিনি বলেন যে, কোন সাধারণ, গতানুগতিক শান্তি-চুক্তির দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটান হইবে না। ইহা এমন একটি শান্তি-চুক্তি হইবে যাহা রক্ষা করিয়া চলা সকলের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহা এমন একটি শান্তি-চুক্তি হইবে যাহাতে কোন পক্ষই 'বিজয়ী' বলিয়া বড়াই করিতে পারিবে না—a peace without victory, অর্থাৎ সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষা করিয়া সকলে যুগ্মভাবে এই শান্তির সুফল ভোগ করিবে।

শান্তি প্রচেষ্টা

শান্তি সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের ধারণা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত মিত্রপক্ষকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের শান্তি স্থাপনের স্পৃহা তাহাতেও হ্রাস পায় নাই। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ তাঁহার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্তের মাধ্যমে শান্তি-চুক্তির মৌলিক নীতি কি হওয়া উচিত তাহা ব্যাখ্যা করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জও তাঁহার যুদ্ধ-আদর্শ

ল্যয়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের যুদ্ধাদর্শ ঘোষণা

ব্যাখ্যা করেন। ল্যায়েড্ জর্জ ব্রিটেনের যুদ্ধাদর্শ বর্ণনা করিতে গিয়া মূল তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন; যথা: (১) রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পবিত্রতা রক্ষা, অর্থাৎ সেগুলি মানিয়া চলিবার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি, (২) স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসীমার পুনর্বিন্যাস, এবং (৩) নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন। ল্যায়েড্ জর্জের ঘোষণার তিনদিন পর প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত প্রকাশিত হয়। ল্যায়েড্ জর্জের ঘোষণায় সম্বলিত তিনটি মূলনীতি ভিন্ন অপরাপর আরও কয়েকটি মূলনীতি যথা, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুনর্বণ্টন ও সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামত এই ব্যাপারে গ্রহণ করা, সমুদ্রের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের স্বাধীনতা, গোপন-কূটনীতির অবসান প্রভৃতি উহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল।

ল্যায়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ কর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

কিন্তু কয়েকমাস পর যখন মিত্রশক্তিবর্গ (The Allies) যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত সেই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ল্যায়েড্ জর্জ মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ উদ্দেশ্য (war aims) আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের জন্য দায়ী শক্তিবর্গকে—প্রধানত জার্মানিকে, উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। পৃথিবীর অগণিত নর-নারীর মনে যুদ্ধ-সৃষ্টিকারী জার্মানির প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপজাত হইয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জার্মানিকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ল্যায়েড্ জর্জের এই বক্তৃতায় জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত যে 'চৌদ্দ দফা' (Fourteen Points) নীতির বিশ্লেষণ করেন সেগুলি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা চলিবে না। গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন সমুদ্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্য বিষয়ে শুল্ক প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন যথাসম্ভব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধাদির সরঞ্জাম হ্রাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ

নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিক সামরিক শক্তি রাখা চলিবে না। (৫) উদার নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি লইয়া ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা করা হইবে—অর্থাৎ কে কোন্ স্থানের অধিকারে স্থাপিত হইবে তাহা বিবেচনা করা হইবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং রাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে সেই সুযোগ দিতে হইবে। (৭) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত করিতে হইবে এবং বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পুনঃ-স্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সের আল্‌সেস্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৯) জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতালির রাজ্য-সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হইবে। (১১) জাতীয়তার ভিত্তিতে বলকান দেশগুলির পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১২) দার্দানেলিজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুর্কী সুলতানের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১৩) পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পৌঁছিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও রাজ্য-সীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত

প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্বলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্য না করিলেও উহা গ্রহণ করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইল্‌সন্ ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন (Paris Peace Conference): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডেই এই সভার অধিবেশন আহূত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ বৎসর পূর্বে সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিস নগরীতেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল।

প্যারিস নগরী শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত

ফ্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। একমাত্র ফ্রান্সের মন রক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্যারিস নগরীতে আহূত হইয়াছিল।

প্রধান চারিজন (Big Four)

৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন্, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড্ ল্যয়েড্ জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্‌শো, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দেশ-বিদেশ হইতে এই শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four)-এর হস্তেই ছিল। ইহারা হইলেন: উইল্‌সন্, ল্যয়েড্ জর্জ, ক্লিমেন্‌শো এবং ওর্লাণ্ডো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেন্‌শো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্যবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কার্যত সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শ-বাদের মৌখিক প্রকাশে কোন ত্রুটি করিলেন না। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেক্‌জাণ্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে সেইরূপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্। তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের মর্যাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। "জনমতের ভিত্তিতে আইনসম্মত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য"—এই কথা উইল্‌সন্ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ব্যক্ত করিলেন* এবং এই আদর্শ কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' শর্ত-সম্বলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব

প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের আদর্শবাদ

---

*"What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind."
Wilson, Vide Ketelbey, p. 430.

হইল না, কারণ যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন বিভিন্ন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন দেশের ছিল।

ইওরোপের দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

এইভাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হইল। একদিকে ন্যায় ও সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাহাতে বিনষ্ট না করিতে পারে সেজন্য জার্মানিকে দুর্বল করিবার, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা।* এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্বে পদানত জার্মানিকে হীনবল করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে ন্যায় ও সততার আংশিক প্রয়োগ যে না করা হইল এমন নহে, তথাপি প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির কূটকৌশল ও জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্, ল্যায়েড্ জর্জ, ক্লিমেন্‌শো, ওর্লাণ্ডো প্রমুখ কূটনীতিকগণের কূটচালে সহজেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) নামেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকরী হইল না।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত

উইল্‌সনের আদর্শ-বাদের পরাজয়

প্যারিসে শান্তি-সম্মেলন জার্মানির সহিত ভার্সাই (Versailles)-এর সন্ধি,

---

*"At the peace conference two ideas were struggling for mastery; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice; on the other were notions more familiar to the peace conferences, of the Balance of Power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors." Ketelbey, p. 431.

অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট্ জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-এর সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভ্রে (Sevres)-এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুঝিলেন না, তেমনি ইওরোপের পুনর্গঠনে ন্যায় বা সততার ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

ভার্সাই, সেণ্ট্ জার্মেইন, ট্রিয়ানন, নিউলি ও সেভ্রে—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট প্রচারিত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্বলিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) জার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং জার্মান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ট্রিয়েস্ট্ (Triest) ও ট্রেন্টিনো (Trentino) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি এবং পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং (৫) জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সমস্যা

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ নামক আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না সে বিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২৮শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নূতন শর্ত সংযোজনার দ্বারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি বা মন্‌রো-নীতির (Monroe Doctrine) ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং প্রত্যেক দেশের প্রজাই সমমর্যাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব জাপান কর্তৃক প্যারিস সম্মেলনে উত্থাপিত হইলে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর চুক্তি গৃহীত

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর কৃত্রিম বৈষম্য সম্পূর্ণভাবেই বজায় রহিল।

জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্স দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদারল্যাণ্ডের অন্তর্বর্তী দশ হাজার বর্গমাইল স্থান একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous buffer state) বলিয়া ঘোষিত হউক। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আল্‌সেস্‌-লোরেনের ন্যায় অপর একটি সমস্যাসঙ্কুল স্থানের সৃষ্টি হইত। কিন্তু ফ্রান্স ইহাতে নিজ নিরাপত্তার দাবি ত্যাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে ফরাসী মন্ত্রী ক্লিমেন্‌শো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে আরও দুইটি চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

> রাইন অঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য ফরাসী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

> ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার দায়িত্ব গ্রহণ

ভার্সাই-এর সন্ধির খসড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি লিখিত মন্তব্য পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০টি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর সন্ধির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ ৪৪৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখিয়া পেশ করিলেন। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধি-বর্গ বিবেচনা করিয়া এই সকল মন্তব্যের অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষের মূল দাবির কোন পরিবর্তন তথা জার্মানির যে সকল শর্তের বিষয়ে আপত্তি বা অভিযোগ ছিল তাহার কোন প্রকৃত পরিবর্তন করা হইল না। যেটুকু সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্‌ জর্জের বিশেষ সনির্বন্ধতায় সম্ভব হইয়াছিল। ল্যয়েড্‌ জর্জ প্যারিসের শান্তিসম্মেলন শুরু হওয়ার সময় যে প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা সামান্য পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পরিবর্তিত সন্ধির শর্তানুসারেও জার্মানির ভাগ্য-বিড়ম্বনার অবধি ছিল না।

> জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের বিদ্বেষ

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Versailles) : ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। (২) বেলজিয়ামকে মরেস্‌নেট, ইউপেন ও মামেডি (Moresnet, Eupen and Malmedi) দিতে বাধ্য হইল। (৩) পোল্যাণ্ডকে পোজেন-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে হইল এবং যদি উত্তর-সাইলেশিয়া ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যাণ্ডকে দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। (৪) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। কিয়দকাল পরে এই বন্দরটি লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। (৫) জার্মানিকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হইল। চীনদেশস্থ জার্মান অধিকারসমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mandatories'-এ পরিণত করা হইল।

পুনর্বণ্টনের শর্তাদি

জার্মানির সামরিক শক্তির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষে আনা হইল। (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি জার্মানিকে ত্যাগ করিতে হইল। (৩) যে সামান্য সৈন্যসংখ্যা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং জার্মানির সীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল। (৪) জার্মানির নৌবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, হেলিগোল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রাইন নদীর বাম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে যে সকল জার্মান দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলাবারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—এই সকল শর্তও জার্মানির উপর চাপান হইল। (৫) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেজন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল। (৬) জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সকল যুদ্ধজাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাড্‌মিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa flow) নামক জলভাগে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বেই ডুবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

সামরিক শর্তাদি

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির বাণিজ্যপোতের অধিকাংশই ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সার্ (Saar) অঞ্চল নামক একটি জার্মান জেলা পনর বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হইল। এই দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি যুদ্ধে জার্মান কর্তৃক ফরাসী কয়লার খনিগুলি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে ভোগ-দখল করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পনর বৎসর অতিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন স্থির করা হইবে, বলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকেও জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। (৩) যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধ জার্মানির উপব আরোপ কবিয়া জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবি কবা হইল। (৪) যুদ্ধেব ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পবিমাণ অর্থ জার্মানিব নিকট হইতে আদায় করিবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিসাব অনুযায়ী এই দাবি মোট ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারেব মধ্যে দাঁড়াইল। কি পরিমাণ অর্থ দাবি করিলে ঠিক হইবে তাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ সোনা বা অপব কোন জিনিস দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানিকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন আর জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

অর্থনৈতিক শর্তাদি : ক্ষতিপূরণ

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles): প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং ইওরোপীয় জন-সাধাবণের মধ্যে জার্মানিব বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। এবিষয়ে ল্যয়েড্ জর্জের বক্তৃতা স্মরণ করা যাইতে পারে। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, উপযুক্ত মর্যাদা, ন্যায় বা সততা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি

মিত্রপক্ষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা, দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল।

জার্মানির ন্যায্য বিচারলাভের আশা

ল্যয়েড্ জর্জ কর্তৃক মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শের ঘোষণা ও উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত পরাজিত জার্মানির মনে ন্যায়বিচার লাভের যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল সেই কথা স্মরণ রাখিয়া ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন। সেদিক হইতে বিচার করিলে ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তিতে জার্মানি কি ব্যবহার পাইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দুইটি প্রধান নীতি : (১) জার্মানিকে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দান, (২) ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তি-সঞ্চয়ের পথ রোধ

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে* আমরা দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, যথা : (১) যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিষ্যতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই দুই নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিকগণ পরাজিত শত্রুর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায্যবিচার, দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপর ও সংকীর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের কালে পরাজিত শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি অন্যায্য ও অপমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ স্বভাবতই থাকে না, ফলে শান্তি-চুক্তির বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুরু হয়।† এই বিরোধ ও বিদ্বেষ ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়

---

* 'The treaty represented two main ideas : a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." *A Short History of Modern Europe*, Riker, p. 396.

† "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, P. 322.

পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও এইরূপ হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই-এর-চুক্তির খসড়ার উপর কেবল-মাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত করিয়া এবং অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি ,অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় যতটুকুই থাকুক না কেন, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান জাতি, এমন কি ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated Peace' বা বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তি-চুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই, জার্মান জাতি এই সন্ধির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯—'৪৫) বীজ এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

(১) মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া শান্তির প্রতিকূল

জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবহার

'Dictated Peace'

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর সন্ধি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর পত্তন করিয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্সাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শর্তাদি কোন উদার বা ন্যায্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করা হইয়াছিল, কিন্তু জার্মানি হইতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার প্রতিদানে জার্মানিকে কোন সুবিধা-দানের মনোবৃত্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর শর্তানুসারে* উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য-নীতি অবলম্বনের

(২) অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অনুদারতা ও অবিচার —লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর নীতিবিরোধী

* "A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." *League of Nations Covenant*, vide Langsam, p. 69.

প্রতিশ্রুতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী (Fourteen Points)। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তানুযায়ী* স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্‌বৃত্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানির উপর মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থ-পরতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও হ্রাস করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

সামরিক শক্তি হ্রাস-নীতি অবহেলিত

চতুর্থত, জার্মানি হইতে আল্‌সেস্-লোরেন ফ্রান্সকে দান করা, পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া, পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক্ষ জাতীয়তা-বাদের প্রাধান্য দিয়াছিল বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডকে যেসকল স্থান জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির লোকসংখ্যা অধিক ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল।† পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার অধীনে জার্মান জাতির বহু লোককে বসবাসে

জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

---

*"Adequate guarantees that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic, safety." Wilson's *Fourteen Points*, Langsam, p. 69.

† "It was perhaps open to question whether the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations." E. H. Carr; *International Relations between the two World Wars*, pp. 5-6.

বাধ্য করিয়া এবং দক্ষিণ-টাইরল ইতালির সহিত সংযুক্ত করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তি সংখ্যালঘু সমস্যার (Minority Problem) সৃষ্টি করিয়াছিল।

সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি

ডেভিড্ টম্‌সনের মতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান তথা উইল্‌সনীয় জাতীয়তাবাদী নীতির পূর্ণপ্রয়োগ সম্ভব ছিল না। কারণ, এইরূপ পূর্ণপ্রয়োগ একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই হইত বেশি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের জন্য মিত্রশক্তিবর্গ বিভিন্ন শক্তির সহিত পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই চুক্তির দ্বারা মিত্রশক্তিবর্গের কার্যকলাপ সমর্থন করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইবে, বলা কঠিন। কারণ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল, তাহা হইতে পরাজিত শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসার মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাইয়াছিল; এই সকল কারণে জার্মান জাতির মনে ভার্সাই চুক্তি মানিয়া চলিবার কোন নৈতিক দায়িত্ববোধ স্বভাবতই জন্মায় নাই।

পঞ্চমত, জার্মানিকে যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির সর্বনাশসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। জার্মানিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির দিক দিয়া দুর্বল করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে বিচার করিলে পরাজিত শত্রুর এইরূপ অবমাননা এবং নির্যাতন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তি-গুলির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

ঐতিহাসিক রাইকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিত তাহা হইলে জার্মানিও যে মিত্রশক্তি-গুলির উপর অনুরূপ শর্তাদি চাপাইত না, তাহা বলা যায় না। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেস্ট-লিট্‌ভস্কের সন্ধি এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমত সমর্থন করিবার জন্য ইতিহাসের দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও

ঐতিহাসিক রাইকারের অভিমত

মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুকে শত্রুতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে—এইরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে রহিয়াছে। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) পর অষ্ট্রিয়ার প্রতি জার্মানির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিস্মার্কের উদারতারই ফল ইহা অনস্বীকার্য। মানবতা এবং নৈতিকতার দিক ভিন্ন প্রকৃতক্ষেত্রেও ভার্সাই-এর সন্ধি যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই।* (১) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইতে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুত, জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে এইভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যহীন করিবার মধ্যেই ভার্সাই-এর সন্ধি ভঙ্গ করিবার দৃঢ়সংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। অপর একটি যুদ্ধের দ্বারা নিজ মর্যাদা এবং হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। (২) পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া ফিরাইয়া দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিবার ফলে জার্মান জাতীয়-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপত্তারও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সুযোগ পাইলেই উহার পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিষ্যতে জার্মানির উত্থানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জার্মানি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথম হইতেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। (৩) তদুপরি জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অভাবনীয় পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের যে বিরাট বোঝা চাপাইয়াছিল তাহার মধ্যেই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছিল। কাল্পনিক যে-কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করিবার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বা শত্রুকে দুর্বল করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা বাতুলতা

জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল : সন্ধিভঙ্গ করিবার জন্য জার্মানির সংকল্প

জার্মানির অপমান : সন্ধিভঙ্গের সংকল্প

---

*"But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

ভিন্ন কিছুই নহে। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ মিত্রশক্তিদের স্বার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচয় সন্দেহ নাই। হাঁসকে উপবাসী রাখিয়া সোনার ডিম আশা করা দুরাশা মাত্র। জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করিয়া ক্ষতিপূরণের আশা করা ঐরূপ সোনার ডিমের ন্যায়ই দুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শাস্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকরী রহিয়া গিয়াছিল।

অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ দাবি—অদূরদর্শিতার পরিচায়ক

কাহারো কাহারো মতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করিবার কালে সেগুলির কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কাইজারের বিচার করা হয় নাই। মাত্র কয়েকজন জার্মান সামরিক কর্মচারীকে জার্মান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারালয় কর্তৃক বিচার করিয়া অতি সামান্য দণ্ড দান করা হইয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী শান্তি-চুক্তির শর্তানুযায়ী পনর বৎসর জার্মানিতে মোতায়েন থাকিবার কথা সত্ত্বেও এগার বৎসর পরই উহা জার্মানি হইতে অপসারণ করা হইয়াছিল। সর্বোপরি, একথাও কেহ কেহ, যেমন F. L. Benns বলিয়া থাকেন যে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদির অধিকাংশই ছিল সাময়িক শর্ত। এই চুক্তির ত্রুটিপ্রসূত যাহা কিছু অসুবিধা দেখা দিবার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলি দূর করিবার জন্য লীগ-অব-ন্যাশনস্ নামক স্থায়ী 'আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি দ্বারা ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির দোষ-ত্রুটি স্খালন করা সম্ভব কি? পরবর্তী কালে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির কঠোরতা দূর হইয়াছিল বা পনর বৎসরের স্থলে এগার বৎসর পর মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানি হইতে অপসারিত হইয়াছিল ইহাতে মিত্রপক্ষের উদারতা এবং যুদ্ধোত্তর জার্মানির যুদ্ধং দেহি মনোভাবের পরিবর্তন পরিস্ফুট হইলেও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদির মৌলিক ত্রুটির লাঘব হইতে পারে না।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমর্থনে যুক্তি

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানত, জার্মানি কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নর-নারীর যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধাত্মক জনমত গঠিত হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধির সংগঠকগণ এই শক্তিশালী জনমত উপেক্ষা

উপসংহার

করিতে পারেন নাই।) ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।) তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংকীর্ণ স্বার্থপর জাতীয়তাবোধ, জার্মানির শক্তি-বৃদ্ধিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রভৃতি কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশকে পূর্বে কখনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্বভাবতই এই সন্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই যে বপন করা হইয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

(১) ইওরোপীয় জনমতের চাপ, (২) মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর চুক্তি, সংকীর্ণ স্বার্থপরতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে অসামঞ্জস্য (Deviations of the Treaty of Versailles from Wilsonian Principles): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এবং অন্যত্র কয়েকটি বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের (The Allies) যুদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন। এই সকল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া শান্তি স্থাপন ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি-রক্ষা করাই ছিল উইল্‌সনের উদ্দেশ্য। (উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের পরিকল্পনায় জেনারেল স্মাট্‌স্ ও ফিলিমোর-এর দানও নেহাৎ কম ছিল না। উইল্‌সনীয় নীতিগুলি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট তাঁহার ভাষণে বিবৃত চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points),* ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসের নিকট অপর এক বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি নীতি' (Four Principles), মাউণ্ট ভার্নন নামক স্থানে ৪ঠা জুলাই তারিখের বক্তৃতায় উল্লিখিত 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) এবং নিউইয়র্কে বক্তৃতায় বিবৃত 'পাঁচটি ব্যাখ্যা' (Five Particulars)—এই সকল বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লিখিত ও বিবৃত নীতির সমষ্টিমাত্র।) এই সকল নীতির

উইল্‌সনীয় নীতি : 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points), 'চারিটি নীতি' (Four Principles), 'চারিটি উদ্দেশ্য' (Four Ends) ও 'পাঁচটি ব্যাখ্যা' (Five Particulars)

***Fourteen Points :**

1. "Open covenants of peace openly arrived at, after which (Contd.)

ব্যাখ্যা ও ঘোষণা সাধারণ্যে বিশেষত জার্মান জাতির মনে এই ধারণা স্বভাবতই জাগিয়াছিল যে, মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানির প্রতি ব্যবহারে এগুলির প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে এই সকল নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির প্রতি যেরূপ আচরণ করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ইহাই ছিল প্রধান অভিযোগ। তাহাদের নিকট ভার্সাই-এর সন্ধি ছিল জাতীয় অপমানের প্রতীকস্বরূপ।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির অভিযোগ

সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইওরোপীয় লেখক মাত্রেই ভার্সাই-এর সন্ধি বিজিত শক্তি জার্মানির উপর বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের আক্রোশ ও প্রতিশোধ-পরায়ণতার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত তথা উইল্‌সনীয় নীতির প্রয়োগে জার্মানির প্রতি অবিচার অর্থাৎ উইল্‌সনীয় নীতি ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির প্রয়োগে অসামঞ্জস্যের মধ্যেই জার্মানির পুনরুত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ উপ্ত ছিল। ইদানীং কোন কোন লেখক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির প্রতি অবিচারের বিশেষ কোন পরিচয় পান না। তাঁহাদের মতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তগুলির প্রয়োগে উইল্‌সনীয় নীতিগুলির অন্ধ অনুসরণই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ, এই দুইয়ের অসামঞ্জস্য নহে।

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে মতানৈক্য

---

there shall be no private international undertakings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.

2. Absolute freedom of navigation upon the seas outside territorial waters, alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of the international covenants.

3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.

4. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety.

গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে যদিও জার্মানি উইল্‌সনীয় নীতির ভিত্তিতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং যদিও বা প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের বক্তৃতায় বিবৃত নীতিগুলির প্রয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল তথাপি জার্মানির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উদার ব্যবহার আশা করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তিনি টেম্‌পারলির (H. W. V. Temperley) সহিত একমত যে, উইল্‌সনীয় নীতি রাজনৈতিক বক্তৃতা ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এই বক্তৃতাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া বা কূটনৈতিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োগ করা যেমন ছিল অসম্ভব তেমনি উহার পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা ছিল অযৌক্তিক।* ইহা ভিন্ন,

ভার্সাই-এর চুক্তির সমর্থন

একথাও বলা হইয়া থাকে যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখ জার্মানি রাশিয়ার উপর ব্রেস্ট্‌লিটভ্‌স্ক-এর এবং রুমানিয়ার উপর বুকারেস্ট-এর যে সন্ধি চাপাইয়াছিল তাহা হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি জয়লাভ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের যে কি অবস্থা হইত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং জার্মান জাতির উইল্‌সনীয় নীতির প্রয়োগে ত্রুটির বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার নৈতিক অধিকার ছিল না। বস্তুত, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বাল্টিমোর নামক স্থানে এক বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ জার্মানি কর্তৃক রাশিয়ার উপর যে শান্তি-চুক্তি চাপান হইয়াছিল উহার ফলে যুদ্ধের পর শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার পূর্বধারণা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—একথা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন। সুতরাং উইল্‌সনীয় নীতি জার্মানির সহিত শান্তি-স্থাপনের ভিত্তি ছিল একথা বলা যায় না।†

গ্যাথোর্ন হার্ডি একথাও বলিয়াছেন যে, উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের অধিকাংশই

---

5. A free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the Government whose title is to be determined.

(Contd.)

---

*Temperley : *A History of the Peace Conference of Paris*, Vol. VI, p. 540.

Gathorne Hardy : *A Short History of the International Affairs*. p. 20.

† President Wilson's Baltimore Speech, April 16, 1918.

ছিল সার্বজনীন শর্ত। কেবলমাত্র ৫, ৭, ৮ ও ১৩—এই চারিটি শর্ত ছিল জার্মানির স্বার্থসম্পর্কিত। পঞ্চম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, উপনিবেশের উপর কোন দেশের দাবি স্বীকার করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ন্যায়পরায়ণ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিতে গেলে জার্মানিকে সর্বাবস্থায়ই নিজ উপনিবেশ ত্যাগ করিতে হইবে একথা জার্মান নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।* সপ্তম ও অষ্টম শর্তে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হইতে জার্মান সৈন্যাপসরণ এবং বেলজিয়ামকে মামেডি, মরেসনেট, ফ্রান্সকে আলসেস্‌-লোরেন প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, উইল্‌সনের 'চারিটি নীতি'তে (Four Principles)

গ্যাথোর্ণ হার্ডির যুক্তি

6. The evacuation of all Russian territory, and as such a settlement of all questions affecting Russia as will secure the best and freest co-operation of other nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own choosing ; and more than welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treatment accorded to Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of her goodwill, of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and unselfish sympathy.

7. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single Act will serve as this will serve to restore confidence among nations in the laws which they have themselves set and determined for the government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of International Laws is for ever impaired.

8. All French territory should be freed, and the invaded portions restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matters of Alsace-Lorraine, which had unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all. (Contd.

*Gathorne Hardy, pp. 18-19.

বিবৃত স্বাধিকার (Self-determination) নীতির প্রয়োগে জার্মানি ডেনমার্ককে গণভোট সাপেক্ষভাবে উত্তর-শ্লেজভিগ্ নামক স্থানটি অর্পণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শর্তে পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠন ও সমুদ্রের সহিত সেই পুনর্গঠিত রাষ্ট্রের সংযোগের সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালের এক অন্যায় দূরীভূত হইয়াছিল। এই সকল চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাথোর্ণ হার্ডি বলেন যে, ভার্সাই-এর সন্ধি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। (সার অঞ্চল ও রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকার ছিল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।) উইল্‌সনীয় নীতি ও এই সকল ব্যবস্থা পরস্পর-বিরোধী ছিল না। জার্মানি যাহাতে ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পালন করিয়া চলে সেজন্য এই সকল ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছিল। কেবলমাত্র

---

9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognisable lines of nationality.

10. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safe-guarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development.

11. Rumania, Serbia and Montenegro should be evacuated; occupied territories restored; Serbia accorded free access to the sea; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly counsel along historically established lines of allegiance and nationality, and international guarantees of the political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into.

12. The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured, a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured of an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardenelles should be permanently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees.

13. An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. (Contd.)

যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে জার্মান সম্রাট কাইজারের বিচারের শর্তটি উইল্‌সনীয় নীতি-বহির্ভূত ছিল। এক্ষেত্রেও গ্যাথোর্ণ হার্ডি বলেন যে, কাইজারের বিচারের শর্তটির বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের কিছু থাকে তাহা একমাত্র কাইজারের ব্যক্তিগত অভিযোগ হইতে পারে, ইহা জার্মানির জাতীয় অভিযোগ হইতে পারে না।

কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি যে উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত ও অপরাপর নীতি-বিরোধী ছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইদানীং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির যুক্তিবাদী সমর্থনের প্রবণতা বিশেষভাবে ইংরাজ লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইলেও নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও উইল্‌সনীয় নীতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল।

নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, উইল্‌সনীয় নীতির সাধারণ শর্তগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র যেগুলি সরাসরিভাবে জার্মানির স্বার্থ-সম্পর্কিত ছিল সেগুলি বিচার করিলেও জার্মানির অভিযোগের ন্যায্যতা প্রমাণিত হইবে। উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তের পঞ্চম শর্তে উপনিবেশ-সম্পর্কে যে নীতি বর্ণিত আছে তাহা কেবলমাত্র জার্মানির উপরই প্রযুক্ত হইয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিচার করিয়া দেখা

উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টনের নীতির অবমাননা

---

14. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike.

Four Principles :

1. That each part of the final settlement must be based upon essential justice of that particular case and upon such adjustments as are most likely to bring a peace that will be permanent.

2. That peoples and provinces are not be bartered about from sovereignty to sovereignty as if they were mere chattels and pawns in a game, even the great game, now for ever discredited, of the Balance of Power but, (Contd.)

দূরের কথা, জার্মানির উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনসমাজের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনও তাহারা উপলব্ধি করে নাই। সার অঞ্চল, শান্টুং, সিরিয়া প্রভৃতির জনসাধারণের মতামতের প্রতি কোনপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কথা তাহারা মনেও আনে নাই।

---

3. That even, territorial settlement involved in this war must be made in the interest and for the benefit of the populations concerned, and not as a part of any mere adjustment or compromise of claims amongst rival states.

4. That all well-defined national aspirations shall be accorded the utmost satisfaction that can be accorded to them without introducing new or perpetuating old elements of discord and antagonism that would be likely in time to break the peace of Europe, aud consequently of the world.

Four Ends :

1. The destruction of every arbitrary power anywhere that can separately, secretly, and of single choice disturb the peace of the world : or if it cannot be presently destroyed, at least its reduction to virtual impotence.

2. The settlement of every question, whether of territory, sovereignty, of enonomic arrangements or of political relationship, upon the basis of free acceptance of that settlement by the people immediately concerned and not upon the basis of material interest or advantage of any other nation or people which may desire a different settlement for the sake of its own exterior influence or mastery.

3. The consent of all nations to be governed in their conduct towards each other by the same principles of honour and respect for the common law of civilized society that govern the individual citizens of all modern states in their relations with one another, to the end that all promises and covenants may be sacredly observed, no private plots or conspiracies hatched, no selfish injuries wrought with impunity, and a mutual trust established upon the handsome foundation of a mutual respect for right.

4. The establishment of an organisation of peace which shall make it certain that the combined power of free nations will check every

(Contd.)

দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শর্তানুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন উহার অধিক সামরিক শক্তি প্রত্যেক রাষ্ট্রও হ্রাস করিবে। এই নীতি একমাত্র পরাজিত জার্মানির উপরই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অপরাপর রাষ্ট্র নিজ নিজ সামরিক শক্তির এতটুকুও হ্রাস করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। পক্ষান্তরে জার্মানির আভ্যন্তরীণ

সামরিক উপকরণ হ্রাসের প্রশ্ন

---

invasion of right and serve to make peace and justice the more secure by affording a definite tribunal of opinion to which all must submit and by which every international readjustment that cannot be amicably agreed upon by the people concerned shall be sanctioned.

Five Particulars :

1. The impartial justice meted out must involve no discrimination between those to whom we wish to be just and those to whom we do not wish to be just. It must be justice that knows no favourites and knows no standards but the equal rights of the several peoples concerned.

2. No special or separate interest of any single nation or any group of nations can be made the basis of any part of the settlement which is not consistent with the common interest of all.

3. There can be no leagues or alliances or special covenants and understandings within the general and common family of the League of Nations.

4. And more specially, there can be no special, selfish economic combinations within the League and no employment of any form of economic boycott or exclusion, except as the power of economic penalty, by exclusion from the markets of the world, may be vested in the League of Nations itself as a means of discipline and control.

5. All international agreements and treaties of every kind must be made known in their entirety to the rest of the world. Special alliances and economic rivalries and hostilities have been the prolific source in the modern world of the plans and passions that produce war. It would be an insincere as well as an insecure peace that did not exclude them in definite and binding terms.

নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন ছিল তাহা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়ত, উইল্‌সনের নীতির অন্যতম প্রধান ছিল স্বাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Self-determination)। কিন্তু এই নীতির প্রয়োগে কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় নাই। পুনর্গঠিত পোল্যাণ্ডকে যে সকল স্থান দেওয়া হইয়াছিল সেগুলির কয়েকটিতে জার্মান জাতির লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত পোল্যাণ্ডে জার্মান জাতির লোকের ঐ একই অধিকার উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইতালির রাজ্যসীমাও জাতীয়তা-নীতির ভিত্তিতে করা হয় নাই। যে আশা লইয়া ইতালি প্রথম যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহা ব্যাহত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানির সহিত জার্মান জাতির লোক-অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়ার স্বেচ্ছাধীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি উইল্‌সনীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অবমাননা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। অষ্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্য পরাজিত জার্মানিকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবে এই যুক্তির ভিত্তিতে মিত্রশক্তিবর্গের কার্য সমর্থন করা সুযৌক্তিক হইবে না। পরাজিত শত্রুকে পদানত রাখিবার মনোবৃত্তি বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসেও ফ্রান্সকে পদানত ও হীনবল করিয়া রাখিবার মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-জার্মানির ঐক্যের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হইবার যে আশঙ্কা ছিল, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে ন্যায় ও উদারতা প্রদর্শনে ত্রুটি সেই আশঙ্কা কোন অংশে হ্রাস করিয়াছিল বলা চলে না। পরাজিত শত্রুকে উদার নীতির মাধ্যমে মিত্রতে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা বা দূরদর্শিতা মিত্রশক্তিবর্গ উপলব্ধি করে নাই। মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে জার্মানি কোন ন্যায্য ব্যবহার পায় নাই এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি পরাজিত জার্মানির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্বভাবতই জার্মান জাতিকে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়া ও জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হইবার সম্ভাব্য ফল হিসাবে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইতে পারে এই যুক্তিতে জার্মানিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হইতে বঞ্চিত

আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির অবমাননা

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা : সংখ্যালঘু সমস্যা

করিয়া প্রকৃতপক্ষে পরাজিত ও অপমানিত জার্মান জাতির মনে প্রথম হইতেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

ডেভিড টম্‌সনের যুক্তি: উহার প্রত্যুত্তর

একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে স্থানান্তরিত না করিয়া সম্ভব হইত না, এজন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগের প্রশ্ন বাদ দিয়া মিত্রশক্তিবর্গ দূরদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছিল। ডেভিড্ টম্‌সনের (David Thomson) এই যুক্তির বিরুদ্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও এই দুই দেশের ঐক্যের পথ রুদ্ধ করিয়া জার্মানিকে দুর্বল করিয়া রাখা গেলেও উইল্‌সনীয় নীতির অবমাননা ইহাতে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে জার্মান সম্রাট কাইজারের উপর যুদ্ধ অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর কয়েকজন যুদ্ধ অপরাধী জার্মানকে বিচার করিবার শর্তটি শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হইলেও* ইহা জার্মান জাতির অভিযোগের কারণ হইতে পারে না, ইহা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উহা কাইজারের এবং অপরাপর কয়েকজন জার্মান সেনানায়কের ব্যক্তিগত অভিযোগ ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু উইল্‌সনের বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্য দিয়া যে সকল নীতি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল সেগুলির পরি-

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

প্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদিতে জার্মানির সম্রাটের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যে অবিচার এবং জার্মান জাতির মর্যাদায় যে আঘাত করা হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, জার্মানির উপর এক বিশাল ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপাইয়া দিয়া উইল্‌সনের চারিটি নীতি (Four Principles)-সংক্রান্ত বক্তৃতায় (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ) উল্লিখিত "There shall be no annexations, no contributions, no punitive damages"—এই কথাগুলির অবমাননা করা হইয়াছিল। এখানে একথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ল্যয়েড্ জর্জ ব্রিটিশ যুদ্ধাদর্শ

---

* "Less clearly perhaps within the agreed frame-work were the provisions for the trial of the Kaiser and of war criminals, but if these constituted a grievance, it was personal rather than national." Hardy : p. 19.

বর্ণনা করিতে গিয়া যে সকল নীতির উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলিও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে মানিয়া চলা হয় নাই।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, জার্মানির প্রতি ব্যবহারে মিত্রশক্তিবর্গ চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। পরাজিত শত্রুর পক্ষে ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইবার পথ বন্ধ করা এবং শক্তি-সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতিই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম হইতেই 'Thy head or my head' নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। সুতরাং মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত হইলে জার্মানি যে ব্যবহার করিত পরাজিত জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিবর্গও অনুরূপ আচরণই করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোন ব্যাপক যুদ্ধের পর মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করিয়া শত্রুর প্রতি চরম উদারতা প্রদর্শন আন্তর্জাতিক ইতিহাসে কোন কালেই ঘটে নাই। (স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিসমার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার প্রতি উদার ব্যবহারের পশ্চাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সাহায্যলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল বলবতী। এই উদাহরণ বাদ দিলে ইওরোপীয় ইতিহাসে বিজিতের প্রতি চরম উদারতার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল)। কূট-নৈতিক চাল, বিভিন্ন দেশের সরকারের পরিবর্তন, যুদ্ধের গতির পরিবর্তনশীলতা, ব্রেস্ট্-লিটভস্ক সন্ধির কঠোরতা, মিত্রশক্তিবর্গের গোপন-চুক্তি প্রভৃতি ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তির পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। এমতাবস্থায় উইল্‌সনের আদর্শবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ আশা করা বৃথা ছিল। এই সকল যুক্তির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির ত্রুটিসমূহ কতকটা মার্জনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উপসংহার

সেন্ট্ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি (Treaty of Saint Germain): মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেন্ট্ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি তথা অপরাপর চুক্তিগুলিও ভার্সাই-এর চুক্তির মূলনীতির অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা হইল। জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তার ভিত্তিতে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত এমন কোন চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়া : সেন্ট্ জার্মেইনের সন্ধি

হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীয় রাজনীতিকগণ অষ্ট্রিয়ার উপর চাপাইলেন।

অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তিতে বাধাদান

অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, সেইজন্য অষ্ট্রিয়ার জার্মান অধিবাসীদিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তার দোহাই দিয়াই সমবেত রাজনীতিকগণ অষ্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া-সুদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও

জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটি একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্লাভ্-অধ্যুষিত বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা অষ্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল যুগোস্লাভিয়া (Yugo-Slavia)। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট ছিল। দক্ষিণ-টাইরল (South Tirol), ট্রেন্‌টিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট্ (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria) এবং ডালম্যাশিয়া (Dalmatia)'র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অষ্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ টাইরলের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হইয়াছিল। জার্মানির ন্যায়

অষ্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলোপ

অষ্ট্রিয়াও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিতেছিল তাহা মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অষ্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী অষ্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অষ্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে

অষ্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস : ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

বাধ্য করা হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়াকে সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে জার্মানির উপর যেরূপ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অনুরূপ ব্যবস্থা অষ্ট্রিয়াকেও মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভার্সাই-এর চুক্তির

যে সকল দোষ-ত্রুটি ছিল ঠিক সেই সকল দোষ-ত্রুটি সেণ্ট্ জার্মেইনের চুক্তিতেও বিদ্যমান ছিল। এই চুক্তির বিরুদ্ধেও ঠিক একই প্রকার অভিযোগ করা যাইতে পারে।

নিউলির শান্তি-চুক্তি (Treaty of Neuilly): নিউলির চুক্তি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্বর ২৭, ১৯১৯)। এই চুক্তি দ্বারা বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ৩৩ হাজারের বেশি হইবে না স্থির হইল। ক্ষতিপূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ খুব বেশি হ্রাস না পাইলেও এই সকল শর্তের ফলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের দুর্বলতম দেশে পরিণত হইল।

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির চুক্তি

ট্রিয়ানন-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Trianon): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যস্থ ম্যাগিয়ার জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্ভারের অবশিষ্টাংশ, ক্রোশিয়া-স্লাভোনিয়া যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোস্লো-ভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যাণ্ড বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজার সৈন্যের অধিক সৈন্য হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌ-বাহিনীরও কোন অস্তিত্ব রাখা হইল না, সমুদ্র অঞ্চলে পাহারার জন্য সামান্য কয়েকটি জাহাজ তাহাদের রহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের ন্যায় হাঙ্গেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপূরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর চুক্তি

সেভ্রে-এর শান্তি-চুক্তি (Treaty of Sevres): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সেভ্রে-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টুনিস প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া ও সিরিয়ার উপর হইতেও তুর্কী অধিকার বিলোপ করা হইল। স্মার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীসকে

তুরস্কের সহিত সেভ্রে-এর চুক্তি

ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেওয়া হইল। রোডস্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির অধিকার স্বীকৃত হইল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দার্দানেলিজ ও বোস্ফোরাস্ প্রণালীদ্বয় আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং উহার তীরস্থ সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইল। একদা বিশাল ওটোমান সাম্রাজ্য কন্স্টান্টিনোপল এবং এ্যানাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

তুরস্ক এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত

তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদের প্রতিনিধি সেভ্রে-এর চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইল তখন মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই চুক্তি অনুমোদনে বাধাদান করিল। শেষ পর্যন্ত ল্যাসেনের (Lausanne) চুক্তি দ্বারা তুরস্ক সেভ্রে-এর চুক্তির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদী দলের বাধাদান

ম্যাণ্ডেটস্ বা অভিভাবকত্বাধীন রাজ্যসমূহ (Mandates): পরাজিত জার্মানির উপনিবেশসমূহ এবং জার্মানির মিত্রশক্তি তুরস্কের পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের বণ্টন প্যারিসে সমবেত রাষ্ট্রপ্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিল। মিত্রশক্তিবর্গের (Allies) কেহ কেহ জার্মানির উপনিবেশসমূহ ও তুরস্ক সাম্রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে সরাসরি ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। অপরাপর অনেকে ইহার বিরোধিতা করিলে শেষ পর্যন্ত জেনারেল স্মার্টস্ 'The League of Nations' নামে একটি পুস্তিকায় এই সমস্যার সমাধানের এক কার্যকরী ইঙ্গিত দিলেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারেই 'ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থা' চালু করা হইল। এই প্রস্তাব অনুসারে একমাত্র কিয়াওচাও বাদে জার্মানির অপর সকল উপনিবেশ, রাশিয়া, তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যাংশ লীগ-অব ন্যাশন্স্-এর হস্তে ন্যস্ত করা হইবে এবং লীগ-অব ন্যাশন্সের পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল দেশের অভিভাবকত্বাধীনে এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল সেগুলিকে Mandatory Powers এবং সেগুলির অধীনে স্থাপিত দেশগুলির Mandates নামকরণ করা হইল।

ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থা

এই সকল Mandate-এর অধিবাসীদের উন্নতিবিধান করাই ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর Mandatory Power-গুলিকে তাহাদের অধীনে Mandates-এর অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট দাখিল করিতে হইত। এই রিপোর্ট বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি স্থায়ী ম্যাণ্ডেট্ কমিশন স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। এই কমিশন Mandatory Powers-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত বাৎসরিক রিপোর্ট বিচার করিয়া লীগ কাউন্সিলকে কি কর্তব্য সে সম্পর্কে উপদেশ দিবেন।

স্থায়ী ম্যাণ্ডেট্ কমিশন (Permanent Mandates Commission) ও ম্যাণ্ডেট্-প্রথা সম্পর্কে প্রথম হইতেই সমালোচনা শুরু হইয়াছিল। Mandatory Powers এবং Permanent Mandates Commission কতদূর ম্যাণ্ডেট্-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইবেন সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। কারণ ম্যাণ্ডেট্-প্রথা চালু করিবার পূর্বে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পূর্বেই বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে বিজিত শক্তি-বর্গের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যে সকল গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ম্যাণ্ডেট্ বণ্টনে সেই চুক্তিগুলিরই শর্তাদি মানিয়া চলা হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থায়ী কমিশন হইতে কিছুই আশা করিবার ছিল না। এই কমিশনের সংগঠনের দিক দিয়া বিচার করিলেও এরূপ সন্দেহ হওয়া অহেতুক ছিল না। কারণ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি, জাপান প্রভৃতি বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। অবশ্য বেলজিয়াম, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতির প্রতিনিধি-বর্গও তাহাতে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরাজিত জার্মানির একজন প্রতিনিধিও ইহাতে স্থান পাইয়াছিলেন। Mandatory Powers অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজ নিজ স্বার্থবুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটেন কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্যের তৈলসম্পদ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিবার এবং সুয়েজখালের উপর প্রাধান্য রক্ষার ব্যাপারে মাসুল ও প্যালেস্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেট্ অধিকার সহায়ক হইয়াছিল। নিজ নিজ অধীন ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলের উপর অত্যাচার-অবিচার ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশও করিয়াছিল। স্থায়ী ম্যাণ্ডেট্ কমিশনের সদস্যবর্গ যেখানে নিজেরাই ম্যাণ্ডেট্-এর উপর সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেখানে এই কমিশনের কার্যকারিতা যে খুবই অকিঞ্চিৎকর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

স্থায়ী ম্যাণ্ডেট্ কমিশন

স্থায়ী ম্যাণ্ডেট্ কমিশন্-এর কার্য সম্পর্কে সন্দেহ

সাম্রাজ্যবাদী দমন-নীতির বিরুদ্ধে Mandatory Powers-কে একাধিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই Mandatory Powers-এর কঠোর শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথাপি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই স্থায়ী মাণ্ডেট্ কমিশন Mandatory Powers-কে ম্যাণ্ডেট্-এর অধিবাসীদের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলসমূহের যথেষ্ট উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিল।* ম্যাণ্ডেট্-এর অধীনে ব্যক্তিবর্গকে শোষণ করা শেষ পর্যন্ত Mandatory Powers-এর অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া তাহারা ম্যাণ্ডেট্-এর অধীন ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থারও যে কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ম্যাণ্ডেট্গুলির আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে কমিশনের অবদান

Mandates তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: 'ক', 'খ', 'গ' শ্রেণী। তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত যে সকল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নিজ শাসন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহাদিগকে Mandatory Power-গুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিবে। যখনই এই সকল স্থানের অধিবাসীরা নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিবে, তখনই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandate-গুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। এই সকল স্থানে Mandatory Power-কে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না। 'গ' পর্যায়ে রাখা হইল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে। এগুলি নিকটবর্তী Mandatory Powers-এর রাজ্যাংশ হিসাবে বিবেচনা করা হইল, তবে এই সকল স্থানের জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

তিন পর্যায়ের ম্যাণ্ডেট্

'ক' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক্, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে দেওয়া হইল, সিরিয়া ও লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'খ' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেরুনস্-এর একাংশ, টোগোল্যাণ্ডের একাংশ

* Vide Langsam, P. 440.

এবং ট্যাঙ্গানিকা (জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা) ব্রিটেনের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনস্-এর অবশিষ্টাংশ ফ্রান্সের অধীনে স্থাপন করা হইল। বেলজিয়ামকে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির শাসনভার দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ-আফ্রিকাকে দেওয়া হইল জার্মান স্যামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাণ্ডকে, নাউরু দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলণ্ডকে। বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অপরাপর যাবতীয় জার্মান উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরস্থ সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানকে দেওয়া হইল।

ম্যাণ্ডেটগুলির বণ্টন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical importance of The World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, সেগুলির প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা বা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত হইবে না।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব : ব্যাপক ও বিভিন্ন

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সর্বপ্রথম 'সমষ্টিগত যুদ্ধ' (Total War)। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই এই যুদ্ধের প্রভাব-মুক্ত ছিল না। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরেই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ব্যাপকতা—জল, স্থল, আকাশ—সর্বত্র এই যুদ্ধের বিস্তৃতি, মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

সর্বপ্রথম 'সমষ্টিগত যুদ্ধ' (Total War)

এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুর্কী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ইওরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের মানচিত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র একেবারে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের মানচিত্র তদানীন্তন লোকের নিকট কোন নূতন মহাদেশের মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়ার পুন-

জার্মান, রুশ, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন : নূতন নূতন রাষ্ট্রের উত্থান

গঠন চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। বলকান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সকল নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের জয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইয়াছিল মোট ষোল।

গণতন্ত্রবাদ

কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিরুদ্ধ ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের স্থলে এক-অধিনায়কত্ব বা 'ডিক্টেটরশিপ' (Dictatorship)-এর উদ্ভব হইতে থাকে। এই নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ রাশিয়ার বল-শেভিক বিপ্লবে, ইতালির ফ্যাসিজম্‌ ও জার্মানির নাৎসিজমের উদ্ভবে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক-অধিনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপ-এর উদ্ভব (Rise of Dictatorship)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার ঘটিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর 'কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ' (Concert of Europe) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাময়িকভাবে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল (Third International)-এর প্রতিষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিকতার বৃদ্ধি : লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পরবর্তী যুগের যুবসমাজের মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

যুবসমাজের জাগরণ

এই যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি ঋণগ্রস্ত দেশ, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাজন দেশে (creditor country) পরিণত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান পরবর্তী কালে নানাপ্রকার ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ফলাফল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছে বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্র এই যুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বেসামরিক বিমান-চলাচল, নৌ-চলাচল প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানের উন্নতি

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর দান ছিল সর্বাধিক। তাহাদের শ্রমের ফলেই এই বিশাল যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বভাবতই শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। ক্রমেই তাহারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা করিল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। নারীজাতিরও রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

শ্রমিকের উন্নতি : নারীজাতির নূতন মর্যাদালাভ

এই যুদ্ধে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিল। এই সকল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপূরক হিসাবেই দেখা দিল। যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানির অর্থ নৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উহার সুযোগ হিট্‌লার ও তাঁহার নাৎসিদল গ্রহণ করিয়া শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিয়াছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতালিতেও অনুরূপ ফ্যাসিজমের উদ্ভবের পথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক দুরবস্থার জন্যই প্রশস্ত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

উপরি-উক্ত নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং অভূতপূর্ব ঘটনা, একথা স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক ঋণ-পরিশোধ সমস্যা

(Problems of Raparation & Inter-Allied War Debts)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ (Reparation for The World War I) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলিতেছিল সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক জনমত পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে ছিল। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিবার আর্থিক সামর্থ্য ইওরোপের কোন দেশেরই ছিল না। ভার্সাই-এর চুক্তির পূর্বাবধি যে সকল শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেগুলির অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল পরাজিত শত্রুর নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

বেসামরিক জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ব্যয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ পরাজিত জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবার বাতুলতা উপলব্ধি করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ কেবলমাত্র বেসামরিক জনসাধারণ ও তাহাদের সম্পত্তির যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহা জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিতে রাজী হইল। জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ফল হিসাবেই যে এই ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে বেসামরিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি হওয়া উচিত সেবিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের অঙ্কের কোন উল্লেখ করা হইল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন বা (Reparation Commission) নামে

ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission)-এর উপর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত

মিত্রপক্ষীয় এক কমিশন গঠন করিয়া উহার হস্তে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ভার দেওয়া হইল। এই কমিশন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের মধ্যে এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন একথাও বলা হইল। ইতিমধ্যে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ হিসাবে ১০০০,০০০,০০০ (একশত কোটি) পাউণ্ড মিত্রপক্ষকে দিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই ব্যাপার লইয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জার্মানির স্পা (Spa) নামক স্থানে মিত্রপক্ষ ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে

আদায়িকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ কিভাবে মিত্রপক্ষের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহা স্থির করা হয়। যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্বাধিক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া আদায়িকৃত ক্ষতিপূরণের ৫২ শতাংশ ফ্রান্স, ২২ শতাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ১০ শতাংশ ইতালি, ৮ শতাংশ বেলজিয়াম, এবং অবশিষ্ট অপরাপর মিত্র রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টিত হইবে স্থির হইল। কিন্তু মূল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়া-ই মিত্রপক্ষীয় এবং জার্মান প্রতিনিধিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ জার্মানির নিকট হইতে একেবারেই মোট ক্ষতিপূরণের জন্য থোক অর্থ (lump sum) গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় স্পা সম্মেলনে কোন সমাধানই সম্ভব হইল না। এদিকে মিত্রপক্ষ প্যারিসে এক সভায় সম্মিলিত হইয়া জার্মানির উপর ১১,৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য করিল। ৪২ বৎসরে এই অর্থ পরিশোধ্য হইবে এবং প্রতি বৎসর জার্মানির বৈদেশিক বাণিজ্যলব্ধ অর্থের শতকরা ১২ ভাগ মিত্রপক্ষকে দিতে হইবে। জার্মানি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া এককালীন মোট ১৫০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিল। এই অর্থও মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানি হইতে অপসারিত হইলে দেওয়া হইবে একথা জার্মানি জানাইতে দ্বিধা করিল না। মিত্রপক্ষ এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মতামতের এই বিরাট পার্থক্যের ফলে এবং প্রাথমিক ১০০ কোটি পাউণ্ড কিস্তি জার্মানি তখনও আদায় দেয় নাই, সেই কারণে মিত্রপক্ষ জার্মানির ডুইস্‌বার্গ (Duisburg), ডুসেলডর্ফ (Dusseldorf) ও রুহ্‌রট (Ruhrort) এই তিনটি স্থান অধিকার করিয়া লইল।

স্পা (Spa) কনফারেন্স

ক্ষতিপূরণ বণ্টনের হার নির্ধারণ

মিত্রপক্ষ ও জার্মানির মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য

জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক কিস্তিদানে বিলম্বহেতু মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক ডুইস্‌বার্গ, ডুসেলডর্ফ ও রুহ্‌রট দখল

ইতিমধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) জার্মানির উপর মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য করিলেন। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন হইতে জার্মানির ক্ষতিপূরণের তালিকা (The London Schedule) প্রস্তুত করিলেন। এই তালিকানুসারে ৬৬০ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে ৪০০ কোটি পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিপত্র (bond) জার্মানির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ কমিশনের নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে এবং

ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ধার্য (London Schedule)

ভবিষ্যতে জার্মানির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে তাহা আদায়ের প্রশ্ন উঠিবে। অবশিষ্ট ২৬০ কোটি পাউণ্ড জার্মানি ১০ কোটি পাউণ্ড বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে এবং প্রতি বৎসরের মোট রপ্তানি বাণিজ্যলব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ মিত্রপক্ষকে দিবে। পরাজিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঙ্গু জার্মানির নিকট হইতে ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার দুরাশা লণ্ডনস্থ মিত্রপক্ষীয় কাউন্সিল (Allied Supreme Council) উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির প্রতি যে বিদ্বেষভাব জাগরিত হইয়াছিল উহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা এই বিশাল অঙ্কের পরিমাণ হ্রাস করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, ৪০০ কোটি পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিপত্র গ্রহণের প্রস্তাব করিবার ফলে ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ যে জার্মানির নিকট হইতে আদায় করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল তাহাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ২৬০ কোটি পাউণ্ড সম্পর্কে যে ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণ কমিশন করিয়াছিলেন তাহা যাহাতে কার্যকরী হয় সেজন্য মিত্রপক্ষ একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল যে, জার্মানি যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানির শিল্পাঞ্চল রুহ্‌র (Ruhr) দখল করিতে বাধ্য হইবে। এই বিষয় লইয়া জার্মানির তদানীন্তন মন্ত্রিসভার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জার্মানি মিত্রপক্ষের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি হিসাবে আদায় দিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানির মুদ্রাব্যবস্থায় অত্যন্ত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। প্রচলিত নোটের অনুপাতে সরকারের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ সোনা না থাকায় কাগজী মুদ্রার মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। তদুপরি ৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার ফলে মুদ্রার মূল্য ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বভাবতই জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণের আর কিস্তি দেওয়া যে অসম্ভব হইয়া পড়িবে ইহা ইওরোপীয় অর্থনীতিক মাত্রেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে জার্মানির প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। ইংলণ্ড পরবর্তী দুই বৎসর জার্মানির নিকট হইতে কোনপ্রকার নগদ অর্থ আদায় করা হইবে না—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিলে ফ্রান্স উহার বিরোধিতা করিল। পরাজিত শত্রু নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াইয়া যাইবে ইহা ফ্রান্সের মনঃপূত হইল

জার্মানির অর্থনৈতিক অবনতি : মুদ্রাব্যবস্থা সঙ্কটাপন্ন

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

না। ইহা ভিন্ন জার্মানি London Schedule না মানিলে মিত্রপক্ষ রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইবে এই কথা ফ্রান্স ভুলিতে পারে নাই। যে-কোন প্রকারে রুহ্‌র অঞ্চল দখল করিয়া লওয়াই ছিল তখন ফ্রান্সের অভিপ্রায়। সুতরাং জার্মানিকে 'স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের' (Voluntary Default) অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল (১১ জানুয়ারি, ১৯২৩)।

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার কেবল বে-আইনী-ই ছিল না, অদূরদর্শিতারও পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির তৎকালীন আর্থিক দুরবস্থায় নগদ ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এমতাবস্থায় জার্মানিকে স্বেচ্ছাকৃত অনাদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছিল বলা বাহুল্য। জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা, যথেচ্ছ পরিমাণ কাগজী মুদ্রার প্রচলন* এবং মিত্রপক্ষের দাবি এই চারিটি কারণে জার্মানি তখন দুর্দশার চরমে পৌঁছিয়াছিল। যাহা হউক, রুহ্‌র অঞ্চলের জার্মানগণ ফরাসী-বেলজিয়ানদের সহিত অসহযোগিতা শুরু করিল। তাহারা সেই অঞ্চলের কলকারখানা বন্ধ করিয়া দিয়া, শ্রমিক ধর্মঘট করাইয়া রুহ্‌র অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা নাশ করিয়া দিল। ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যগণ খাদ্যদ্রব্য, ব্যাঙ্ক আমানত, আদায়িকৃত শুল্ক সব কিছু বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইতে চলিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আমানত এবং ব্যাঙ্ক-গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণভাবে মূল্যহীন হইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য মোতায়েন রাখিতে যে ব্যয় হইতেছিল উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ রুহ্‌র অঞ্চল হইতে আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় রুহ্‌র অঞ্চল

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল অধিকারের সমালোচনা

জার্মানিতে নূতন মন্ত্রিসভার ক্ষমতালাভ

---

* "Inflation was a greater disaster for Germany than the treaty of Versailles". E. H. Carr : *International Relations between the Two World Wars*.

বলপূর্বক অধিকার করা বিফলতায় পর্যবসিত হইল। যাহা হউক, জার্মানি রুহ্র অঞ্চলে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তাহা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে সম্পূর্ণভাবে দমিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে চ্যান্সেলর কুনো (Cuno)-এর স্থলে গাস্টাভ্ স্ট্রেসিম্যান (Gustav Stresemann) জার্মানির চ্যান্সেলর পদে আসীন হইলে সর্বপ্রথমেই রুহ্র অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া এবং কল-কারখানাগুলিকে পুনরায় চালু করিয়া জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি কোন কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ সমস্যার কোন নূতন সমাধানের কথা চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা যে বৃথা সে বিষয়ে ফ্রান্সেরও কোন সন্দেহ রহিল না। এদিকে আমেরিকাও যুদ্ধোত্তর ইওরোপের অর্থনৈতিক অবনতির চাপ অল্প-বিস্তর অনুভব করিতে লাগিলে মার্কিন সেক্রেটারী হিউজেস্ (Huges) জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। ফলে 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission) 'ডাওয়েজ কমিটি' (Dawes Committee) নামে একটি নূতন কমিটি নিযুক্ত করিয়া উহাকে জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার কিভাবে সমাধান সম্ভব এবং জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে পুনরায় সুষ্ঠু করিয়া তুলিবার উপায় কি সে বিষয়ে সুপারিশ করিবার ভার দেওয়া হইল। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে জেনারেল ডাওয়েজ (General Dawes) ও আওয়েন ইয়ং (Owen Young)—এই দুইজন মার্কিন প্রতিনিধি এবং সার রবার্ট কিণ্ডারস্লে (Sir Robert Kindersley) ও সার যোশিয়া স্ট্যাম্প (Sir Josiah Stamp)—এই দুইজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি লইয়া ডাওয়েজ কমিটি গঠিত হইল (২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৩)। এই কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল ডাওয়েজ-এর নামানুসারে ইহা 'ডাওয়েজ কমিটি' (Dawes Committee) নামে পরিচিত।

রুহ্র অঞ্চলে জার্মান অসহযোগিতার অবসান

জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে আমেরিকার ঔৎসুক্য

ডাওয়েজ কমিটি (Dawes Committee)

ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan): ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ডাওয়েজ কমিটি তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। ডাওয়েজ কমিটি

কয়েকটি বিশেষ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল নীতি ছিল: (১) জার্মানির উপর যে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপান হইয়াছিল উহা ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ রাজনৈতিক অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিবে না। অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে এক দেশ অপর দেশের আর্থিক পরিস্থিতির কথা যেভাবে বিবেচনা করিয়া থাকে, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা উচিত। (২) জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর বাহির হইতে কোনপ্রকার চাপ দেওয়া চলিবে না। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনরুজ্জীবনের এবং পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জার্মানির হস্তেই থাকা চাই। (৩) জার্মানিকে বিদেশ হইতে ঋণ-গ্রহণের সুযোগদান করিতে হইবে। (৪) জার্মানিকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতায় (Economic Sovereignty) পুনঃস্থাপন করিতে হইবে।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার মূলনীতি

উপরি-উক্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ডাওয়েজ কমিটি (১) জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় জার্মান মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করিলেন। পুরাতন জার্মান মার্কের মূল্য একেবারে হ্রাস পাইয়া গেলে জার্মান সরকার ইতিপূর্বে রেণ্টেন্‌মার্ক (Rentenmark) নামে এক নূতন মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অব্যবস্থার তেমন উন্নতি ঘটে নাই বলিয়া ডাওয়েজ কমিটি 'রাইক্ মার্ক' (Riech Mark) নামে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের মুদ্রা চালু করিবার সুপারিশ করিলেন। এই সকল মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় একটি 'Bank of Issue'-র হস্তে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। সরকারের সরাসরি দায়িত্ব হইতে এইভাবে মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সরাইয়া আনা হইল। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার জার্মান এবং বিদেশীদের এক সংযুক্ত কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইল এবং ৪০ কোটি স্বর্ণ মার্ক উহার মূলধন হিসাবে ধার্য করা হইল। (২) জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য জার্মানিকে ৪ কোটি পাউণ্ড ঋণদানের ব্যবস্থাও করা হইল। এই অর্থ হইতে জার্মানি ক্ষতিপূরণের কিস্তিও দিতে পারিবে স্থির হইল। (৩) জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হইয়া উঠিলে জার্মানি বৎসরে

ডাওয়েজ পরিকল্পনা: (১) নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা—'রাইক্ মার্ক'—বিদেশী সাহায্য—জার্মান ও বিদেশী প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির উপর মুদ্রা প্রচলনের পরিদর্শন-ভার ন্যস্ত

(২) জার্মানিকে বিদেশী ঋণদান

(৩) ক্ষতিপূরণের বাৎসরিক কিস্তি নির্ধারণ

৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবে এবং ক্রমে অবস্থার উন্নতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণের কিস্তির হার বাৎসরিক ১২½ কোটি পর্যন্ত বাড়ান চলিবে। (৪) জার্মানি যাহাতে ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে দিতে পারে সেজন্য মাদক, পানীয়, তামাক, চিনি, পরিবহন হইতে লব্ধ রাজস্ব, রেলপথ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে লব্ধ ঋণপত্র প্রভৃতি ক্ষতিপূরণের অর্থ সংস্থানের উপায় হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। (৫) জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অপরিহার্য পদক্ষেপস্বরূপ রুহ্‌র অঞ্চল হইতে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ প্রয়োজন এবং জার্মানিকে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Economic Sovereignty) অর্থাৎ বিনা বাধায় নিজ ইচ্ছামত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সুযোগ দান করিতে হইবে—এই কথা ডাওয়েজ কমিটি সুপারিশ করিলেন। (৬) ক্ষতিপূরণের অর্থ যাহাতে যথাযথভাবে আদায় হয় সেজন্য একজন 'এজেণ্ট জেনারেল' (Agent General) নিযুক্ত করা প্রয়োজন, একথাও ডাওয়েজ কমিটি সুপারিশ করিলেন।

(৪) ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার উপায় নির্দেশ

(৫) জার্মানিকে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বে পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

(৬) ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য 'এজেণ্ট জেনারেল' নিয়োগ

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মিত্রপক্ষীয় ও জার্মান প্রতিনিধিবর্গ লণ্ডন শহরে এক কন্‌ফারেন্সে (London Conference) সমবেত হইলেন। ইংলণ্ডের পক্ষে রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ফ্রান্সের নূতন প্রধানমন্ত্রী হেরিয়ট, জার্মানির চ্যান্সেলর স্ট্রেসিম্যান লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এই কন্‌ফারেন্সে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইল। স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে জার্মানি ক্ষতিপূরণ দানের শর্তাদি পালন করিয়াছে কিনা সেই প্রশ্ন মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ভবিষ্যতে মিত্রপক্ষের কোন এক বা দুইটি দেশের পক্ষে জার্মানি কিস্তি খেলাপ করিয়াছে এই অজুহাতে জার্মানির উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রুদ্ধ হইল। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যেমন ইংলণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও জার্মানিকে কিস্তি খেলাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল সেইরূপ কার্যের পুনরাবৃত্তির পথ এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে রুদ্ধ হইল। ইহার পর ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্য রুহ্‌র অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। ১৯২৫

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স (জুলাই, ১৯২৪)

খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফরাসী ও বেলজিয়ান সৈন্যের শেষ দল জার্মানি ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

লণ্ডন কনফারেন্সে ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণ ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডাওয়েজ পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশার বাস্তব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। এজেন্ট জেনারেলের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া ডাওয়েজ কমিটি ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission)-এর হাত হইতে সরাইয়া লইয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি ক্ষতিপূরণ কমিশনেরও যে ছিল না, একথা বলা যায় না। সুতরাং ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ক্ষতিপূরণের সমস্যাটিকে নিছক অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের পর্যায়ভুক্ত করিয়া ডাওয়েজ কমিটি যুদ্ধোত্তর ইওরোপের এক বিরাট এবং জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জার্মানিকে নিজ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা দান করিয়া, জার্মানিকে বিদেশী ঋণ দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া, সর্বোপরি জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া জার্মানির উপর ইওরোপের দেশসমূহের আস্থা যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তেমনি জার্মান জাতিকেও নিজ ভাগ্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ডাওয়েজ পরিকল্পনার মূল সুরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া লণ্ডন কনফারেন্স জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানে বিলম্ব অথবা কিস্তি খেলাপের অজুহাতে এককভাবে জার্মানির উপর কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানির পুনরুজ্জীবন এবং ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও কার্যকরিভাবে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে তথা জার্মানি হইতে লব্ধ ক্ষতিপূরণের উপর ভিত্তি করিয়া অপরাপর দেশের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের এক বিরাট পদক্ষেপ ডাওয়েজ পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছিল।

ডাওয়েজ কমিটির দূরদর্শিতা

জার্মানির উপর ইওরোপীয় দেশসমূহের আস্থা বৃদ্ধি—জার্মান জাতি নিজ ভাগ্য সম্পর্কে আশান্বিত

তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানিকে বিদেশী ঋণের দিকেই মনোযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ

দানের ব্যবস্থা না করিয়া জার্মানি আমেরিকা হইতে অধিকতর মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানি ১৮·২ মিলিয়ার্ড রাইক্ মার্ক ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল মাত্র ১০·৩ মিলিয়ার্ড রাইক্ মার্ক। সুতরাং পরের অর্থে পরের ঋণ শোধ করিয়া আরও কিছু নিজের কাজে ব্যয় করিবার সুযোগ জার্মানি গ্রহণ করিয়াছিল। ডাওয়েজ পরিকল্পনার অপর একটি ত্রুটি ছিল এই যে, উহা জার্মানির ক্ষতিপূরণের কিস্তি কোন্ বৎসর পর্যন্ত দিতে হইবে এবং মোট কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইবে সেবিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। ফলে, ক্ষতিপূরণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ তখনও বলবৎ ছিল।* এমতাবস্থায় জার্মানি নিজ জাতীয় আয় হইতে ক্ষতিপূরণ শোধ করিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিদেশী ঋণের সাহায্যে তাহা করিতে অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী কর্তৃক রাইন অঞ্চল সম্পর্কেও জার্মানির অসন্তুষ্টি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার কুফল: জার্মানিকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহ দান

বিদেশী ঋণের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ দানের নীতি গ্রহণ

ইয়ং কমিটি ও ইয়ং পরিকল্পনা (Young Committee and Young Plan): ডাওয়েজ পরিকল্পনা ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সমস্যা-সংক্রান্ত যে রেষারেষি দেখা দিয়াছিল তাহার উপশম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষতিপূরণ সমস্যার সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতে হয় নাই। জার্মানি কর্তৃক আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ মিটাইবার নীতি আমেরিকায় শীঘ্রই বিরোধিতার সৃষ্টি করিল। এদিকে ফ্রান্স আমেরিকা হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পরিশোধের বাৎসরিক কিস্তি দিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির সহিত ক্ষতিপূরণের অর্থের পাকাপাকি হিসাব করিতে চাহিল। জার্মানিও ডাওয়েজ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ধিত হারে বাৎসরিক ১২½ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিবার পূর্বে মিত্রশক্তিবর্গের অধিকার হইতে রাইন অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইতে চাহিল। এই সকল কারণে মিত্র-

ইয়ং কমিটি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

---

* Vide Langsam : *The World Since 1919*, p. 62.

শক্তিবর্গ 'ক্ষতিপূরণ সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত সমাধান'* করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া 'ইয়ং কমিটি' (Young Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করিল। আওয়েন ইয়ং হইলেন ইহার সভাপতি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ং কমিটি তাঁহাদের সুপারিশ ও পরিকল্পনা পেশ করিলেন।

আওয়েন ইয়ং কমিটি তাঁহাদের পরিকল্পনায় (১) জার্মানি কর্তৃক দেয় মোট ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া† জার্মানিকে উহা মোট ৫৮½ বৎসরব্যাপী বাৎসরিক কিস্তিতে শোধ করিবার সুযোগ দান করিলেন। (২) এই পরিকল্পনায় ক্ষতিপূরণের অর্থকে অবশ্য দেয় এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ইয়ং পরিকল্পনা

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দেয় ক্ষতিপূরণের দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানির অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইবে এরূপ পরিস্থিতিতে স্থগিত রাখা চলিবে স্থির হইল। (৩) জার্মানি ক্ষতিপূরণের অর্থের একাংশ জার্মানিতে উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাও আর দশ বৎসরে শোধ করিতে পারিবে একথাও ইয়ং পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত হয়। (৪) ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার ক্ষতিপূরণ কমিশন তথা কোন বিদেশীর হস্তে রাখা হইল না। ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং উহার পরিবর্তে 'আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ ব্যাঙ্ক' (Bank of International Settlement)-এর হস্তে ক্ষতিপূরণ আদায় প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করা হইল। জার্মানি ও জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ যে সকল দেশের পাইবার কথা ছিল সেগুলির প্রতিনিধি লইয়া এই ব্যাঙ্ক-এর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইল। (৫) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী অপসারিত হইবে এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই সেনাবাহিনীর ব্যয় জার্মানি বহন করিবে না, স্থির হইল। (৬) জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সেবিষয় উত্থাপন করিতে হইবে এবং সেই বিচারালয়

* *Ibid*, p. 62 "Complete and final settlement of the reparation problem."

† $ 8,032,500,000 in place of the original reparation of $ 32,000,000,000. *Idem.*

জার্মানিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেই তাহা করা চলিবে।

ইয়ং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ও উহা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ হেইগ্ (Hague) নামক স্থানে মিলিত হইলেন, কিন্তু কোন্ দেশ কি হারে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবে একথা লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত সেই অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হেইগ্-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে ইয়ং পরিকল্পনা মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে Bank of International Settlement স্থাপিত হইল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী রাইন অঞ্চল হইতে অপসরণ করিল।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক ইয়ং পরিকল্পনা অনুমোদন

এদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আন্তর্জাতিক এবং প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এক দারুণ মন্দা দেখা দিল। জার্মানির পক্ষে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। মিত্রশক্তিবর্গও আমেরিকা হইতে যুদ্ধের কালে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় না হইলে তাহা শোধ করিতে পারিল না। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি এক জটিল আকার ধারণ করিল। আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারে মন্দা দেখা দিলে আমেরিকা জার্মানিকে আর অর্থ সাহায্য করিতে সক্ষম হইল না। জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই দুর্দশার দিকে আগাইয়া চলিল। বিদেশী বণিকগণ জার্মানি হইতে তাহাদের মূলধন ও আমানত উঠাইয়া লইল। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ কর্তৃক ঘোষিত একাধিক জরুরী আইনও অবস্থার কোনপ্রকার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইল না। এমতাবস্থায় হিণ্ডেনবুর্গ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট হুভার এই আন্তর্জাতিক অর্থ-সংকট হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে মোট এক বৎসরের জন্য বিভিন্ন সরকারের পরস্পর ঋণশোধ স্থগিত থাকিবে এই ঘোষণা করিলেন। ইহা Hoover Moratorium নামে খ্যাত। জার্মানি অবশ্য দেয় ক্ষতিপূরণ Bank of Internationl Settlement-এর নিকট দিবে, কিন্তু ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থগিত রাখা যাইতে পারে সেরূপ ক্ষতিপূরণ

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা

'Hoover Moratorium'

এক বৎসর দিতে হইবে না এরূপ ব্যবস্থা হইল। এবিষয় লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। ইংলণ্ড প্রেসিডেণ্ট হুভার-এর ঘোষণা সমর্থন করিল, কিন্তু ফ্রান্স উহা সমর্থন করিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে Bank of International Settlement-এর উপদেষ্টা কমিটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের ৯ই তারিখ ঘোষণা করিল যে, জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ (Reparations) দেওয়া অসম্ভব। জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়া যে সকল সরকার বিদেশী ঋণ শোধ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল তাহারা পরস্পর ঋণ নাকচ করিবার দাবি উত্থাপন করিল। বলা বাহুল্য, ইহা আমেরিকার পক্ষেই সর্বাধিক ক্ষতির কারণ ছিল। যাহা হউক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হেরিয়ট (Herriot)-এর সনির্বন্ধতায় ল্যাসেন নামক স্থানে এক কন্‌ফারেন্সের (Lausanne Conference) অধিবেশনে ক্ষতিপূরণ সমস্যা পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হইল। এই সম্মেলনে মোট ১৫ কোটি পাউণ্ডের বিনিময়ে জার্মানির সমগ্র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নাকচ করা স্থির হইল। ইয়ং পরিকল্পনায় জার্মানির উপর যে মোট ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ধার্য করা হইয়াছিল উহার মাত্র ৩ শতাংশ পাইলেই মিত্রশক্তিবর্গ সন্তুষ্ট হইবে, একথাই ল্যাসেনের কন্‌ফারেন্সে স্বীকৃত হইল। এই ১৫ কোটি পাউণ্ড আবার নগদ না দিয়া শতকরা ৫% সুদে Bank of International Settlement-এর নিকট ঋণপত্র দিলেই চলিবে। বস্তুত, ল্যাসেন কন্‌ফারেন্সে জার্মানির ক্ষতিপূরণ নাকচ-ই হইয়া গেল। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি আমেরিকাকে ফ্রান্সের দেয় ঋণের পরিমাণও অনুরূপ হ্রাস করা হইলে ল্যাসেন কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমেরিকা দেখিল যে, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের অক্ষমতার অজুহাতে ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ আমেরিকা হইতে গৃহীত ঋণ শোধ করিতে অনিচ্ছুক। ঐ বৎসর (১৯৩২) ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আমেরিকার নিকট হইতে গৃহীত ঋণ শোধের কিস্তি দিল না। পর বৎসর ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশও কেবল নামমাত্র পরিমাণ অর্থ কিস্তি দিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্বলতার কারণে আমেরিকা বিদেশী সরকারদের বিশেষত যাহারা ঋণ শোধ করে নাই তাহাদের পক্ষে আমেরিকা হইতে কোনপ্রকার ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে,

জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানে অক্ষমতা

ল্যাসেন কন্‌ফারেন্স

মিত্রশক্তিবর্গের আমেরিকা হইতে গৃহীত ঋণ শোধের সমস্যা

ঋণী দেশ মাত্রেই আমেরিকাকে আর কোন অর্থ শোধ করিল না। এদিকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর পদ লাভ করিলে ল্যাসেন কন্‌ফারেন্স কর্তৃক ধার্য ১৫ কোটি পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণও জার্মানি আর দিতে রাজী হইল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাইএর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দীর্ঘকালের চেষ্টা তথা বিভিন্ন কমিটি ও পরিকল্পনার মাধ্যমেও ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান হইল না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিশালতা, জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক অব্যবস্থা, জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের অনিচ্ছা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। মিত্রশক্তিবর্গের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জার্মানি শোধ করিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক ঋণদানের ফলে জার্মানি বিদেশী ঋণের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। জার্মানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত ইওরোপীয় দেশগুলি আমেরিকাকে ঋণ শোধের প্রশ্ন জড়িত করিয়া সমগ্র যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে অত্যধিক জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এই জটিলতাও ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের বাধাস্বরূপ কাজ করিয়াছিল। সর্বশেষে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মতানৈক্য—যেমন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে একাধিক বিষয়ে পরস্পর বিরোধিতা—জার্মানির প্রতি কোন একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাও ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানে অসাফল্যের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

বিদেশী সরকার কর্তৃক আমেরিকার ঋণগ্রহণ নিষিদ্ধ

ক্ষতিপূরণ সমাধানে অসাফল্য

অসাফল্যের কারণ

মিত্রপক্ষীয় পারস্পরিক ঋণ পরিশোধ-সমস্যা (Problem of Inter-Allied War Debts): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহকে ঋণদান করিয়া তাহাদের যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার শক্তি ও সামর্থ্য যোগাইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সাহায্যে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তখনও মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রসমূহ মার্কিন ঋণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। ইংলণ্ড ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ যথা ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতিকে যে ঋণদান করিয়াছিল সেই অর্থও প্রধানত ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেই ঋণ হিসাবে পাইয়াছিল। এইভাবে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রসমূহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহকে ঋণদান

১০০ কোটি ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বিশাল পরিমাণ ঋণের প্রায় ৯০ শতাংশ কেবলমাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি গ্রহণ করিয়াছিল।

ঋণশোধ সমস্যা

যুদ্ধাবসানে স্বভাবতই এই ঋণ পরিশোধ সমস্যা দেখা দিল। পরাজিত শত্রু জার্মানি হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া মিত্রপক্ষ স্থির করিয়াছিল যে, কেবলমাত্র বেসরকারী ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে। সমগ্র যুদ্ধের ব্যয় তথা ক্ষতিপূরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু ঋণ পরিশোধ-সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি

যাহা হউক আপাতদৃষ্টিতে জার্মানির নিকট হইতে মিত্রপক্ষের দেশসমূহের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সেই সকল দেশ যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হওয়াতে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের পারস্পরিক ঋণ পরিশোধ সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ঋণ গ্রহণ নিছক অর্থনৈতিক চুক্তি ভিন্ন অপর কোন কিছু নহে বলিয়া মনে করিত এবং সেই হেতু এই চুক্তির শর্ত হিসাবেই সেই ঋণের অর্থ সুদসহ ফিরিয়া পাইবার দাবি করে। পক্ষান্তরে ইওরোপীয় দেশসমূহ মনে করিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গৃহীত ঋণের অর্থ তাহারা যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যুদ্ধসরঞ্জাম ক্রয় করিতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করিয়াছে তাহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরাট মুনাফা পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় দেশসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে জার্মানির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল তাহা পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার যুদ্ধও ছিল। মিত্র-পক্ষের পরাজয় ঘটিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এ কথার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান করিয়া আমেরিকা ঐরূপ সম্ভাবনা হইতে ইওরোপ এবং মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের ঋণের অর্থ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যও ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরও ইওরোপীয় মিত্রদেশসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

দুই পক্ষের যুক্তি

হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্পর্কে এই যুক্তি অধিকতর শক্তিশালী বলা বাহুল্য।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার সহিত ঋণ পরিশোধ সমস্যার সংযুক্তি

এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণগ্রহীতা দেশসমূহ পরাজিত জার্মানির নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ পাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল উহার উপর ঋণ পরিশোধের প্রশ্ন সরাসরিভাবে জড়িত ছিল এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলা যাইতে পারে। এইভাবে মিত্রপক্ষীয় ঋণের (Inter-Allied War Debt) ও ক্ষতিপূরণ (Reparation) সমস্যা দুইটি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঋণশোধের জন্য চাপ

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনকে ঋণ পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাইল এবং মোট ২৫ বৎসরের মধ্যে সুদসহ ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিতে বলিল। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার পাঁচ-শতাংশের স্থলে ৪½ শতাংশ গ্রহণ করিবে বলিয়াও জানাইল।

বেলফার প্রস্তাব

এই জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে লর্ড বেলফার (Lord Balfour) প্রস্তাব করিলেন যে, জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ব্রিটেন ইওরোপীয় দেশসমূহকে যে পরিমাণ ঋণ দান করিয়াছে সব কিছুই ব্রিটেন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে যদি এই নীতি ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা দেশসমূহ একটি পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ ব্রিটেন সমগ্র মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের পারস্পরিক ঋণ বাতিল করিবার প্রস্তাব করিল। জার্মানি হইতে ব্রিটেন যে ক্ষতিপূরণ পাইবে স্থির হইয়াছিল ব্রিটেন তাহা দাবি করিবে না তাহাও বেলফার প্রস্তাবে উল্লিখিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কর্তৃক বেলফার প্রস্তাবের বিরোধিতা

করিলে ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপরাপর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বোঝাপড়ায় উপস্থিত হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার হ্রাস করিতে এবং মূল ঋণের পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থের বেশি অর্থ ঋণগ্রহীতা দেশমূহের নিকট হইতে লইবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে আইনের দিকটাই বেশি দেখিয়াছিল। চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা সর্ব অবস্থায়ই পরিশোধ্য এই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি।

এদিকে জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সুবিধার জন্য প্রথমত ডাওয়েজ পরিকল্পনা পরে ইয়ং পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে মন্দা দেখা দিল তাহাতে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দানের উদ্দেশ্যে ঋণদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাজী হইল না। এমতাবস্থায় জার্মানির অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল, জার্মানির পক্ষে আর ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নহে এ কথা জার্মান চ্যান্সেলর সকলকে জানাইয়া দিলেন। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ না পাওয়া গেলে কোন ঋণগ্রহীতা দেশ ঋণ পরিশোধ করিতে রাজী হইল না। এইভাবে মিত্রপক্ষীয় পারস্পরিক ঋণ পরিশোধ এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা একই সঙ্গে নিজ নিজ সমাধান লাভ করিল।

পৃথিবীব্যাপী মন্দা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জার্মানিকে ঋণদানে অস্বীকার

জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা বিপযস্ত

ক্ষতিপূরণ তথা ঋণ পরিশোধ-সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান

তৃতীয় অধ্যায়

নিরাপত্তার সমস্যা : লীগ অব-ন্যাশনস্

(Problem of Security : The League of Nations)

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা (The Need of International Security): যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দারিদ্র্য ও দুর্দশা মানুষকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের উপায় হিসাবে যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া মানুষকে পুনরায় যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধের পর শান্তি, এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা সাময়িকভাবে মানুষের মনে শান্তি-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশনস্ (League of Nations) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর শান্তি—শান্তির পর যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার সর্বপ্রথম পরিকল্পনা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী মন্ত্রী ডিউক অব সালি (Duke of Sully)-এর Grand Design-এ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহার সর্বপ্রথম কার্যকরী চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) গঠনের মধ্যে। নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিয়া যে অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করিয়াছিল উহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় সেজন্য ইওরোপীয় কন্‌সার্ট গঠিত হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূলনীতি ছিল ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বজায় রাখা। এই সংস্থা প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলপূর্বক বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ে বাধা দান করা এবং কোন রাষ্ট্রই যাহাতে অপর কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ছিল ইওরোপীয় কন্‌সার্টের

প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা—ইওরোপীয় কন্‌সার্ট (Concert of Europe)

উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক অবস্থা যাহা ভিয়েনা সম্মেলন বলপূর্বক পুনঃস্থাপন করিয়াছিল উহা রক্ষা করিয়া চলিবার অর্থ-ই ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা। এই সকল ব্যবস্থা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার নামে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকাশ রুদ্ধ করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তব জগতের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলিয়াই 'পবিত্র চুক্তি' (Holy Alliance) কোন প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্‌সার্ট-অব্-ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের স্বীকৃতি আমরা দেখিতে পাই।

ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেস রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেইগ্ কন্‌ফারেন্স (Hague Conference) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরি-উক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তথাপি স্থায়ী শান্তি স্থাপনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলব্ধ হইতেছিল এই সকল চেষ্টার মধ্যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, উপরি-উক্ত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা যে মূলত শক্তি-সাম্য-নীতি-ভিত্তিক ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ নামে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল উহার মূলনীতি ছিল পূর্বগামী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর মূলনীতি ছিল সমবেতভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা করা। শক্তি-সাম্য নীতির প্রাধান্য লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর গঠনতন্ত্র অথবা কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয় না। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য

ও আদর্শ কন্‌সার্ট-অব্-ইওরোপের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইতে উচ্চতর ও বহুলাংশে পৃথক ছিল। মানব-ইতিহাসের সকল স্তরেই পশুশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই পশুশক্তি জগতের সমস্যাগুলি সমাধান না করিয়া আরও জটিলতর কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া থাকে। এই কারণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ মানুষের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়।

লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্

লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ (The League of Nations): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আন্তর্জাতিক শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর সর্বশেষ শর্তটির* উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদির সহিত উহার গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র বা 'কভেনাণ্ট' (Covenant)-এর মূল সূত্র ছিল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি আন্তরিক এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। সমসাময়িক জনসাধারণের মনে এই আশা জাগিয়াছিল যে, লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানই শুধু করিবে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নূতন নেতৃত্ব ও সমবায়ের সূচনা করিবে।†

মূল উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা

---

* The High Contracting Parties :

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security.

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations.

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another. Agree to this Covenant of the League of Nations. *Preamble to the Covenant of the League of Nations*, Langsam, p. 124.

† Littlefield : *History of Europe Since 1815*, p. 196.

লীগের চুক্তিপত্র বা কভেনাণ্ট (Covenant) এর একাদশ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন যুদ্ধে বা যুদ্ধের আশঙ্কা লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে না হইলেও সমগ্র লীগ-ই উহার সম্পর্কে অবহিত হইবে এবং শান্তি বজায় রাখিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। দ্বাদশ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর বিবাদ দেখা দেয় তাহা হইলে সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইবে। মধ্যস্থতার বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণার অন্তত তিন মাসের মধ্যে কোনপ্রকার সামরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না।

পরস্পর বিবাদে লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ

ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন সদস্য-দেশ যদি লীগের কভেনাণ্ট উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করে তাহা হইলে অপরাপর সদস্য-দেশগুলি সেই যুদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করিবে। প্রয়োজনবোধে সদস্য দেশগুলি লীগের কভেনাণ্ট রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক নৌ এবং বিমান বহরের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

লীগের কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) ও একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) ছিল। এই দপ্তরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠন করা হইল। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর হইল এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর সংগঠন

লীগ চুক্তিপত্রে (Covenant) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সর্বপ্রথম লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর সদস্য হইল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরকারী ত্রিশটি এবং অপর আরও তেরটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য হইল। মার্কিন সিনেটের আপত্তিহেতু মার্কিন সরকার লীগের সদস্য হইলেন না, ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষর করিলেন না। পরাজিত জার্মানিকেও লীগের সদস্যপদে গ্রহণ

করা হইল না।* ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লীগের সদস্য সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৬-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইতে হইলে লীগ চুক্তিপত্রের শর্তাদি মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইত। লীগের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা সমর্থিত হইলে কোন উপনিবেশ, ডোমিনিয়ন প্রভৃতিরও সদস্যপদভুক্ত হওয়া চলিত। লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইলে সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া দুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইত।

সদস্য-সংখ্যা :
সদস্য পদভুক্তি :
সদস্যপদ ত্যাগ

লীগের সাধারণসভা লীগের যাবতীয় সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটির বেশি ভোট দেওয়া চলিত না। প্রতিবৎসর সাধারণসভার অধিবেশন বসিত। জেনিভা নামক শহরে এই সভার অধিবেশন আহূত হইত। লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ সংগঠিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সময় পর্যন্ত সাধারণসভার মোট উনিশটি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার বিংশ তথা সর্বশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর অবসান ঘটে। সাধারণসভা লীগের শান্তি ও নিরাপত্তার কার্য সম্পর্কিত যে-কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিত। প্রতিবৎসর সাধারণসভার অধিবেশনে সমবেত হইয়া সদস্যগণ নিজেদের মতামত, লীগের কার্যাদির সমালোচনা ইত্যাদি করিতেন। তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কার্য ছিল লীগ কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যগণকে নির্বাচন করা। ইহা ভিন্ন লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর ব্যয়-বরাদ্দ করা, নূতন সদস্যপদপ্রার্থী রাষ্ট্রের আবেদন বিচার করিয়া দেখা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচনে লীগ কাউন্সিলকে সাহায্য করা।

সাধারণসভার সংগঠন ও কার্যাদি

লীগ কাউন্সিল ছিল *লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্*-এর কার্যকরী সভা। এই কাউন্সিল বা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং প্রতিবৎসর সাধারণসভা কর্তৃক নির্বাচিত চারিজন অস্থায়ী সদস্য—মোট এই নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্*-এর সদস্যপদভুক্ত হইতে রাজী না হওয়ায় উহার

* Vide Langsam, p. 41.

সদস্যসংখ্যা শেষ পর্যন্ত আট জনে আসিয়া দাঁড়ায়। স্থায়ী সদস্য ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করিলে অপর চারিটি সদস্যরাষ্ট্র উহার স্থায়ী সদস্যপদভুক্ত থাকে। কিছুকাল পর অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ক্রমপর্যায়ে এগার পর্যন্ত করা হইয়াছিল। লীগ কাউন্সিল সাধারণত বৎসরে তিনবার মিলিত হইত। কিন্তু ইহা ভিন্ন বিশেষ অধিবেশনও বসিত।

লীগ কাউন্সিলের সংগঠন, সদস্য-সংখ্যা ও কার্যকলাপ

কাউন্সিল সদস্যগণ যখন লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর কোন সদস্যরাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করিবেন তখন সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে লীগ কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতিও দেওয়া হইবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে লীগ কাউন্সিলের মতামত সর্ববাদিসম্মত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হইতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে লীগ কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। ম্যাণ্ডেট-এর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকল্প প্রস্তুত করা, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সদস্যরাষ্ট্রকে সাহায্য দান করা, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, আন্তর্জাতিক যে-কোন বিবাদ-বিসংবাদ কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হইলে সেবিষয়ে অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজনবোধে সাধারণসভার মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করা প্রভৃতি ছিল কাউন্সিলের দায়িত্ব। লীগের চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাও লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল।

লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর দপ্তর (Secretariat) একজন 'সেক্রেটারী জেনারেল'-এর অধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কাউন্সিলের মতানুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৭০০) অপরাপর কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই দপ্তর জেনিভা নামক শহরে অবস্থিত ছিল। সার এরিক্ ড্রামণ্ড্ ছিলেন লীগের সর্বপ্রথম সেক্রেটারী জেনারেল। লীগ চুক্তিপত্রেই সার ড্রামণ্ড্ প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন এই কথার উল্লেখ ছিল। পরবর্তী সেক্রেটারী জেনারেল লীগ কাউন্সিল সাধারণসভার মত লইয়া নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। দপ্তরের নানা বিভাগ ছিল। লীগ কাউন্সিল ও লীগের সাধারণসভার যাবতীয় কার্যাদিকে রূপদান করাই ছিল দপ্তরের কাজ।

দপ্তরের সংগঠন ও কার্যাদি

লীগের অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা। লীগ কাউন্সিল ও সাধারণসভা মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন করিত। বিচারপতিগণ নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। প্রথমে বিচারপতিদের সংখ্যা ছিল এগার, পরে উহা পনর করা হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বিবাদে আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নাদির মীমাংসা, আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দায়িত্ব ছিল। হেইগ্ (Hague) নামক স্থানে এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা জেনিভা শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রমিকদের অবস্থা-সংক্রান্ত এবং তাহাদের উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিচারাদির আলোচনা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট শ্রমিক-উন্নয়নের সুপারিশ প্রেরণ করা এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল। লীগের সদস্যপদভুক্ত হইলেই এই সংস্থার সদস্যপদভুক্ত বলিয়া ধরা হইত। প্রতি সদস্যরাষ্ট্র হইতে চারিজন প্রতিনিধি এই সংস্থার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন।

সাধারণসভা লীগের কভেনান্টে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-দেশ তিনজন প্রতিনিধি সেই সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু সদস্য-দেশের একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের স্থায়ী সদস্য ছিল—গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যান্য সদস্য-দেশ হইতে আরও চারিজন সদস্য সাধারণসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর কার্যনির্বাহক সভার ন্যায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

বিভিন্ন অংশের কার্যাদি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্ গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন সরকার লীগ-অব্-ন্যাশন্‌সে যোগদানের চুক্তি অনুমোদন না করায় আমেরিকা কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লীগ ত্যাগ

নিরাপত্তার সমস্যা (Problem of Security) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র-শক্তিবর্গের জয়লাভের সাময়িক উল্লাস শেষ হইবামাত্র ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার দিকে মনোযোগী হইল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সাহায্য-সহায়তা ভিন্ন ফ্রান্স কয়েক সপ্তাহের অধিককাল জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না এই সত্যটি ফরাসী সরকার ভুলিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন জার্মানির তুলনায় ফ্রান্সের লোকবল, অর্থবল, সামরিক শক্তি ও কৌশল—সব কিছুই ছিল অকিঞ্চিৎকর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ (১৮৭০, সেডানের যুদ্ধ) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-পদক্ষেপে জার্মানি মধ্য-ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সেডানের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা প্রভৃতির ফলে জার্মানির প্রতি ফ্রান্সের ভীতি বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরও জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণের ভীতি ফ্রান্সের জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনেতৃবর্গের এক দুঃসহনীয় মানসিক অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণে যুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যাই ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা।† এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের নিকট ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা প্রসারিত হউক এই দাবি করিয়াছিল। ফরাসী কূটনীতিকদের মতে ইহাই ছিল জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র বাস্তব এবং কার্যকরী ব্যবস্থা। কিন্তু রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারিত হইলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জার্মান ফ্রান্সের শাসনাধীন হইয়া পড়িবে এই কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর মিত্রশক্তি ফ্রান্সের

ফ্রান্সের জার্মান ভীতি

নিরাপত্তার জন্ত রাইন পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারণের দাবি

---

* "Twice within memory had the pounding of German military boots been heard on French soil, and the French were fearful of another incursion." Langsam (Seventh Edn.) p. 75.

† "The most important and persistent single factor in Europen affairs in the years following 1919 was the French demand for security." Carr : *International Relations between the Two World Wars*, p. 25.

এই দাবি স্বীকার করিল না। কিন্তু রাইন নদীর বাম তীর অর্থাৎ ফ্রান্সের দিকের তীরটি পনর বৎসরের জন্য মিত্রশক্তির অধীনে স্থাপন করিতে মিত্রশক্তিবর্গ রাজী হইল। ইহা ভিন্ন এই অঞ্চলে এবং রাইন নদীর পূর্বতীরের কতকস্থানে কখনও কোন প্রকার সামরিক ব্যবস্থা বা সৈন্য মোতায়েন করা হইবে না অর্থাৎ এই অঞ্চলের স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ করা হইল। কিন্তু ইহাতেও ফ্রান্সের অস্বস্তি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত না হওয়ায় আমেরিকা ও ইংলণ্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সেনেট প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন সমর্থিত ভার্সাই-এর সন্ধি অনুমোদন না করিবার ফলে আমেরিকা কর্তৃক ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি স্বভাবতই বাতিল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিপূরক ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিও অকার্যকর হইয়া পড়িল। ফলে ফ্রান্সের হতাশার আর সীমা রহিল না। জার্মান আক্রমণের ভীতি ফ্রান্সকে একপ্রকার উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

মিত্রশক্তিবর্গের অসম্মতি—বিকল্প ব্যবস্থা—রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক ১৫ বৎসরের জন্য অধিকার—রাইন অঞ্চলের নিরস্ত্রীকরণ

জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি : অকার্যকারিতা

রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমা সম্প্রসারণ, ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কোন কিছুই কার্যকরী না হওয়ায় ফ্রান্স লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র (Covenant) অনুসারে যতটুকু নিরাপত্তা দাবি করিতে পারিত তাহা ভিন্ন অধিক কোন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইল না। কিন্তু লীগের চুক্তিপত্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসাবে কতটুকু মূল্যবান সেবিষয়ে ফ্রান্স প্রথম হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর দশম শর্তে 'সম্মিলিতভাবে বা যুগ্ম আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার' (Collective Security) কথা বর্ণিত ছিল। এই শর্তানুসারে লীগের সকল সদস্যরাষ্ট্র যুগ্মভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তা, প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষা করিবে এবং কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে কি উপায়ে এই সকল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।*

লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার শর্ত

*** League of Nations Covenant :**

Article : 10. "The members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity (Contd.)

এদিকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পয়েনকেয়ারি (Poincare)-এর চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনবোধে ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্যদানে রাজী হইয়াছিলেন বটে (১৯২২), কিন্তু ঠিক কি ধরনের এবং কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া নিজ দায়িত্ব বাড়াইতে চাহিলেন না। ইহাতে অদূরদর্শী ফরাসী প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিশের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমতাবস্থায় লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর যুগ্ম নিরাপত্তার শব্দটির উপরই ফ্রান্সকে নির্ভর করিতে হইল। লীগ চুক্তিপত্রের দশম শর্তটিকে কার্যকরী করিবার জন্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ, আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্যদান, আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন করা প্রভৃতি নানা উপায় ষোড়শ শর্তে বর্ণিত ছিল।

ফ্রান্স কর্তৃক ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যাত

কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগের চুক্তিপত্রে ১০ম ও ১৬শ শর্ত সম্পর্কে জেনিভায় লীগের এক সাধারণ সভার (League Assembly) আলোচনায় স্থির হয় যে, আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা প্রত্যেক দেশের সরকার স্থির করিবেন। ফলে, লীগের চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট ১০ম ও ১৬শ

লীগ চুক্তিপত্রের ১০ম ও ১৬শ শর্তের ব্যাখ্যা—লীগের দুর্বলতা বৃদ্ধি

and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

16. (*a*) "...severance of all trade or financial relations, the prohibition of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant breaking state and the national of any other state, whether a Member of the League or not".

(*b*) "...to recommend...what effective military, naval or airforce the members of the League shall severally contribute to the armed forces to be raised to protect the Covenant of the League."

(*c*), (*d*)..." [For details see Appendix].

শর্ত দুইটির আর কোন প্রকৃত মূল্য রহিল না। যুগ্ম নিরাপত্তার মূলভিত্তিই দুর্বল হইয়া পড়িল।

এদিকে ক্ষতিপূরণ কমিশন (Reparation Commission) জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া জার্মানিকে একথা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিল যে, জার্মানি যদি ক্ষতিপূরণ কমিশন নির্ধারিত ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণদানে স্বীকৃত না হয় এবং সেজন্য বাৎসরিক ১০ কোটি পাউণ্ড ও মোট রপ্তানি বাণিজ্যের ২৫ শতাংশ দিতে রাজী না হয় তাহা হইলে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী জার্মানির শিল্পপ্রধান রুহ্‌র (Ruhr) অঞ্চল দখল করিবে। এই সময় হইতেই ফ্রান্স রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। জার্মানির শিল্পপ্রধান রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিতে পারিলে একদিকে যেমন জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, পক্ষান্তরে জার্মানির দুর্বলতার অনুপাতে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাইবে। জার্মানির ক্ষতিপূরণদানে অক্ষমতাহেতু বিলম্বের অজুহাতে ফ্রান্স একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল যে, জার্মানি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণদানে বিলম্ব করিতেছে। এইজন্য ফ্রান্স ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে সৈন্য প্রেরণ করিয়া জার্মানির রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল। এই অদূরদর্শী পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য সাময়িকভাবে ক্ষুন্ন হইল। তদুপরি যে আশা লইয়া রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করা হইয়াছিল উহাও বিফলতায় পর্যবসিত হইল। রুহ্‌র অঞ্চল হইতে বলপূর্বক লব্ধ অর্থ দ্বারা সেই অঞ্চলে মোতায়েন ফরাসী ও বেলজিয়াম সৈন্যের ব্যয় সঙ্কুলানই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল।

ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল

রুহ্‌র দখলের অদূরদর্শিতা

রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার যখন ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অদূরদর্শিতার এক চরম দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া পড়িল তখন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পয়েনকেয়ারির উপর ফরাসী জাতির আস্থা বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ফলে, তাঁহার স্থলে হেরিয়ট (Herriot) প্রধানমন্ত্রী হইলেন। ইংলণ্ডে সেই সময়ে শ্রমিকদল রামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald)-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করিল। ডাওয়েজ কমিটিও ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিলে স্বভাবতই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কতক পরিমাণে শান্তভাব ধারণ করিল। ফ্রান্স পুনরায় যুগ্ম নিরাপত্তার দিকে মনোযোগী হইয়া লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর মাধ্যমে জার্মানির

সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতে সচেষ্ট হইল। ইহার অব্যবহিত পূর্বে (১৯২৩) ফরাসী সরকারের চেষ্টায় পরস্পর সাহায্য-সহায়তার এক চুক্তির খসড়া (Draft Treaty of Mutual Assistance) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখিবার মধ্যেই ইওরোপ তথা ফ্রান্সের নিরাপত্তা নিহিত এই ধারণা ফরাসী সরকার মিত্রপক্ষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তির খসড়া রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। লীগের চুক্তিপত্র (Covenant) অনুযায়ী আঞ্চলিক মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে পরস্পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। 'পরস্পর সাহায্য-সহায়তা চুক্তি'র (Treaty of Mutual Assistance) খসড়ায় সেই আঞ্চলিক মৈত্রী কিরূপ হইতে পারে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এই খসড়ায় বলা হইল যে, কোন দেশের পক্ষে অপর কোন দেশ আক্রমণ করা আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া ধরা হইবে এবং এইরূপ আক্রমণের চারিদিনের মধ্যে কোন্‌টি আক্রমণকারী দেশ তাহা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর কাউন্সিল কর্তৃক ঘোষিত হইবে। ইহা ভিন্ন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের দায়িত্ব এই খসড়া স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, একথাও স্থির হইল। ইহা ভিন্ন যে গোলার্ধে আক্রমণাত্মক কার্য ঘটিবে উহার বাহিরের অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের কোন দায়িত্ব স্বাক্ষরকারী দেশের থাকিবে না এবং লীগ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে আঞ্চলিক নিরাপত্তার চুক্তি রাষ্ট্রবর্গ স্বাক্ষর করিতে পারিবে। সর্বশেষে এই খসড়ায় একথাও বলা হইল যে, এই খসড়া স্বাক্ষরের পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করিতে হইবে। সামরিক শক্তি হ্রাস না করিলে কোন রাষ্ট্র 'পরস্পর সাহায্যের চুক্তি'র শর্তানুযায়ী সাহায্য পাইবে না।

লীগ-অব ন্যাশন্‌স্‌-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা

'পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি'র খসড়া (Draft Treaty of Mutual Assistance, 1923)

এই চুক্তির খসড়া আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। এমন কি ফ্রান্সও এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হইল না, কারণ, এই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বেই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রশ্ন ছিল।

চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যাত

শেষ পর্যন্ত এই পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি (১৯২৩) বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

জেনিভা প্রোটোকোল, ১৯২৪ (Geneva Protocol, 1924): লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভায় (Assembly) পঞ্চম অধিবেশনে (১৯২৪ খ্রীঃ) Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes নামে একটি দলিল প্রস্তুত করা হইল। গ্রীস ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিদ্বয় এই দলিলটি রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণত এই দলিলটি 'জেনিভা প্রোটোকোল' (Geneva Protocol) নামেই পরিচিত। জেনিভা প্রোটোকোলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ' (International crime) বলিয়া অভিহিত করা হইল। এই দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (১) পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। (২) আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত অথবা চুক্তির শর্তাদির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিরোধ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে। (৩) যে সকল বিবাদ বা বিরোধে কোন আইন বা ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত থাকিবে না সেগুলি লীগের কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবে। (৪) লীগ কাউন্সিল যদি সর্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারে তাহা হইলে কাউন্সিল সালিশ (Arbitrators) নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর উহার বিচার ভার ন্যস্ত করিবে। এই সালিশদের সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। (৫) যে রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে অপর রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হইবে না বা লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অথবা লীগ কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত সালিশদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজী হইবে না, বা বিবাদটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় যুদ্ধ শুরু করিবে উহাকে 'আক্রমণকারী দেশ' (Aggressor) বলিয়া অভিহিত করা হইবে। (৬) লীগ কাউন্সিল আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করিতে পারিবে, লীগের চুক্তিপত্র ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে অথবা যে দেশ লীগ কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক বিচারালয় অথবা সালিশদের সিদ্ধান্ত অমান্য করিবে সেই সকল দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন, বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজস্ব রাজ্যসীমা অথবা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধরত দেশকে সামরিক সাহায্য দান করিতে পারিবে। (৭) আক্রমণকারী

জেনিভা প্রোটোকোলের (Geneva Protocol) শর্তাদি

দেশের উপর যুদ্ধসৃষ্টির ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইবে, কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নির্ধারণ করা চলিবে না। (৮) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহূত হইবে জেনিভা প্রোটো-কোল-এ এই শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। (৯) জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্তে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কেও লীগ কাউন্সিল বিচার-বিবেচনা করিতে পারিবে, একথাও সন্নিবিষ্ট হইল।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মাত্রেই জেনিভা প্রোটোকোল স্বাক্ষর করিতে আগ্রহান্বিত হইলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহার শর্তাদি আপত্তিকর বলিয়া মনে করিল এবং এই কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করিলে জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইল। কোন কোন লেখকের মতে ইংলণ্ডে লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন ও সেই স্থলে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার গঠন জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতির অন্যতম গুণ হইল এই যে, মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন করা হয় না। পররাষ্ট্র-নীতির মূল ধারা অপরিবর্তিত রাখিয়া চলা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত নীতি। তথাপি লেবার পার্টির মন্ত্রিসভার পতন এবং নূতন রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক কার্যভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের মধ্যবর্তী কালে জেনিভা প্রোটোকোল-এর ত্রুটিসমূহ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হয়ত রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা উহা গ্রহণে প্রস্তুত হন নাই। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নসমূহ ছিল জেনিভা প্রোটোকোল-এর বিরোধী। কারণ, এই প্রোটোকোল-এর একাদশ শর্তের বলে আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কেও এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে লীগ কাউন্সিলের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য যে-কোন অভিযোগ উপস্থাপন করিতে পারিত। এই শর্তটি জাপানের চেষ্টায় জেনিভা প্রোটোকোলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ জাপানী আগন্তুকদিগকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। জেনিভা প্রোটোকোলের একাদশ শর্তানু-সারে এই ধরনের সমস্যা জাপান লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে এই আশঙ্কা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি করিয়া-

ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন-গুলির বিরোধিতা

জেনিভা প্রোটো-কোলের একাদশ শর্তের ত্রুটি

ছিল।) তদুপরি আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য নীতির অনুকরণে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি বিশেষভাবে কানাডা, ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ইচ্ছুক ছিল। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও ছিল প্রোটোকোলের ষোড়শ শর্তানুযায়ী সামরিক সাহায্য দানের বিরোধী। কারণ, এই শর্তানুযায়ী সামরিক সাহায্য দানের দায়িত্ব এই সকল দেশের নিজস্ব উন্নয়নের পরিপন্থী হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিত। এই সকল কারণ ভিন্ন (বাধ্যতামূলকভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সালিশীর যে ব্যবস্থা জেনিভা প্রোটোকোলে করা হইয়াছিল উহা বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে নাই। আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শাস্তি-দানের নীতিও বিভিন্ন দেশে, প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, সমর্থন পায় নাই। এই সকল কারণের পরিপেক্ষিতে বল্‌ডুইনের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হইলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অস্টেন চেম্বারলেন জেনিভা প্রোটোকোল ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিবেন না একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন।* গ্রেটব্রিটেন কর্তৃক জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার অপমৃত্যু ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের যে শর্ত উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল উহারও কোন মূল্য রহিল না।)

জেনিভা প্রোটো-কোলের অপমৃত্যু

(জেনিভা প্রোটোকোল বাতিল হইয়া গেলেও ইহার কতকগুলি যে বিশেষ গুণ ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রথমত, জেনিভা প্রোটোকোল লীগ চুক্তিপত্র (Covenant)-এর কতকগুলি ত্রুটি দূর করিতে সচেষ্ট ছিল)। লীগ চুক্তিপত্রে যে সকল শর্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে লীগ কাউন্সিলে মতানৈক্য ঘটিলে উহার কিভাবে মীমাংসা করা যাইবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না। জেনিভা প্রোটোকোল এইরূপ পরিস্থিতিতে বিষয়টি সালিশীর জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং সালিশীদের সিদ্ধান্ত বিবদমান রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরী হইবে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছিল। এইভাবে লীগ চুক্তিপত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি দূরীভূত হইয়াছিল।

জেনিভা প্রোটো-কোলের গুণ : (১) লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটি সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরীভূত

---

*Vide Carr, pp. 91-92 ; Hardy, pp. 70-72.

(২) আভ্যন্তরীণ সমস্যা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার ভার লীগ কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত

দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সমস্যা-প্রসূত বিবাদ সম্পর্কে পরস্পর বিবদমান দেশ একাদশ শর্তানুযায়ী লীগ কাউন্সিলের বিচার-বিবেচনা প্রার্থনা করিতে পারিবে—এই ব্যবস্থার ফলে আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়া দুই দেশের বিবাদের মীমাংসার পথ জেনিভা প্রোটোকোলে করা হইয়াছিল।*

(৩) নিরস্ত্রীকরণের জন্য সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা

তৃতীয়ত, জেনিভা প্রোটোকোল নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে (১৫ই জুন, ১৯২৫) 'নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন' (Disarmament Conference) আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

(৪) 'আক্রমণের' (Aggression) সংজ্ঞা নির্দেশ

চতুর্থত, জেনিভা প্রোটোকোল 'আক্রমণ' (Aggression) বলিতে কি বুঝাইবে অর্থাৎ কিরূপ পরিস্থিতিতে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

কিন্তু জেনিভা প্রোটোকোল একেবারে ত্রুটিশূন্য ছিল না। লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সামরিক ব্যবস্থার যে নীতি বর্ণিত ছিল উহার কোন কার্যকরী রূপ বা ব্যবস্থা লীগ চুক্তিপত্রে উদ্ভাবিত হয় নাই। জেনিভা প্রোটোকোলের ত্রয়োদশ শর্তে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে কি কি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র কি পরিমাণ সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনী দিয়া সাহায্য করিবে সে সম্পর্কে লীগ কাউন্সিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবে এ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু কোন দেশকে লীগ কাউন্সিল 'আক্রমণকারী দেশ' (Aggressor) বলিয়া ঘোষণা করিবামাত্র উহার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করা হয় নাই।

---

* "The Covenant left the door open for war, not only in cases when the Council, voting without the parties, failed to pronounce an unanimous judgment on a dispute, but also in cases where the subject of the dispute was ruled to be a matter within the domestic jurisdiction of one of the parties. The Protocol sought to close these two *gaps.*" Carr, p. 90.

বস্তুত, লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তটি পূর্ববৎই দুর্বল রহিয়া গিয়াছিল। জেনিভা প্রোটোকোল বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের বিবেচনার অধিকার লীগ কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিয়া রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। ইহাও এই প্রোটোকোলের ত্রুটি হিসাবে বিবেচ্য। ইহা ভিন্ন জেনিভা প্রোটোকোল ফ্রান্সের সনির্বন্ধতায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়া নানা ত্রুটিপূর্ণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তির সংরক্ষণের উপরই আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভরশীল এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির কোন শর্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন যাহাতে লীগ কাউন্সিলে উপস্থাপিত না হইতে পারে সেজন্য ফ্রান্স এই ধরনের পরিবর্তন 'আন্তর্জাতিক বিবাদ'-এর পর্যায়ভুক্ত হইবে না একথা জেনিভা প্রোটোকোলে সন্নিবিষ্ট করাইয়া লইয়াছিল। ফলে, প্যারিসের শান্তি-চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া জেনিভা প্রোটোকোল লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। যাহা হউক, ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়নগুলির বিরোধিতার ফলে জেনিভা প্রোটোকোল অকার্যকর হইয়া গেল।

জেনিভা প্রোটোকোলের ত্রুটি

৮. **লোকার্ণো চুক্তিসমূহ (Locarno Treaties) :** জেনিভা প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যাত হইলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা পুনরায় ফরাসী সরকারের ভীতি ও অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ইংলণ্ডের অসম্মতির ফলেই প্রধানত জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এজন্য স্বভাবতই ফরাসী সরকারের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকারই দায়ী ছিলেন। ফ্রান্সের নিরাপত্তার ব্যবস্থার উপর ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাইন অঞ্চল সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের কোন প্রতিশ্রুতিদানে রাজী হইবেন না এ কথাও ফরাসী সরকারের অবিদিত ছিল না। সুতরাং ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার অন্য পন্থা খুঁজিতে লাগিল। এদিকে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যে পরস্পর সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল উহার উপশমের উদ্দেশ্যে* ১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত পরস্পর যুদ্ধ-নিরোধ চুক্তি সম্পাদনের, পরস্পর রাজ্যসীমা অপরিবর্তিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দানের এবং পরস্পর বিবাদ-

ফ্রান্স কর্তৃক পুনরায় নিরাপত্তার জন্য উপায় অন্বেষণ

---

* Vide : Langsam, p. 80.

বিসংবাদে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশ নিয়োগের জন্য যথাযথ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব জার্মানি উত্থাপন করিয়াছিল। একাধিকবার এই প্রকার প্রস্তাব জার্মানি করিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করিলে স্বভাবতই এই ব্যাপারে কোন-কিছু করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হইলে জার্মান-প্রধান এবং পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ষ্ট্রেসিম্যান, পুনরায় পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির প্রশ্ন ফরাসী সরকারের নিকট উত্থাপন করিলেন। এবার ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশ-ই জার্মানির প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। ফরাসী সরকারের ইচ্ছানুক্রমে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইতালিকে এই বিষয়ে আলোচনাকালে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোকার্ণো নামক স্থানে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উপরি-উক্ত সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে সমবেত সকল দেশের প্রতিনিধিই সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার লাভ করিবার ফলে সম্মেলনের আলাপ-আলোচনায় এক অভূতপূর্ব সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লোকার্ণো সম্মেলনেই সর্বপ্রথম বিজিত ও বিজেতার মধ্যে সম-মর্যাদা, সম-অধিকার ও সৌহার্দ্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল। এই পরিবর্তিত মনোবৃত্তি 'Locarno Spirit' নামে অভিহিত। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি ও বেলজিয়াম এক 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি চুক্তি' (Treaty of Mutual Guarantees) স্বাক্ষর করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের পৃথকভাবে এক একটি করিয়া মোট চারিটি সালিশী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের সহিত পৃথকভাবে পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার পরস্পর প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তি (Treaties of Guarantee) স্বাক্ষরিত হইল। এই মোট সাতটি চুক্তি একত্রে 'লোকার্ণো চুক্তিসমূহ' বা Locarno Treaties or Pacts নামে পরিচিত।

লোকার্ণো চুক্তিসমূহ: (১) জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির মধ্যে 'পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি' (Treaty of Mutual Guarantee), (২-৫) জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি ও পোল্যাণ্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে পরস্পর বিবাদে সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসার চুক্তি (Arbitration and Conciliation Treaties), (৬-৭) ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি (Treaties of Guarantee)

উপরি-উক্ত চুক্তিগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল জার্মানি এবং ফ্রান্স,

ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ইতালির পরস্পর প্রতিশ্রুতির চুক্তি। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পৃথক পৃথক এবং সমবেতভাবে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী পরস্পর রাজ্যসীমা যাহাতে অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অনুসারে বেলজিয়াম ও জার্মানির এবং ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী যে সীমারেখা নির্ধারিত হইয়াছিল উহা যাহাতে বজায় থাকে (Status Quo) সেজন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। ইহা ভিন্ন জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কেবলমাত্র (১) দেশরক্ষা, (২) লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর আদেশ পালনের জন্য এবং (৩) রাইন অঞ্চলের বেসামরিকীকরণের (demilitarization) অন্যথা ঘটিলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে নতুবা নহে—এই প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই সকল পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে কোনটি যদি অন্যায়ভাবে অর্থাৎ এই চুক্তির শর্ত-বহির্ভূতভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অপরাপর স্বাক্ষরকারী দেশ উহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য থাকিবে। কোন ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হইতেছে কি না সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলে লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চাওয়া হইবে। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর সদস্য করা হইল এবং জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এর সদস্যভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকার্ণো চুক্তি বলবৎ হইবে স্থির হইল।

(১) নং চুক্তির শর্তাদি

বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানির যে সালিশী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই চুক্তির শর্তানুসারে এই সকল দেশ পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ যদি কূটনৈতিক উপায়ে মিটাইতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে সে বিবাদ কোন সালিশী সংস্থা অথবা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে স্থির হইল। লোকার্ণো চুক্তির পূর্বেকার বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না। স্বভাবতই পোল্যাণ্ডের করিডোর (Polish Corridor)-সংক্রান্ত বিবাদ এই চুক্তির আওতায় পড়িল না।

(২—৫) নং চুক্তির শর্তাদি

ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উহার শর্তানুসারে স্থির হইয়াছিল যে, লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গকারী কোন দেশ কর্তৃক ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড কিংবা চেকোস্লোভাকিয়ার কোনপ্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

(৬—৭) নং চুক্তির শর্তাদি

লোকার্ণো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল বলিয়া সাধারণত বলা হইয়া থাকে। বস্তুত, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ইহাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এই চুক্তি পরাজিত জার্মানিকে বিজয়ী শক্তিবর্গের সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া এবং জার্মানি ও ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ডাওয়েজ কমিটি কর্তৃক জার্মানির প্রতি যে উদারতা প্রদর্শনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল, উহারই অনুসরণ করিয়াছিল। জার্মানি পুনরায় ইওরোপীয় শক্তিসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। লোকার্ণো চুক্তি ফরাসী নিরাপত্তার সমস্যা, জার্মানির হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সমস্যা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার আগ্রহ এই তিনটি সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিল। ইংলণ্ডের দিক হইতে বিচার করিলে লোকার্ণো চুক্তি ব্রিটিশ সরকারকে ফরাসী-জার্মান শক্তিদ্বয়ের নিয়ন্তার পদে স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় শক্তি-সাম্যের চাবিকাঠি ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল। এজন্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অস্টেন চেম্বারলেন বলিয়াছিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুগের অবসান ঘটাইয়া শান্তির যুগের সূচনা করিয়াছিল। ফলে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির কঠোরতা এবং রুহ্‌র অঞ্চল দখলের ফলে জার্মান জাতির মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া কতকটা সৌহার্দ্য-মূলক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল।)

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে সমদামযিক ধারণা

লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করা হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে লোকার্ণো চুক্তি অথবা লোকার্ণো সম্মেলনে যে সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব (Locarno Spirit) পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা শান্তি রক্ষার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। লোকার্ণো চুক্তির শর্তানুসারে একথা বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স যেমন রাইন অঞ্চলের উপর সংরক্ষণের দাবি ত্যাগ করিয়াছিল তেমনি জার্মানিও আলসেস্-লোরেনের উপর অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানির পূর্বদিকের সীমা সম্পর্কে ইংলণ্ড কোনপ্রকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেমন হয় নাই, জার্মানিও তেমনি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত পূর্বসীমারেখা যে মানিয়া লয় নাই তাহা লোকার্ণো চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে

লোকার্ণো চুক্তির ত্রুটিসমূহ :

জার্মানির পূর্বসীমা সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব

বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এজন্য ফ্রান্সকে এককভাবে পোল্যাণ্ড ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার সহিত পরস্পর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল সেরূপ সৌহার্দ্যের মনোবৃত্তি পরবর্তী যুগে তেমন প্রদর্শিত হয় নাই। অবশ্য এই মনোবৃত্তি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কেলগ্‌-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি (Kellogg-Briand Pact or Pact of Paris) পর্যন্ত অল্প-বিস্তর টিকিয়াছিল। কিন্তু Locarno Spirit যে প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতাশূন্য ছিল তাহা ক্লীমেনশো'র উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির এক অতি দুর্বল ব্যবস্থা মাত্র। ভাবাবেগপূর্ণ মনকে লোকার্ণো চুক্তি সম্মোহিত করিতে পারিলেও ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া এই চুক্তি ক্ষতিকারক।* স্বভাবতই ফ্রান্স যে নিরাপত্তার উপায় অন্বেষণে সচেষ্ট ছিল লোকার্ণো চুক্তিতে তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

ফরাসী নিরাপত্তার চেষ্টা আংশিক সফল

লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ডের উপর যে সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ মাত্রায় ছিল একথা বলা চলে না। কারণ, গণতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ব্যাপারে জনমতের প্রভাব নেহাৎ কম নহে। লোকার্ণো চুক্তির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সামরিক সাহায্য দান ব্যাপারে ব্রিটিশ জনমত যে বিরোধী হইবে না উহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে† ব্রিটিশ সরকার কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য বাস্তবক্ষেত্রে

*"The Locarno Pact offers a fragile appearance of a guarantee. It is an illusion which will delude facile minds and put vigilance to sleep. The spirit of Locarno itself a threat to the interest of our country." *Clemenceau.*

†"A democracy can hardly resort to war without the support of national opinion. It is still more probable that in such a case public opinion would be hopelessly divided on the merits. So long, however, as British intervention was feared by the potential aggressors of both sides, it seemed unlikely that the reality of the Pact would be put to the test." Hardy, p. 76.

দিতে পারিতেন সেই প্রশ্নের কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ, কেবলমাত্র ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আছে একথাই আক্রমণকারী দেশের ভীতির সঞ্চার করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সুতরাং লোকার্ণো চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া কোন দেশই ব্রিটিশ শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। কিন্তু এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে সমর্থন করা যায় না। বস্তুত, লোকার্ণো চুক্তি গ্রহণে এবং জার্মানিকে বিজেতাদের সমপর্যায়ে পুনঃস্থাপনের পশ্চাতে অন্য গুরুতর প্রশ্ন জড়িত ছিল। ব্রিটিশ সরকার একথা-ই বুঝিয়াছিলেন যে, জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের ঐক্যবদ্ধতা জার্মানিকে ক্রমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবে। ইতিপূর্বে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে র‍্যাপালো (Rapallo)-এর চুক্তি এই ভীতির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের নিকট সাম্যবাদ ও জার্মানি—এই দুয়ের মধ্যে সাম্যবাদ ছিল অধিকতর ভীতিপ্রদ। এইজন্যই ইংলণ্ড লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া বিশাল সামরিক দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ডের সামরিক দায়িত্ব

ইংলণ্ডের রুশ ভীতিতে লোকার্ণো চুক্তির মূল তাৎপর্য নিহিত

লোকার্ণো চুক্তি লীগ চুক্তিপত্রের (League Covenant) দুর্বলতাও প্রমাণ করিয়াছিল। কারণ লীগ চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য-সহায়তায় প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও লোকার্ণো চুক্তিতে পুনরায় পরস্পর সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সুতরাং লীগ চুক্তিপত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পর সামরিক সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর না করিলে কোন রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সাহায্য দানে বাধ্য নহে, এই ধারণাই লোকার্ণো চুক্তি হইতে জন্মিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভার্সাই-এর চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষিত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পুনরায় লোকার্ণো চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার ফলে এ কথাই প্রতীত হইল যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বেচ্ছাধীনভাবে পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ না হইলে ভার্সাই-এর চুক্তি তথা এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইবে না। দশবৎসর পর যখন জার্মানি ভার্সাই-এর শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই জার্মানির বিরোধিতা করে নাই। ফলে, লোকার্ণো

ভার্সাই-এর চুক্তি ও লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি

চুক্তি একদিকে যেমন ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির আন্তর্জাতিক প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল অপর দিকে উহা তেমনি লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।*

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকার্ণো চুক্তিতে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কোন কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে উহা জেনিভা প্রোটোকোল অপেক্ষা বহু পশ্চাতে ছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে যুগ্ম নিরাপত্তা নীতিও লোকার্ণো চুক্তিতে সমর্থিত হয় নাই।

নিরস্ত্রীকরণ নীতি উপেক্ষিত

সর্বশেষে, লোকার্ণো চুক্তিদ্বারা একমাত্র জার্মানির স্বার্থ-ই সিদ্ধ হইয়াছিল। এই চুক্তি জার্মানিকে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের সম-মর্যাদায় পুনঃ-স্থাপন করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তিতে জার্মানির যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছিল। আবার জার্মানির পূর্বসীমা সম্পর্কে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে এই সীমারেখা লঙ্ঘন করিবার নৈতিক দাবি জার্মানির আছে একথাই পরোক্ষভাবে ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই চুক্তির পর রাইন অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী অপসারণও দ্রুততর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই চুক্তি ফ্রান্সের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে নাই। এই কারণেই ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে 'ম্যাজিনো লাইন' (Maginot Line) নামক সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

জার্মানির স্বার্থবৃদ্ধি

কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি (Kellog-Briand Pact or Pact of Paris) : 'লোকার্ণো স্পিরিট' (Locarno Spirit) পূর্ণমাত্রায় বজায় না থাকিলেও লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে

*"In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Covenant. It encouraged both the view that the Versailles Treaty, unless confirmed by other engagement of a voluntary character lacked binding force, and the view that governments could not be expected to take militay action in defence of frontiers in which themselve were not directly interested. Ten years later, nearly all governments appeared to be acting on these assumptions." Carr : p. 97. Also read p. 96.

উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রধানত আমেরিকা ও ফ্রান্সের চেষ্টায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফরাসী বদান্যতার প্রকাশস্বরূপ ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াঁ আমেরিকার সহিত যুদ্ধ-নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করিবার প্রস্তাব করেন (৬ই এপ্রিল, ১৯২৭)। সেই সময়ে আমেরিকায় যুদ্ধ-নিরোধ সম্পর্কে এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতই ব্রিয়াঁর প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাগ্রহে গৃহীত হইল। কিন্তু মার্কিন সেক্রেটারী কেলগ্ পাল্টা প্রস্তাব করিলেন যে, যুদ্ধ-নিরোধ কেবলমাত্র ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হইয়া অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত যুগ্মভাবে স্বাক্ষরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি ইতিপূর্বেই যুদ্ধ-নিরোধের প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিশ্রুত ছিল। স্বভাবতই অপরাপর রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইল না। ফল-স্বরূপ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। প্রথমে মোট পনরটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিলেও চারি বৎসরের মধ্যে উহার স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৬২-তে দাঁড়াইল।

কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তির পটভূমিকা

৬২টি রাষ্ট্র কর্তৃক কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষরিত

আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রগুলির মধ্যে কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি ছিল সর্বাপেক্ষা স্বল্প-পরিসর। প্রথমে উহার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া একটি প্রস্তাবনা এবং উহার সহিত মোট তিনটি ধারা সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর-কারী রাষ্ট্রবর্গ পৃথিবীর জনসাধারণের উন্নতি সাধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের-জনগণের মধ্যে চিরস্থায়ী মিত্রতা বৃদ্ধি, পরস্পর রাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ধারণে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ এবং পৃথিবীর সভ্য জনসমাজকে যুদ্ধ-নিরোধের নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইল।

কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তির প্রস্তাবনা

প্রথম ধারায় স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে বা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যুদ্ধ-বিগ্রহ অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা বলিয়া বর্ণনা করিল এবং প্রত্যেকে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণে এবং সমস্যা সমাধানে যুদ্ধ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইল।

যুদ্ধ-নিরোধ

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা

দ্বিতীয় ধারায় বলা হইল যে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর সর্বপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করিবে।

অপরাপর রাষ্ট্রকে চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগদান

তৃতীয় ধারা অনুসারে স্থির হইল যে, এই চুক্তিপত্র অপরাপর রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পন্থা বন্ধ হইয়াছিল সেকথা বলা চলে না।

কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তির সমালোচনা : বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ চুক্তির বহির্ভূত

প্রথমত, নিজ দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ অথবা লীগ কাউন্সিলের নির্দেশ অনুসারে—অর্থাৎ লীগ চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী যুদ্ধ, কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তিভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উপনিবেশ ও বিশেষ স্বার্থরক্ষার্থ যুদ্ধ, পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি-প্রসূত দায়িত্ব পালনের জন্য যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তিদ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় নাই। ,সুতরাং কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল বলা যায় না ; কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধই এই চুক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

চুক্তি কার্যকরী করিবার বাস্তব ব্যবস্থার অভাব

কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তির অপর ত্রুটি ছিল এই যে, ইহার নীতি বা শর্তাদি কিভাবে কার্যকরী করা হইবে সেই ব্যবস্থা ইহাতে করা হয় নাই। এই চুক্তি জনমতের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির নৈতিক জ্ঞানের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, জনমতের চাপে এবং নৈতিক জ্ঞানের প্রভাবে আক্রমণকারী দেশ শেষ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক কার্য হইতে বিরত হইবে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপানের বিবাদের কালে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি অনুসারে আক্রমণকারী দেশের শাস্তিবিধানের জন্য কার্যকরী বাস্তব ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

অ-ঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার অভাব

এই চুক্তির অপর ত্রুটি ছিল এই যে, ইহা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া আক্রমণাত্মক কার্যাদির (Acts short of war) বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। ফলে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর অ-ঘোষিত যুদ্ধ (undeclared war) অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যুদ্ধ শুরু করিবার রীতি অনুসৃত হইতে থাকে। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে এই চুক্তি যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে

নাই। যুদ্ধ ঘৃণ্য কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং 'যুদ্ধ-নিরোধ' ইহাতে হইয়াছে বলা যায় না। যে সকল রাষ্ট্র নিজে ছিল শান্তিকামী সেগুলিও প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান ছিল না।

লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি

কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি লীগ চুক্তিপত্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। লীগ চুক্তিপত্র সর্বপ্রকার যুদ্ধই রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি নানাপ্রকার যুদ্ধকে ইহার বহির্ভূত রাখিয়া নানা অজুহাতে যুদ্ধ-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলিতে কি বুঝায় তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ না করিয়া যে কোন কারণে আরব্ধ যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলিয়া চালাইবার কোন অসুবিধা ইহাতে ছিল না।

কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তির গুণ

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র হিসাবে যুদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রুতিদান এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তি এক নূতন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যুদ্ধকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাশিয়া আমেরিকার ন্যায় বিশাল দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ছিল। লীগের সদস্য না হইয়াও এই দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কার্যে যোগদান পৃথিবীর শান্তি রক্ষার কার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কেলগ্-ব্রিয়ঁা চুক্তিতে পৃথিবীর জনসাধারণ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কতদূর ব্যাকুল তাহাও প্রকটিত হইয়াছিল। ইহা স্বভাবতই আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।

যৌথ নিরাপত্তা ও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ (Collective Security and League of Nations): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংসাত্মক ফলাফল ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মনে যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালীন শক্তি-সাম্য নীতি বা রাষ্ট্রের নিজস্ব সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করা সম্ভব নহে একথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। যৌথ নিরাপত্তা অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার তথা ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সহজতর হইবে এই ধারণা রাষ্ট্রসমূহের মনে জাগরিত হয়। ইহার ফলে যৌথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যৌথ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা Collective Security'র মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা শুরু হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এই যৌথ প্রচেষ্টারই উদাহরণ, বলা বাহুল্য।

যৌথ নিরাপত্তা বলিতে এমন একটি যৌথ ব্যবস্থা বুঝায় যাহাতে কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রের অথবা সেই রাষ্ট্র ও উহার মিত্ররাষ্ট্রের সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে। যৌথ নিরাপত্তা বা Collective Security পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থায় "প্রত্যেক রাষ্ট্র সকল রাষ্ট্রের এবং সকল রাষ্ট্র প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত" (one for all and all for one), এই ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে যে যৌথ নিরাপত্তা গড়িয়া তুলিবে তাহার বিরুদ্ধে কোন একটি বা কয়েকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। সকল রাষ্ট্র যখন যৌথভাবে নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট তখন কোন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কারণ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অপর সকল রাষ্ট্র যৌথভাবে উহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে। ফলে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর আক্রমণের ইচ্ছা থাকিলেও সে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে না।

যৌথ নিরাপত্তা বা Collective Security'র মূল অর্থ

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়া তুলিতে কতকগুলি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন হইবে। যেমন পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের এক বিরাট অংশ এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকিবে যাহাতে কোন একটি রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্রের জোট যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। কারণ তাহারা জানিবে যে, আক্রমণ করিলে অপরাপর সকল রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এমতাবস্থায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে পারিবে, বলা বাহুল্য। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠনকারী দেশসমূহ পৃথিবীর নিরাপত্তা সম্পর্কে একই উদ্দেশ্য, একই নীতি ও একই ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবে। তাহাদের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত বা নিজ নিজ স্বার্থ পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভুলিয়া যাইতে হইবে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এরূপ আদর্শ পরিস্থিতি গড়িয়া তোলা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কারণ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী দেশ এককভাবে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ কখনও করিবে না, নিজ মিত্রবর্গের সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করিয়া

প্রকৃত যৌথ নিরাপত্তা কার্যকরী করিবার শর্তসমূহ

যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ পরিস্থিতি গড়িয়া তোলার অসুবিধা

এবং সামরিক ক্ষেত্রে জোটবদ্ধভাবেই সেই দেশ আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে। ইহাও উল্লেখ্য যে, যৌথ নিরাপত্তা যে পরিস্থিতির রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হইবে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিবেই। যেমন, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ যে যৌথ নিরাপত্তা বা Collective Security'র ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল অর্থাৎ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল উহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি অপরিবর্তিত রাখিবার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত ছিল। অথচ সেই পরিস্থিতি ভবিষ্যতেও বজায় রাখা অর্থাৎ Status Quo বজায় রাখা কতক কতক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বার্থবিরোধী ছিল। জার্মানি এবং অপরাপর বহু রাষ্ট্রই প্যারিসের শান্তি-চুক্তির বহু শর্তের বিরোধী ছিল। এমতাবস্থায় প্রকৃত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় সেই অর্থে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ যৌথ নিরাপত্তার সংস্থা ছিল একথা বলা চলে না। এই কারণেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই বা প্রকৃত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের অন্তরে যে ভীতির সৃষ্টি হইবার কথা, তাহা লীগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর উদ্দেশ্য ও শর্তাদি রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এককভাবেই লঙ্ঘন করা সম্ভব হইয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর কার্যকারিতা এজন্যই তেমন ছিল না।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি

বিভিন্ন রাষ্ট্র বৃহত্তর স্বার্থের অর্থাৎ সমষ্টির স্বার্থে নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগে প্রস্তুত না হইলে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব-বোধ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইলে এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও রাজনৈতিক বিরোধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে না।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকরী করার অসুবিধা

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আক্রমণকারীর শাস্তিদানের ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল ছিল। লীগের সনন্দে সেই ক্ষমতা ১৬ নং শর্তে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তা সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ প্রথম হইতেই বহুলাংশে দুর্বল এবং অক্ষম ছিল। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগে যোগদান না করা, লীগের বাহিরে সোবিয়েত রাশিয়ার অভ্যুত্থান, ইংলণ্ড কর্তৃক পূর্ণমাত্রায় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণের অনিচ্ছা, ফ্রান্স কর্তৃক

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে লীগের ত্রুটি

নিজ সংকীর্ণ স্বার্থানুসন্ধান প্রভৃতি এবং অল্পকালের মধ্যেই জাপান, ইতালি, ও জার্মানি কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে লীগ্‌কে অমান্য করা ও লীগ সনদের শর্তাদি লঙ্ঘন করা প্রভৃতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌কে অকার্যকর করিয়া ফেলিয়াছিল।

১৬ নং শর্তে যে ক্ষমতা লীগের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহা কোন পরিস্থিতিতেই লীগ প্রয়োগ করে নাই। ইহা ভিন্ন এই শর্তের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রথম হইতেই লীগ সদস্যদের মনে নানাপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল।

লীগ ও যৌথ নিরাপত্তা

লীগের কার্যকালের গোড়ার দিকে যে সকল ছোটখাট বিষয়ে লীগের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল সেগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা লীগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যে দুইটি বৃহৎ সমস্যা সম্পর্কে লীগের প্রকৃত কার্যকারিতা পরীক্ষিত হইয়াছিল যথা, মাঞ্চুরিয়া ঘটনা ও ইতালি-ইথিওপীয় যুদ্ধ সেই দুই ক্ষেত্রেই লীগ নিজ অকর্মণ্যতার প্রমাণ দিয়াছিল। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে তখন লীগ সেই পরিস্থিতির তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। ইহাও অভিযোগকারী দেশ অর্থাৎ চীনের সনির্বন্ধতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কমিশন (লিটন কমিশন) যখন

মাঞ্চুরিয়া ঘটনা

রিপোর্ট দাখিল করিল তখন লীগ জাপানকে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। প্রতিবাদে জাপান লীগ ত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু আক্রমণকারী দেশ হিসাবে জাপানকে শাস্তি দানের জন্য কোনপ্রকার যৌথ ব্যবস্থা লীগ গ্রহণ করিল না।

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি-ও ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইলে সর্বপ্রথম লীগ ১৬ নং শর্তের প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইল। ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। কিন্তু এখানেও লীগের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইল, কারণ যে সকল সামগ্রী ইতালিতে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ করা হইল তাহা হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 'তেল' বাদ দেওয়া হইল। অথচ যুদ্ধের জন্য ইতালির সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল বিদেশ হইতে তেল আমদানি করা। তেলের উপর কোন

ইতালি-ইথিওপীয় যুদ্ধ : লীগের অকর্মণ্যতা

প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকায় ইতালি পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ইংলণ্ড ইতালিকে তেল সরবরাহ করা নিষিদ্ধ করিতে চাহিলে ফ্রান্স তাহাতে রাজী হইল না। জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্য দিবে এই

শর্তে ইংলণ্ড রাজী

হইলে ফ্রান্স ইতালিকে তেল সরবরাহ না করিবার শর্ত মানিতে

রাজী হইল। ইহাতে ইংলণ্ড স্বীকৃত না হওয়ায় ইতালি অবাধে তেল আমদানি করিতে সক্ষম হইল। অবশেষে ইথিওপিয়া ইতালির পদানত হইল। দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতালির সম্রাট হেইলি সেলাসি জেনিভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লীগের সদস্য পদভুক্ত করিয়া লীগ নিজ কর্তব্য পালন করিল। এইভাবে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে লীগ যৌথ নিরাপত্তার নীতি প্রয়োগ করিতে পারিত সেখানেও নিজ অকর্মণ্যতার পরিচয় দান করিল। বলা বাহুল্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে লীগ্-অব-ন্যাশন্স্ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে লীগের ব্যর্থতা

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Problem of Disarmament): আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সহিত সরাসরিভাবে জড়িত, বলা বাহুল্য। স্বভাবতই উইল্‌সনের যে চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র বা Covenant রচিত হইয়াছিল উহার চতুর্থ শর্তে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজসরঞ্জাম হ্রাস করিয়া ন্যূনতম পরিমাণে আনিতে হইবে একথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল।* লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তে† এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল এবং একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশক্রমে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইবে একথা লীগ চুক্তিপত্রের নবম শর্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।‡ সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব ও চেষ্টা লীগ কাউন্সিলের উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু লীগের বাহিরেও নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একাধিকবার বিভিন্ন রাষ্ট্র করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে কেবলমাত্র লীগের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আলোচনা করা হইবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

লীগের মাধ্যমে ও লীগ বহির্ভূতভাবে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা

---

*"Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety." *Art. 4. Wilson's Fourteen Points.*

†See *Appendix.*

‡See *Appendix.*

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য, বলা বাহুল্য। কারণ, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ও সামরিক সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা শুরু হইলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি হয়। এই ভীতি সকলের মনে নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে, ফলে রাষ্ট্রজোট গঠন এবং শেষ পর্যন্ত 'যুদ্ধের সৃষ্টি' প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা যুদ্ধের পূর্বচ্ছায়াস্বরূপ। মানবতার দিক হইতে বিচার করিলেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের যুক্তি রহিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের তথা যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি বেসামরিক উন্নয়নের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাসের উপরই অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে। অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলে স্বভাবতই জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা কতক পরিমাণে হ্রাস পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যে অর্থনৈতিক মন্দা সর্বত্র দেখা দিয়াছিল তখনও বিভিন্ন দেশের সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের উর্ধ্বে সামরিক সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধিকে স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান কেবল সুযৌক্তিকই নহে, অপরিহার্যও বটে।

নিরাপত্তা ও মানবতার দিক হইতে নিরস্ত্রী-করণের যৌক্তিকতা

লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম এবং নবম শর্তের নির্দেশানুসারে লীগ কাউন্সিল লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে যে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য দেখা গিয়াছিল উহার সুযোগ লইয়া নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তুতির জন্য একটি কমিশন (Preparatory Commission or Disarmament) নিযুক্ত করিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জেনিভা শহরে এই প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশন শুরু হইলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে এই কমিশনের আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ খসড়া উত্থাপিত হইল। এই দুইয়ের মধ্যে এবং সদস্যবর্গের আলাপ-আলোচনায় মতানৈক্য এমনভাবে প্রকট হইয়া উঠিল যে, নিরস্ত্রীকরণের মূল প্রশ্নটি সকলে ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ভীতি, বিদ্বেষ, পরস্পর স্বার্থ প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) প্রধানত তিনটি অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। পদাতিক সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবার ব্যাপারে সকলে একমত হইলেও প্রকৃত সৈনিক বা কার্যকরী (Effectives) বলিতে কাহাদের

প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) সম্মুখীন হইলেন।

বুঝাইবে সে বিষয় লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। ফ্রান্স এবং অপরাপর যে-সকল দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের রীতি চালু ছিল সেই সকল দেশ 'সৈনিক' সংখ্যার হিসাব হইতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ যাহারা স্থায়ী সৈনিকের কাজ করে না তাহাদিগকে বাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ সৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে এই ধরনের ব্যক্তিদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিল। নৌ-বাহিনী হ্রাসের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রত্যেক দেশের নৌবাহিনীর মোট বহন-ক্ষমতা কত টন (Tonnage) হইবে তাহা স্থির করিবার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জাহাজের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহনক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত মোট Tonnage-এর পরিমাণ ঠিক রাখিয়া যে-কোন পর্যায়ের জাহাজের জন্য কোন বাঁধাধরা Tonnage স্থির না করিবার পক্ষপাতী ছিল। বিভিন্ন দেশ নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শনের জন্য ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল, কারণ, সকল দেশের প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের মধ্যেই ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা নিহিত বলিয়া মনে করিত। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী নিয়োগের দাবিও করিয়াছিল। কিন্তু অপরাপর দেশ কোনপ্রকার পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের বা পুলিশবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী ছিল না। প্রত্যেক দেশের সততার উপরই নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব তাহারা ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল।*

সমবেত সদস্যদের মতানৈক্য

উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ে মতানৈক্য ভিন্ন অপরাপর অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অনুরূপ মতানৈক্য দেখা দিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অস্ত্রশস্ত্র' (Armament) বলিতে কি বুঝাইবে তাহা লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত ইহা নির্ধারণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইল। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের সামরিক বাজেট হ্রাস করিবার প্রশ্ন উঠিলে আমেরিকা উহার বিরোধিতা করিল। কারণ, মোট সৈন্যসংখ্যা নির্ধারিত হইলে পর উহাদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে সেবিষয়ে অর্থের পরিমাণ

*Vide Langsam, pp. 84-86.

নির্দিষ্ট না করাই উচিত, এই ছিল আমেরিকার অভিমত। জার্মানি ও ইতালি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির রদ-বদল দাবি করিল, কারণ, তাহাদের মতে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নের সহিত ভার্সাই-এর সন্ধির পরিবর্তন ছিল সরাসরিভাবে জড়িত। কিন্তু পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি যে সকল দেশের স্বার্থের পক্ষে ভার্সাই-এর চুক্তি অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজনীয় ছিল সেই সকল দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। এভাবে প্রস্তুতি কমিশনের কার্য প্রতিপদেই ব্যাহত হইতে লাগিল। জার্মানি নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রত্যেক পর্যায়ের অস্ত্রশস্ত্র কোন্ দেশ কি পরিমাণ রাখিতে পারিবে তাহা নির্ধারিত করা হউক দাবি করিলে অপরাপর দেশ উহার বিরোধিতা করিল। এমতাবস্থায় রুশ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্ প্রত্যেক দেশই অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকৃত হউক এই প্রস্তাব করিলেন। স্বভাবতই এই কঠিন এবং অবাস্তব প্রস্তাবে কেহ তেমন গুরুত্ব আরোপ করিল না।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন

রুশ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব

এইভাবে প্রস্তুতি কমিশনের সদস্যগণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন ও উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মূল নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সদস্যগণ মোটামুটি একমত এবং যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল 'সেগুলি একটি দলিলে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রস্তুতি কমিশন তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিলেন (১৯২৭)। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় প্রস্তুতি কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে-সকল বিষয়ে মতানৈক্য ছিল সেগুলির কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা তাহাই ছিল প্রস্তুতি কমিশনের উদ্দেশ্য। এদিকে ঐ সময়ে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর বাহিরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেজন্য লণ্ডনে একটি নৌবাহিনী-সংক্রান্ত কন্‌ফারেন্স (Naval Conference) আহূত হইয়াছিল। প্রস্তুতি কমিশন এই কনফারেন্সের ফলাফল কি হয় তাহা দেখিয়া পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি এই কন্‌ফারেন্সে গৃহীত শর্তাদি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান উহার শর্তাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও

প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তি-স্বরূপ দলিলের খসড়া রচনা

চুক্তিটি অকার্যকর হইয়া পড়িল। এই সময়ে প্রস্তুতি কমিশন পুনরায় তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একটি দলিলের খস্‌ড়া (Draft Convention) প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু এই খস্‌ড়ায় কোন সর্ববাদি-সম্মত নীতি বা পন্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন দেশের সদস্যবর্গের মতানৈক্য পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়া গেল। যাহা হউক, প্রস্তুতি কমিশনের একপ্রকার অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনিভা শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) আহ্বান করিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। মোট ৬১টি* দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক গৃহীত চুক্তি বা দলিলের খস্‌ড়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপিত হইল। এই দলিলে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা হইবে উহার বিবরণ থাকিলেও কি পদ্ধতিতে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা যাইতে পারে সেবিষয়ে কোন নির্দেশ ছিল না।† স্বভাবতই নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে প্রস্তুতি কমিশনের কাজ খুবই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। তাঁহারা পদাতিক সৈন্য, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী হ্রাস করিবার এবং একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি উত্থাপিত হইলে সম্মেলনের সদস্যবর্গকে সর্বাধিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সের প্রতিনিধি জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া নিজ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন— ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর নিরাপত্তা রক্ষার দাবি

*"The conference was attended by representatives of sixty-one states including five non-members of the League of Nations." Carr, p. 183.

When the Geneva Conference opened there were present representatives from about sixty states." Langsam, p 88.

†"It was a *skeleton lacking flesh and blood.*" Vide, Langsam, p. 88.

হইলেন না। এজন্য তিনি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের আদেশাধীন পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন। পক্ষান্তরে জার্মানিও ফ্রান্সের সমপর্যায়ের সামরিক শক্তি অর্থাৎ সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি জানাইল। এইভাবে প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিল। জার্মানি এককভাবে নিরস্ত্রীকৃত থাকিবে, ইহা জার্মান জাতি কোনভাবেই মানিয়া লইবে না—এই সঙ্কল্প জার্মান প্রতিনিধির দাবিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার সূচনা করিল। ফরাসী-জার্মান বিরোধ ভিন্ন আরও নানাপ্রকারের জটিলতাও দেখা দিল। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি কোন কোন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বিশাল আকৃতির কামান, ডুবো-জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম হিসাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হইল। অতঃপর তিনটি পৃথক্ কমিশনের উপর এই সকল প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহাদের সুপারিশ নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স-এর নিকট পেশ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইল। ফরাসী প্রতিনিধির মতে কেবলমাত্র বিশালাকৃতির ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর সবকিছুই ছিল আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র। বিশালাকৃতি ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। জার্মান প্রতিনিধি যুক্তি দেখাইলেন যে, ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামই আক্রমণাত্মক এবং নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সেগুলির নিষিদ্ধকরণ প্রয়োজন। বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে অবশ্য কোন দ্বিমত ছিল না এবং উহা নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন সেকথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করিবার কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত তিনটি কমিশন কেবলমাত্র বিষাক্ত গ্যাস, বিমান আক্রমণ ও বিশালাকৃতির ট্যাঙ্ক সম্পর্কে সর্ববাদিসম্মত সুপারিশ পেশ করিতে সমর্থ হইলেন। বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনে কোন বাধা না থাকিলেও উহা যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না, বৃহদাকৃতির ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা চলিবে না, বিমান হইতে

ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রস্তাব

তিনটি কমিশনের উপর ব্রিটিশ প্রস্তাব বিবেচনার ভার অর্পণ

ফ্রান্সের বিরোধিতা

বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে কমিশনের মতৈক্য—অপরাপর বিষয়ে অনৈক্য

বোমা নিক্ষেপ করা চলিবে না এবং প্রত্যেক দেশের বিমান সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, বেসামরিক বিমান চলাচলও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে—এই কয়টি ধারাসম্বলিত একটি প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের নিকট উপস্থাপন করা হইল (২০শে জুন, ১৯৩২)। (বিশালাকৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহা অবশ্য বলা হইল না)। মোট ৪১টি দেশ এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিল, জার্মানি ও রাশিয়া উহার বিরোধিতা করিল, ইতালিসহ মোট আটটি দেশের প্রতিনিধি নিরপেক্ষ রহিলেন। জার্মান প্রতিনিধি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না যে, ভার্সাই-এর চুক্তি অনুসারে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া যে পর্যায়ে আনা হইয়াছিল অপরাপর দেশকেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়া অনুরূপ পর্যায়ে আসিতে হইবে নতুবা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ব্যাপারে জার্মানিকে অপরাপর ইওরোপীয় দেশের সহিত সম-অধিকার দিতে হইবে, অর্থাৎ জার্মানিকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইবার অধিকার দিতে হইবে। এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই যখন কোনপ্রকার সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না তখন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সাময়িক কালের জন্য মুলতুবী রাখা হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩২), নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হইল। জার্মান প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিলেন না। পাছে জার্মানি এককভাবে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিতে শুরু করে, সেজন্য ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড, ইতালি ও ফ্রান্স জার্মানির সম-অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। অবশ্য এই স্বীকৃতিতে বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি সম-অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এই ঘোষণার পর জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিলেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জার্মানি অপরাপর শক্তির সমপর্যায়ে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে এই শর্তটির ফলে ফ্রান্স কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার আশু সমাধান সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব

জার্মানি ও রাশিয়ার বিরোধিতা

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জার্মানির সম-অধিকার স্বীকৃত

পরবৎসর (১৯৩৩) ফেব্রুয়ারি মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইল। ইহার কয়েকদিন পূর্বে (জানুয়ারি, ১৯৩৩) এডল্‌ফ হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে নাৎসি সরকার যেমন অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির ব্যাপারে কালবিলম্ব করিতে রাজী ছিলেন না, তেমনি ফরাসী সরকারও জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দাবি কোনভাবেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা চরম তিক্ততায় পরিণত হইল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ (Ramsay Macdonald) নিরস্ত্রী-করণের উদ্দেশ্যে কোন্ দেশ কি পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে উহার একটি বিশদ পরিকল্পনা সম্মেলনের নিকট পেশ করিলেন। ইহা 'ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা' (Macdonald Plan) নামে পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘ চারি সপ্তাহের আলাপ-আলোচনায় সমবেত সদস্যদের পরস্পর মতানৈক্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে ফরাসী প্রতিনিধি একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপন করিলেন। এই পরিকল্পনায় নিরস্ত্রীকরণের কাজকে দুইভাগে ভাগ করা হইল। প্রথম চারি বৎসর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পরিদর্শন করিবে এবং এই সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সামরিক বাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হইবে। এই চারি বৎসরের পর প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ শুরু হইবে এবং যে দেশের সাজ-সরঞ্জাম নির্ধারিত পরিমাণের অধিক থাকিবে তাহা হ্রাস করিতে হইবে। ব্রিটিশ ও ইতালীয় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রান্সের এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়া গেলেন (১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩) এবং ইহার অব্যবহিত পরেই জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল। এদিকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরও কয়েকমাস অধিবেশনে থাকিবার পর ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার পর উহার আর কোন অধিবেশন হয় নাই। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হইল।

ফরাসী পরিকল্পনা

জার্মানি কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অবসান

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of the Failure of Disarmament Conference) : নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ এবং পারস্পরিক ভীতি ও সন্দেহের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পটভূমিকা রচনা করিয়া নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা যে বিফলতায় পর্যবসিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

(২) ইহা ভিন্ন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্পাদক (Secretary) আর্থার হেণ্ডারসন। কিন্তু সম্মেলন শুরু হইবার পূর্বেই লেবার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পুনরায় যে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে আর্থার হেণ্ডারসন্ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন বা ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিতে পারিতেন সেরূপ ক্ষমতা স্বভাবতই তাঁহার আর ছিল না।

হেণ্ডারসনের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-নির্বাচনে পরাজয়

(৩) ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের কোন কর্মচারীকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রেরণ না করিয়া এই সম্মেলনের অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণে ত্রুটি

(৪) জার্মানির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন এবং ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ পার্টির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা প্রভৃতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মান মতামতের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে জার্মানির মনোবৃত্তি স্বভাবতই সহায়ক ছিল না।

জার্মানির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

(৫) প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) নিরস্ত্রীকরণের আলাপ-আলোচনার ভিত্তি রচনা করিতে গিয়া কোন সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। উপরন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর-বিরোধিতা সুস্পষ্ট করিয়া

প্রস্তুতি কমিশনের ব্যর্থতার কুফল

তুলিয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের কোন কার্যকরী নির্দেশ এই কমিশন দিতে পারে নাই।*

(৬) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা—নিরাপত্তার অজুহাতে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অপেক্ষা অধিকতর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য-সংখ্যা রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা রাখিবার দাবি—নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের পন্থা রুদ্ধ করিয়াছিল। জার্মানিতে হিট্‌লারের উত্থান এবিষয়ে জার্মান সরকারের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করায় ফরাসী-জার্মান বিরোধ অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

ফরাসী-জার্মান বিরোধ

(৭) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ইঙ্গ-ফরাসী নীতির অনৈক্যও প্রকাশ পাইয়াছিল। স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি কি হইবে এবিষয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। ফ্রান্স চাহিয়াছিল স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন কর্তৃক কিছুকাল অন্তর প্রত্যেক দেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তদন্ত বাধ্যতামূলক করিতে। কিন্তু ইংলণ্ড উহা বাধ্যতামূলক না করিয়া কোন দেশ কর্তৃক অপর কোন দেশে নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে স্থায়ী কমিশন ঐ বিষয়ে তদন্ত করিবে—এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

(৮) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে কেবল ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যই প্রকটিত হইল না, আমেরিকার সহিতও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির নানাবিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হুভার প্রত্যেক দেশের সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্স এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে আমেরিকার উৎসাহ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমেরিকার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতানৈক্য

---

*"The Preparatory Commission had provided more signposts to the pitfalls of disarmament than to promising lines of advance." Carr, p. 184.

(৯) অনুরূপ, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ কর্তৃক রচিত পরিকল্পনাও দীর্ঘ আলোচনার পর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণ অপেক্ষা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে রাশিয়া ফ্রান্সের সমর্থক ছিল। কিন্তু আমেরিকা ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশ নিরস্ত্রীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের কার্যে কোন একতা বা মতৈক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ফ্রান্স কর্তৃক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অপরাপর দেশ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ

(১০) সর্বশেষে, হিট্‌লারের চ্যান্সেলর-পদ লাভ এবং ভার্সাই-এর চুক্তি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প জার্মান মনোভাবকে ক্রমেই অনমনীয় করিয়া তুলিতেছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মান প্রতিনিধির নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ—উহার ব্যর্থতার শেষ পদক্ষেপ।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর বাহিরে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা (Attempts at Regional Security & Disarmament outside League of Nations): নিরাপত্তা (Security): প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে একদিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর মাধ্যমে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার চেষ্টা চলিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি লীগের বাহিরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও চলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও জার্মান-ভীতি ফ্রান্সের এক দারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক দিয়া অধিকতর অগ্রসর এবং জনসংখ্যার দিক দিয়া অধিকতর বলশালী জার্মানি পরাজিত হইয়াও ফ্রান্সের ভীতির কারণ রহিয়া গিয়াছিল। এজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে স্বাক্ষরিত ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকিবে এবং জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দায়ী থাকিবে এই আশা ফরাসী সরকারের ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ইংলণ্ড এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দানে অগ্রসর না হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা স্বভাবতই জটিল হইয়া উঠিল। লীগ চুক্তিপত্রের শর্তাদি ফ্রান্সের নিরাপত্তা-সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের সমস্যা হইল দুইটি: (১) জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে

বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি:

ফ্রান্স কর্তৃক নিরাপত্তার চেষ্টা

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইওরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিবর্গের সহিত মৈত্রী স্থাপন ও (২) জার্মানির চতুর্দিকে মিত্রশক্তিবর্গের একটি আবেষ্টনী গঠন।

ফ্রান্সের পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মিত্রতালাভে অসুবিধা হইল না। যে সকল দেশের পক্ষে ভার্সাই তথা প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি বজায় রাখা লাভজনক ছিল সেগুলির সহিত ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া খুবই সহজ হইল। (১) ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বেলজিয়ামও জার্মান আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল, সুতরাং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বার্থের সমতা হেতু উভয় দেশের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী চুক্তির কোন বাধা ছিল না। (২) প্যারিসের শান্তি-চুক্তি অনুসারে পোল্যাণ্ড জার্মানি হইতে পশ্চিম-প্রাশিয়া, সাইলেশিয়ার একাংশ ও পোজেন পাইয়াছিল। জার্মানি স্বভাবতই এই সকল স্থান হারাইয়া পোল্যাণ্ডের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সেজন্য জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভীতি পোল্যাণ্ডকে ফরাসী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। (৩) চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায় লাভবান হইয়াছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান বা অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া এই সকল রাষ্ট্রের পক্ষে ভীতির কারণ ছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তি বজায় রাখাই ছিল এগুলির স্বার্থ। সুতরাং এই তিনটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই মৈত্রী Little Entente নামে পরিচিত। ফ্রান্সের পক্ষেও শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখা অর্থাৎ Status Quo বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বভাবতই ফ্রান্স Little Entente-এর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। Little Entente রাষ্ট্রগুলিকে অর্থাৎ রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ফ্রান্স সামরিক উপকরণ, অর্থঋণ প্রভৃতি দান করিয়া এবং সেই সকল দেশে ঘন ঘন সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণ করিয়া এই তিনটি দেশকে ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল। Little Entente রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সকে ভার্সাই-এর চুক্তি বজায় রাখিতে যেমন

ফ্রান্স-বেলজিয়াম চুক্তি

ফ্রান্স-পোল্যাণ্ড চুক্তি

Little Entente

ফ্রান্স-Little Entente-চুক্তি

সাহায্য করিবে, ফ্রান্সও তেমনি হাঙ্গেরীর সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিতে এবং বিশেষভাবে ইতালির আক্রমণ হইতে যুগোস্লাভিয়াকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। এইসকল চুক্তির ফলে একদিকে যেমন জার্মানির চতুর্দিকে ফ্রান্সের মিত্রশক্তিবর্গের একটি আবেষ্টনী গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, অপর দিকে এই সকল মিত্রশক্তির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ফ্রান্স নিজের উপর প্যারিসের শান্তি-চুক্তি রক্ষার প্রায় যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হইতে কতক কতক স্থান রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্বভাবতই প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তন চাহিতেছিল। এই সকল দেশ রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতির মধ্যে কোন আঞ্চলিক নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্থাপিত হউক তাহা চাহিত না। সেজন্য রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া Little Entente স্থাপন করিলে এবং ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস ও আলবানিয়া একটি পাল্টা মৈত্রী-সংঘ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইতালির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিল। ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় নাই সেজন্য আলবানিয়ার উপর সংরক্ষণমূলক আধিপত্য (Protectorate) বিস্তার করিয়াছিল। বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার লইয়া ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স ও Little Entente-এর মৈত্রীর প্রত্যুত্তর হিসাবে ইতালি এবং হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও গ্রীসের সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিল। বলকান অঞ্চলের নেতৃত্ব ন্যায়ত তুরস্কের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত ছিল। তুরস্কও এবিষয়ে সচেতন ছিল। বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক জটিলতার সুযোগে তুরস্ক বলকান দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের সহিত পর পর তিনটি সম্মেলনে সমবেত হয় (১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২)। এই সকল সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তুরস্ক, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করা সম্ভব হয়। এইভাবে তুরস্ক বলকান অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণে যখন অগ্রসর হইয়াছে সেই সময়ে জার্মানিতে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসকে তুরস্কের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপনে প্রলুব্ধ করে।

ইতালি-হাঙ্গেরী-আলবেনিয়া-বুলগেরিয়া-গ্রীস মৈত্রী

বলকান চুক্তি

গ্রীস, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি আঞ্চলিক চুক্তি (Pact of Balkan Understanding) স্বাক্ষরিত হয় (৯ই

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪)। এই চুক্তি দ্বারা স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য-সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হয় এবং সকলের স্বার্থ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে আলাপ-আলোচনা করিবার নীতি স্বীকৃত হয়। আলবানিয়া ও বুলগেরিয়া এই বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করে নাই, কারণ এই দুইটি দেশ ছিল ইতালির সহিত মিত্রতাবদ্ধ। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও তুরস্কের সহিত পরস্পর 'অনাক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করে। এইভাবে বলকান অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গঠিত হয়।

ইতালি, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তনের দাবি করিতেছিল। স্বভাবতই এই তিন দেশের মধ্যে এক গভীর ঐক্যস্পৃহা জাগরিত হয়। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারা 'রোম প্রোটোকোল'* (Rome Protocol) নামে একটি চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করেন। রোম প্রোটোকোল স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি। ইহা ভিন্ন এই তিন দেশের মধ্যে কয়েকটি বাণিজ্য-চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। রোম-অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পরস্পর আলোচনা ও সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই (১৯৩৫-৩৬) ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার, রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ-শক্তি মৈত্রী, জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকার (১৯৩৮) প্রভৃতির ফলে রোম প্রোটোকোল অর্থহীন হইয়া পড়িল।

রোম প্রোটোকোল (Rome Protocol)

আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক মৈত্রী ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি পৃথিবীর —বিশেষভাবে ইওরোপের অপরাপর অংশেও স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল। উত্তর-ইওরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহ—ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে এই সকল দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক—সকল ক্ষেত্রেই পরস্পর আলোচনা, সাহায্য-সহায়তার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অভ্যন্তরেও এই সকল দেশ একটি পৃথক রাষ্ট্রজোট বা ব্লক (Bloc) হিসাবে আন্তর্জাতিক সমস্যার

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ ব্লক—ডেনমার্ক-সুইডেন-নরওয়ে-ফিন্‌ল্যাণ্ড-আইসল্যাণ্ড মৈত্রী

* Vide, Langsam, pp. 99, 277.

সমাধানে সচেষ্ট ছিল। এই রাষ্ট্রজোট ইওরোপীয় কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই জার্মানি কর্তৃক নরওয়ে ও ডেনমার্ক জয়, রাশিয়া কর্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড অধিকৃত হইলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রজোট (Scandinavian Bloc) ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইল না।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটের অনুরূপ রাষ্ট্রজোট মধ্য-প্রাচ্য, বাল্টিক অঞ্চল প্রভৃতিতেও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তুরস্কের নেতৃত্বে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তান ও তুরস্ক নিজেদের মধ্যে একটি পরস্পর অনাক্রমণ ও নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব-ছায়া পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাল্টিক অঞ্চলে ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্টিক চুক্তি' (Baltic Pact) নামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এস্তোনিয়া-লিথুয়ানিয়া-ল্যাটভিয়া মৈত্রী—বাল্টিক চুক্তি (Baltic Pact)

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটিশরাজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর বাহিরে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্-এর ন্যায় ঐক্যবদ্ধ এবং পরস্পর সাহায্য-সহায়তার মনোবৃত্তিসম্পন্ন অপর কোন রাষ্ট্রজোট ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এই ঐক্য স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আয়র্লণ্ড অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, তথাপি ব্রিটিশ কমনন্‌ওয়েলথ্-এর ঐক্যবোধ কত গভীর তাহার প্রমাণ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল।

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্ এ্যাসোসিয়েশান্

ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্-এর অনুরূপ অপর একটি ঐক্য আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অপরাপর অংশের রাষ্ট্রগুলির সহিত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে। গোণ্ড্রা চুক্তি (Gondra Treaty), বুয়েনোস-এয়ারিস (Buenos Aires) চুক্তি প্রভৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই ছিল মার্কিন ঐক্য আন্দোলনের (Pan-Americanism) মূল উদ্দেশ্য।

প্যান-আমেরিকানিজম্

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ইংলণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে একটি চুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, পররাষ্ট্র-নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের সম-অধিকার স্থাপন ছিল এই প্রস্তাবিত চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তি রোমে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাশিয়ায় সন্দেহের উদ্রেক হইলে, রাশিয়া চেকোস্লোভাকিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া, পারস্য. পোল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই সকল চুক্তি London Agreements নামে পরিচিত। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পর অনাক্রমণ, বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সামরিক সাহায্যদান প্রভৃতি এই চুক্তি দ্বারা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই সকল চুক্তির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হয় নাই।

লণ্ডন চুক্তি (London Agreements)

লীগের বাহিরে নিরস্ত্রীকরণ চেষ্টা (Attempts at Disarmament Outside League of Nations) : আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর আওতার বাহিরে যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক চুক্তি ও রাষ্ট্রজোট গড়িয়া উঠিয়াছিল অনুরূপ লীগের বাহিরে বিভিন্ন দেশের পরস্পর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টাও চলিয়াছিল। নিরাপত্তা (Security) ও নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) এই উভয় ব্যাপারেই লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই।

লীগের বাহিরে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর জনক প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন মার্কিন সেনেটের বিরোধিতায় আমেরিকাকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত জড়িত করিতে সক্ষম হইলেন না। আমেরিকা লীগ বয়কট করিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান তাহাতে হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের অভ্যুত্থান, জাপান কর্তৃক চীনদেশের উপর 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) কার্যকরীকরণ প্রভৃতি আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ওয়াশিংটন শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও সুদূর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান এবং সেই অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের—প্রধানতঃ আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার

উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করা ও চীন-জাপানের বিবাদের মীমাংসা করাও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডও এই সম্মেলনের পক্ষপাতী ছিল। কারণ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির শর্তানুসারে আমেরিকা ও জাপানের নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডকে জাপানের পক্ষ লইতে হইত। ইহার ফলে স্বভাবতই ইঙ্গ-মার্কিন সৌহার্দ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-আহূত 'ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স' (Washington Conference) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শুরু হইল এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উহার অধিবেশন চলিল।

(১) ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (Washington Conference, 1921-22)

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে রাশিয়া ভিন্ন সুদূর প্রাচ্যে অপরাপর যে সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল সেইরূপ সকল দেশের প্রতিনিধিই আমন্ত্রিত হইলেন। বেলজিয়াম, চীন, জাপান, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোর্তুগাল, নেদারল্যাণ্ডস্—এই আটটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ওয়াশিংটনে সমবেত হইয়া মোট সাতটি চুক্তি সম্পাদন করিলেন।* পাঁচটি চুক্তি প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, আর অপর দুইটি ছিল নৌ-বল হ্রাস (Naval Disarmament)-সংক্রান্ত। শেষোক্ত চুক্তি দুইটি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুইয়ের একটি দ্বারা স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের নৌ-শক্তি কি অনুপাতে থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হয়। জাপানকে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌ-বলের ৬০ শতাংশ রাখিতে দেওয়া হইবে স্থির করা হয়। আর ফ্রান্স ও ইতালি ইংলণ্ড ও আমেরিকার মোট নৌ-বলের ৩০ শতাংশ রাখিতে পারিবে। এই অনুপাত কেবলমাত্র যুদ্ধ-জাহাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে, অপরাপর জাহাজের সংখ্যা এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ার করিবে না বলিয়াও প্রতিশ্রুত হয়। অপর চুক্তির দ্বারা উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশ (অর্থাৎ আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালি) যুদ্ধে গ্যাস (gas) ব্যবহার না করিবার এবং ডুবো-জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নীতি স্থির করিল।

নৌ-শক্তির হ্রাসের চুক্তি

*Vide, Langsam, pp. 417-18.

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স পাঁচটি দেশের নৌ-বল সম্পর্কে নিরস্ত্রীকরণনীতি গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে ইহা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সেরূপ কিছু ছিল না। এই চুক্তির শর্তাদি জাপানকে ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-শক্তির ৬০ শতাংশ রাখিবার অধিকার দিবার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের নৌ-প্রাধান্য বজায় রহিল। কারণ, জাপানের নৌ-বল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলে ইংলণ্ড বা আমেরিকার পক্ষে তাহাদের নিজ নৌ-শক্তির ৬০ শতাংশ নৌ-বলও কোন এক সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে জাপানের প্রাধান্য এই অঞ্চলে অক্ষুণ্ণ ছিল। অনুরূপ আমেরিকা ও ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের নৌ-শক্তির ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। তদুপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৌ-বলের প্রাধান্য বা জাপানের নৌ-বল ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল না। আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ ইতালির পক্ষে সেই সময়ে নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং অপরাপর দেশের যে-কোন কারণে বা যে-কোন পরিমাণে নৌ-শক্তি হ্রাসের প্রস্তাব ইতালির পক্ষে স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল। এই সকল কারণে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স সাফল্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে ডেষ্ট্রয়ার, ডুবো-জাহাজ, ক্রুইজার প্রভৃতির সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। সর্বপ্রকার সামরিক নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে না পারিলে কেবলমাত্র যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স প্রকৃত সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল একথা বলা চলে না। তথাপি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এবং পরবর্তী দশ বৎসর আর কোন নূতন যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণ করা হইবে না, এই প্রতিশ্রুতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

'ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স'-এর সাফল্যের পরিমাণ

আপাতদৃষ্টিতে সাফল্য—মূলত তাহা নহে

সম্পূর্ণ সাফল্যলাভে সমর্থ না হইলেও প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ

প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুলিজ (President Coolidge) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে একটি দ্বিতীয় কন্-

ফারেন্স আহ্বান করিলেন। ইহাও ছিল ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর ন্যায় একটি নৌ-শক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত কন্‌ফারেন্স। এই কন্‌ফারেন্সে যোগ-দানের জন্য ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানকে আমন্ত্রণ জানাইলে ফ্রান্স ও ইতালি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল। ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর কার্যকলাপ স্মরণ করিয়া ইতালি ও ফ্রান্স স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল যে, এইরূপ কন্‌ফারেন্স দ্বারা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে, কারণ, কেবলমাত্র নৌ-শক্তি হ্রাস করিলেই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহা ভিন্ন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যখন অবহিত এবং সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত সেই অবস্থায় কেবলমাত্র পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি-বর্গের সম্মেলন যুক্তিযুক্ত নহে। সর্বোপরি ইতালি ও ফ্রান্স ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার মনোবৃত্তি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নাই। একথাও ফরাসী ও ইতালীয় সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে দ্বিধা করিলেন না। ফলে, জেনিভা শহরে কেবলমাত্র মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানী প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইলেন। কন্‌ফারেন্স শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গ-মার্কিন মতানৈক্য দেখা দিল। ক্রমে ইহা এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, জেনিভা কন্‌ফারেন্স সম্পূর্ণ বিফল হইল। আমেরিকা চাহিয়াছিল ক্রুইজার (cruiser)-এর সংখ্যা কোন্ দেশ কত রাখিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, পক্ষান্তরে বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন ছিল বিরাট সংখ্যক ক্রুইজারের। ব্রিটিশ প্রতিনিধি সেজন্য চাহিলেন যে, ক্রুইজারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিয়া উহার আকার নিয়ন্ত্রণ করা হউক। এই বিষয় লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য ক্রমে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষে পরিণত হইল। এই কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরও এই পরস্পর বিদ্বেষ ও সন্দেহ কিছুকাল উভয় দেশের সৌহার্দ্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

(২) জেনিভা নৌ-কন্‌ফারেন্স ('Geneva Naval Conference' 1927)

ইতালি ও ফ্রান্স কর্তৃক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

কন্‌ফারেন্সের বিফলতা—ইঙ্গ-মার্কিন বিদ্বেষ

জেনিভা নৌ-কন্‌ফারেন্স-প্রসূত ইঙ্গ-মার্কিন সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ইহাতে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব অনেকটা দূরীভূত হইল। ব্রিটিশ সরকার সেই সুযোগে লণ্ডনে আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালিকে

একটি কনফারেন্সে আহ্বান করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই সকল দেশের প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে সমবেত হইলেন। এই কন্‌ফারেন্স-এ ইঙ্গ-মার্কিন অনৈক্যের মীমাংসা হইল, কিন্তু ফ্রান্স-ইতালির মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিল উহার সমাধান করা সম্ভব হইল না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমপরিমাণ ডুবো-জাহাজ রাখিবার অধিকার জাপান লাভ করিল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র আকার ক্রুইজারের সংখ্যা এবং আমেরিকা বৃহদাকার ক্রুইজারের সংখ্যা বাড়াইবার অধিকার পাইল। এই দুই দেশের মোট সংখ্যক ক্রুইজারের বহন ক্ষমতা (Tonnage) অবশ্য সমান রহিল। লণ্ডনে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুসারে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাক্ষরকারী দেশগুলি জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকা যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির বিবাদের মীমাংসা সম্ভব হইল না। ফ্রান্স ইতালির সমপরিমাণ নৌ-শক্তি রাখিতে রাজী হইল না, কারণ ফ্রান্সের সমান নৌ-বল রাখিবার অধিকার পাইলে ভূমধ্যসাগরে ইতালি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। তদুপরি ফ্রান্সের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণে নৌ-বল প্রয়োজন ইতালির তাহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ফ্রান্স ইতালি অপেক্ষা অধিক নৌ-শক্তি রাখিতে চাহিল। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে ফ্রান্স ইতালিকে সমপরিমাণ নৌ-শক্তি রাখিতে দিতে রাজী হইল না। ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করা সম্ভব হইল না। ফলে, ইতালি ও ফ্রান্সের বিবাদের মীমাংসা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশ লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইল। ইতালি ও ফ্রান্স এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে পূর্বে নোটিশ দিয়া নৌ-শক্তি বাড়াইতে পারিবে—এই শর্তটি লণ্ডন চুক্তিতে (১৯৩০) যোগ করিতে বাধ্য হইল। ফলে, লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এর নিরস্ত্রীকরণ-নীতি তেমন কার্যকরী হইল না।

লণ্ডন নৌ-শক্তি হ্রাসের সম্মেলন (London Naval Disarmament Conference, 1930)

লণ্ডন চুক্তি (London Treaty)

লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরে তুরস্ক ও গ্রীস পরস্পর নৌ-শক্তির প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে এ্যাঙ্গোরা প্রোটোকোল (Angora Protocol) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

এ্যাঙ্গোরা প্রোটোকোল, ১৯৩০

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীর আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হইলে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আন্তরিক চেষ্টার অভাব এই কথাই প্রমাণিত হইল। জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়া যাইবার পর জার্মানি যখন ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিল তখন ব্রিটিশ সরকার জার্মানির সহিত একটি নৌ-শক্তি-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (**Anglo-German Naval Agreement, June 18, 1935**)। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার জার্মানিকে ব্রিটিশ নৌ-শক্তির ৩৫ শতাংশ পরিমাণ নৌবহর বৃদ্ধি করিতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জাহাজ প্রস্তুতের অধিকার দানে স্বীকৃত হইলেন। জার্মানি কর্তৃক এককভাবে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া চলিবার কার্যে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদানত করিয়া রাখিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনে করা ভুল হইবে না। যাহা হউক, ব্রিটিশ সরকার সম্মুখীন পরিস্থিতি মানিয়া লইবার ও ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্যই এইরূপ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি ১৯৩৫, জুন, ১৮

ঐ বৎসরেই লণ্ডনে জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সর্বশেষবারের মত নৌ-শক্তি হ্রাসের চেষ্টায় সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে জাপান নৌ-শক্তি ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সমপর্যায়ভুক্ত হইতে চাহিল। কিন্তু এই দাবি অপরাপর দেশ স্বীকার করিল না। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানি রাইন অঞ্চলে পুনরায় সেনানিবাস প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ভার্সাই-এর চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে লণ্ডনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ অস্ত্রশস্ত্র বা নৌ-শক্তি হ্রাসের নিবুর্দ্ধিতা বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গ ১৯২১-২২ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নৌ-চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে বিবেচনায় পুনরায় তাহাদের পরস্পর নৌ-বলের অনুপাত পূর্ববৎ রাখিতে এবং জাহাজ নির্মাণে পরস্পর পরস্পরকে নূতন তথ্যাদির আদান-প্রদানে স্বীকৃত হইয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (২৫শে মার্চ, ১৯৩৬)। কিন্তু জাপান এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হইল না, উপরন্তু ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের নৌ-চুক্তি (ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত) ও লণ্ডন চুক্তির (১৯৩০) মেয়াদ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার শর্তাদি মানিতে বাধ্য থাকিবে না একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল।

লণ্ডন নৌ-সম্মেলন ১৯৩৫-৩৬

এইভাবে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন নৌ-সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় দেশসমূহ জার্মানি ও ইতালির একক অধিনায়কত্বের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবের পরিচয় লাভ করিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন তখন নিছক বাতুলতায় পরিণত হইল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও আন্তর্জাতিক শান্তি (League of Nations & World Peace): আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর দায়িত্ব যেমন ছিল ব্যাপক তেমনি কঠিন। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, লীগ চুক্তি-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে যথাযথ অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, ম্যাণ্ডেট্ রাজ্যগুলি পরিচালনা ও পরিদর্শন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদি—সব কিছুই লীগের কর্তব্য-কার্যের তালিকাভুক্ত ছিল। এই সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে সৌহার্দ্য-পূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, দুঃখদুর্দশা মোচন, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি আনয়ন প্রভৃতি বহুবিধ উদ্দেশ্য লইয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গঠিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি লীগকে অনুসরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব:

(১) আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান দেশগুলির মধ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা করা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে এবং লীগের এ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিলের পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের অবসান ঘটান ছিল লীগের দায়িত্ব। এই সকল দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হইবে তাহা লীগ চুক্তিপত্রে (League Covenant) বর্ণিত ছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উদ্দেশ্যে আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতি

(২) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইয়া যুদ্ধ রোধ করাই লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আক্রমণকারী দেশকে উপযুক্ত শাস্তিদান করাও ছিল লীগের কর্তব্য-কার্যের অন্যতম। প্রত্যেক দেশের সীমার নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে বা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে লীগ কাউন্সিল উহা রোধ করিবার যথাযথ উপায় ও ব্যবস্থার নির্দেশ দিবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' রক্ষা

প্রতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা—আক্রমণকারী রাষ্ট্রের শাস্তির ব্যবস্থা

করা লীগ-অব্-ন্যাশন্‌স্-এর প্রধান দায়িত্ব হইলেও লীগ চুক্তিপত্রের কোন স্থানে 'শান্তি' (Peace) শব্দটির উল্লেখ করা হয় নাই।

(৩) আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, নৌ-বল ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন, একথা উপলব্ধি করিয়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ধরনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে পারিলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার পথ সহজতর হইবে, তেমনি অপর দিকে অযথা এক বিশাল ব্যয়ের বোঝা হইতে প্রত্যেক দেশ রক্ষা পাইবে। এইভাবে অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অসুস্থতা হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি স্বভাবতই সহজ হইবে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ

(৪) লীগের চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করা লীগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে সার অঞ্চল ও ডানজিগ্ শহরের উপর পরিদর্শনমূলক কার্য লীগকে করিতে হইয়াছিল। ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলগুলির শাসনকার্যের পরিদর্শন অধিকারও লীগের উপর ন্যস্ত ছিল।

সার অঞ্চল, ডানজিগ্ শহর ও ম্যাণ্ডেট্ অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের কাজ

(৫) বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য প্রত্যেক দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে ন্যায্য ব্যবহার ও সম-অধিকার পাইতে পারে সেজন্য লীগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের বা নির্দেশদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতা

(৬) সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে নূতন জ্ঞান, নূতন ধারণা প্রভৃতি প্রত্যেক দেশকে সরবরাহ করিয়া, নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পর শ্রদ্ধাবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইভাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল।

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের মাধ্যম

লীগের কার্যকলাপ (Activities of the League) : নিরাপত্তা রক্ষার কার্যাদি (Activities for the Preservation of Security) : প্যারিসের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি মোট ৪৪টি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই সমস্যার জটিলতা সমপরিমাণ ছিল না। যাহা হউক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। এগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লীগ নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে লীগ অসহায় দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল।

(১) এঞ্জেলি ঘটনা

লীগ কাউন্সিলের সম্মুখে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি উপস্থাপিত হইয়াছিল উহা 'এঞ্জেলি ঘটনা' (Enzeli Affair) নামে পরিচিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নৌবহর কাম্পিয়ান অঞ্চলে এঞ্জেলি বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিলে পারস্য সরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুধু তাহাই নহে, পারস্য সরকার রাশিয়ার সহিত সরাসরি এবিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চালান। শেষ পর্যন্ত লীগ কাউন্সিলের কোন কিছু করিবার পূর্বেই পারস্য সরকার ও রুশ সরকার এই ব্যাপার মিটমাট করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(২) আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ

ঐ বৎসরই (১৯২০) সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ (Aaland Islands)-এর আধিপত্য লইয়া বিবাদ দেখা দিলে ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় এই উভয় দেশ লীগের সদস্য না হইলেও তাহাদের বিবাদটি মীমাংসার জন্য লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। লীগ চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে লীগের সদস্য ভিন্ন অপরাপর দেশের এই ধরনের বিবাদের মীমাংসা লীগ কাউন্সিলের করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং লীগ আন্তর্জাতিক বিচারালয় তখনও গঠিত হয় নাই বলিয়া কয়েকজন আইনজ্ঞের একটি কমিটি নিয়োগ করিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে লীগ কাউন্সিল এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে উভয় পক্ষ অর্থাৎ ফিন্‌ল্যাণ্ড ও সুইডেন তাহা মানিয়া লইল।

(৩) আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনা

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কিছু করিবার পূর্বেই আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র তুরস্ক কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যায়।

পর বৎসর (১৯২১ খ্রীঃ) টিউনিসিয়ার অধিবাসীদের এক শ্রেণীর লোককে ফরাসী সরকার ফরাসী নাগরিক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহাদিগকে ফরাসী সেনা-বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করিলে ইংলণ্ড ইহার প্রতিবাদ করে। কারণ, ইংলণ্ড এই সকল লোককে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া দাবি করিত। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসিত হইবার পূর্বেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই বিবাদ মিটাইয়া লয়।

(৪) ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ

ঐ বৎসরই জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে লীগ কাউন্সিল এই দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়। জার্মানি ও পোল্যাণ্ড লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

(৫) জার্মানি-পোল্যাণ্ড সীমান্ত-সমস্যা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিবাদের মীমাংসায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাত্র সার্বিয়ার ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডানজিগ্, সার অঞ্চল, দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী-সংক্রান্ত নানাবিষয়েও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন, আফিং ব্যবসায়, ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে অর্থ-নৈতিক সংকট হইতে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে লীগের অবদান নেহাৎ কম ছিল না।

(৬) লীগের অপরাপর কার্যাদি

কিন্তু যে-সকল ঘটনায় লীগের শক্তির প্রকৃত পরিচয় দানের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রেই লীগের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে লীগের অসাফল্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষক সংস্থা হিসাবে উহার ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৭) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে করফু ঘটনায় (Corfu Incident) লীগের প্রকৃত শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিতে পারা গেল। ঐ বৎসর গ্রীস ও আলবানিয়ার সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সভার অধিবেশন গ্রীসে যখন চলিতে-ছিল তখন ঐ সভার সদস্য ইতালীয় দূত জনৈক জেনারেলকে গ্রীসের রাজ্যসীমার

মধ্যে হত্যা করা হয়। ইতালি এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিলে গ্রীস সরকার উহা দিতে অস্বীকৃত হন। ইতালি গ্রীসের কর্‌ফু নামক দ্বীপটির উপর গোলা বর্ষণ করে এবং উহা দখল করিয়া লয়। এই ব্যাপার লইয়া লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করা হইলে মুসোলিনি লীগের অধিকার অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের যে সভা গ্রীসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সভা গ্রীসের উপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দিলে গ্রীস তাহা দিতে বাধ্য হয়। ইতালি কর্তৃক লীগের বিচারক্ষমতা অস্বীকার লীগের দুর্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কর্‌ফু ঘটনা

(৮) ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'সীমা নিধারণ কমিশন' (Boundary Commission) নিযুক্ত করে। মসুল (Mosul) নামক জেলাটি লইয়া এই বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কমিশন যখন কার্যে রত ছিল ঐ সময়ে তুরস্কের অধীন কুর্দ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে আরম্ভ করিলে কুর্দগণ ইরাক-তুরস্কের সীমান্তে পলাইয়া আসে এবং সেখান হইতে তুর্কী সৈন্যদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ একটি দ্বিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরস্কের সীমা নির্ধারিত হয়। ব্রিটেন, তুরস্ক ও ইরাক এই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯২৬)।

ইরাক ও তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

(৯) গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রায়ই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁহার একজন অনুচর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এই বিষয়ে তদন্তের পর গ্রীসকে সৈন্য অপসারণে এবং বুলগেরিয়ার সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। গ্রীস অবশ্য এই সকল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে ইতালি যখন গ্রীসের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তখন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া গ্রীস স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা

(১০) লিথুয়ানিয়ার সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' (State of War) ঘোষণা করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দুই দেশে তথাপি মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর তৎপরতায় দূর হইয়াছিল।

লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সৃষ্টিতে বাধাদান

(১১) ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ আলাপ-আলোচনা-মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানকে নিরস্ত করিতে চাহিল। লীগ চুক্তিপত্র অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে লীগ-অব ন্যাশন্‌স্-এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, কারণ চীন জাপানের ন্যায়-ই ছিল লীগের সদস্য-রাষ্ট্র। জাপান স্বেচ্ছাকৃতভাবে লীগ-চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল এবং সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলে এবং জাপান তাহা অগ্রাহ্য করিলে লীগ লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করিলে সুদীর্ঘ আলোচনার পর লীগ জাপানের উপর দোষা-রোপ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। জাপান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। লীগ কাউন্সিল জাপানের অন্যায় আচরণের নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, জাপানের বিরুদ্ধে লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তানুযায়ী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক, জাপান ও লীগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া লীগের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)

(১২) ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (১৯৩৬) এবং লীগের বিভিন্ন সদস্যের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অযথা কালক্ষেপ লীগের অকর্মণ্যতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ইতালি ও ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্ব ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও ইথিওপিয়ার সীমায় ওয়ালওয়াল (Walwal) নামক স্থানে ইথিওপিয় ও ইতালীয় সৈনিকদের সংঘর্ষ হইতে শুরু হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া ইথিওপিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবার

ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) দখল

ফলস্বরূপ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া লইলেন। রাজ্য-হারা ইথিওপিয় রাজা হেইলেসেলাসি লীগের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া লীগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লীগ কাউন্সিল কর্তৃক রাজ্যহারা হেইলেসেলাসিকে লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। ইথিওপিয়াকে লীগের সদস্য হিসাবে স্বীকার করিলে ইতালি লীগ ত্যাগ করিয়া গেল। ইহার দুই বৎসর পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসোলিনি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অকর্মণ্যতা ও চরম দুর্বলতা পৃথিবীর জনসমাজের নিকট পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল। এই সময় হইতেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অস্তিত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইহার পর স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো তথাকার প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্য অন্তর্বিরোধ শুরু করিলে একক অধিনায়কত্বা-ধীন জার্মানি ও ইতালি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ অবলম্বন করিল। স্পেনীয় সরকার লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন কার্যকরী সাহায্য পাইলেন না। লীগ কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব পাস করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে একক অধিনায়কত্বের জয় ঘটিল, সঙ্গে সঙ্গে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এরও পতন ঘটিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মূল্যায়ন (Worth of the League of Nations): লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নানাকারণে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অবদানও যে একেবারে ছিল না, এমন নহে। প্রথমত, লীগ পৃথিবীর জনসমাজকে আন্তর্জাতিক সমবায়, সৌহার্দ্য ও সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর জনসাধারণকে মনোযোগী করিয়া তুলিয়া নিছক জাতীয়তা-বাদী মনোবৃত্তিকে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনে কতক পরিমাণে দমন করা উচিত এই শিক্ষাই দিয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অবসান ঘটিলেও লীগ প্রচারিত আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পূর্ববর্তী কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারেও

এক নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বিবাদ-বিসংবাদ লীগ চুক্তিপত্রে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মীমাংসার ব্যবস্থা এবং লীগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) লীগের আদর্শ ও সংগঠনের অনুবৃত্তি, একথা অনস্বীকার্য।* আন্তর্জাতিক সমবায়ের ধারণা অতি প্রাচীন হইলেও লীগের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল যেমন অভিনব, উহার প্রভাবও ছিল তেমনি ব্যাপক ও স্থায়ী।

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সংস্থা হিসাবে লীগের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব

তৃতীয়ত, লীগ উহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার কার্যাদির দ্বারা পৃথিবীর জনসাধারণের সম্মুখে এক চমৎকার এবং অভিনব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাধারণ মানুষকেই যে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইতে হইবে, এই শিক্ষাই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পরবর্তী যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছিল।

লীগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবতার কার্যাদির গুরুত্ব

সর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ পৃথিবীর সকল অংশের রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে পৃথিবীর মূল ঐক্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

সর্বজাগতিক ঐক্যের আদর্শ

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations): উপরি-উক্ত কার্যকারিতা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ প্রকৃত সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল।

---

*"The ideals which it (League) sought to promote, the hopes to which it gave rise, the methods it devised, the agencies it created, have become essential part of the political thinking of the civilized world and their influence will survive until mankind enjoy a unity transcending the divisions of state and nations.

Whatever the fortunes of the United Nations may be, the fact that, at the close of the Second World War, its establishment was desired and approved by the whole community of civilized peoples must stand to future generations as a vindication of the men who planned the League." Watler, vide Langsam, pp, 55-56.

প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছিল। স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন দেশেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কেহ তেমন উপলব্ধি করে নাই।

লীগের ব্যর্থতার কারণ : (১) পরীক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে স্বভাবতই প্রত্যেক দেশ লীগের শর্তাদি ও লীগের মূল নীতির অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। জাতীয় সার্বভৌমত্বের (National Sovereignty) ধারণা দ্বারা রাষ্ট্রবর্গ অত্যধিক প্রভাবিত হইবার ফলে লীগের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য তাহাদের জন্মিতে পারে নাই।

(২) জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরাজয়

তৃতীয়ত, লীগ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপসরণ এবং প্রথম দিকে রাশিয়া ও জার্মানিকে উহার সদস্যপদভুক্ত না করা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট্ উইলসন ছিলেন লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর স্রষ্টা। কিন্তু প্রথমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব-ন্যাশনস্-এ যোগদানে অস্বীকার করিলে লীগ-অব-ন্যাশনস্ অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, বলা বাহুল্য। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি দ্বারা জার্মানিকে এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ ত্যাগ করিয়া গেলে উহা পুনরায় ক্ষুদ্রপরিসর হইয়া পড়িল। লীগের ইতিহাসে কোন সময়েই পৃথিবীর সকল বৃহৎ দেশ ইহার সদস্যপদভুক্ত ছিল না। ইহা লীগের দুর্বলতা তথা বিফলতার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচ্য।

(৩) সকল বৃহৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতার অভাব

চতুর্থত, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার ও ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং উভয়ক্ষেত্রে লীগের ব্যর্থতা পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বৃহৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে লীগ সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে লীগের কার্যকারিতা সম্পর্কে সর্বত্র সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল। ইহা লীগের পতনের অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই।

পঞ্চমত, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই কাউন্সিলের

সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন—এই নীতির ফলে কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। লীগের আলাপ-আলোচনায় সেজন্য রাষ্ট্রগত ও জাতিগত স্বার্থ-ই প্রাধান্য লাভ করিত। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ইহা গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৫) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

ষষ্ঠত, লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার মত কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকায় লীগের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লীগের নিজস্ব কোনপ্রকার সামরিক শক্তি না থাকায় লীগের সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে মনে করা হইত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ফলে, ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে লীগ ইতালিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিলে লীগ জাপানকে কোন ভাবেই নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৬) লীগের সামরিক শক্তির অভাব

সপ্তমত, লীগ চুক্তিপত্র ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইবার ফলে ইহার আন্তর্জাতিক প্রকৃতি কতকাংশে ব্যাহত হইয়াছিল। ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখাই লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রধান দায়িত্ব এই ধারণা অনেকের মধ্যেই জন্মিয়াছিল। ইহা লীগের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

(৭) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে লীগ চুক্তিপত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার কুফল

অষ্টমত, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অর্থনৈতিক মন্দা পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিয়াছিল উহার অন্যতম ফল হিসাবেই ইওরোপে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ঘটে। অথচ লীগ চুক্তিপত্র ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক দলিল। স্বভাবতই একক অধিনায়কত্বের আদর্শ ও কর্মপন্থা লীগের আদর্শ ও কর্মপন্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। জাপান, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের আচরণে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

(৮) একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব

নবমত, লীগের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল সদস্য-দেশগুলির আন্তরিক এবং নৈতিক সাহায্য ও সহায়তা। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন দেশই আন্তর্জাতিক শান্তি বা লীগের নীতি মানিয়া চলিবার প্রশ্নের ধার ধারিত না। এই সকল কারণে ক্রমেই লীগ

(৯) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহায়তার অভাব

দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে লাগিল। ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৫), জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই লীগ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল।

দশমত, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর প্রকৃত জন্মদাতা প্রেসিডেণ্ট্ উইলসন লীগ সনন্দের দশম শর্তকে লীগের 'ভিত্তি প্রস্তর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শর্তানুসারে লীগের সদস্যবর্গ পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমার অখণ্ডতা মানিয়া লইবেন এবং প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের রাজ্যসীমা ও স্বাধীনতা বহিরাগত আক্রমণ হইতে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা কোন সদস্যরাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে অথবা আক্রান্ত হইবার ভীতি দেখা দিলে লীগ কাউন্সিল যেভাবে নির্দেশ দিবে সেইরূপ সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দশম শর্তের* প্রকৃত অর্থ কি সেই বিষয়ে লীগ এ্যাসেম্বলীতে আলোচনার পর স্থির হয় যে, লীগের সনন্দের দশম শর্তানুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য লীগ কাউন্সিল যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিবে সেই নির্দেশ প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট, আইনসভা বা অপর কোন প্রকার জাতীয় সংস্থা বিচার করিয়া কি পরিমাণ সাহায্য সেই সদস্যরাষ্ট্র দিবে তাহা স্থির করিবে। দশম শর্তের এই ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাব অবশ্য পারস্যের বিরোধিতায় গৃহীত হয় নাই, তথাপি যে ব্যাখ্যা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ এ্যাসেম্বলীতে করা হইয়াছিল উহাই সদস্যরাষ্ট্রবর্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ১৬নং শর্তের ক্ষেত্রেও পর পর ১৯টি প্রস্তাব পাস করিয়া উহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল তাহাতে ১৬নং শর্তের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার একটি সংস্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই ধারণা বিশেষভাবে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে জন্মিয়াছিল।

(১০) লীগ সনন্দের দশম ও ষোড়শ শর্তের ব্যাখ্যা

---

* Art. 10. "The members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled."

লীগের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে এইরূপ ধারণা লীগের পতনের পথ সহজতর করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

একাদশত, লীগের পতনের মূলে কতকগুলি সহজাত, মৌলিক দুর্বলতা ছিল। লীগের সনন্দের মধ্যে কতক ফাঁক (gaps) থাকার ফলেই এই দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। এই সকল দুর্বলতাকে (১) শাসনতান্ত্রিক (Constitutional), (২) সাংগঠনিক (Structural) ও (৩) রাজনৈতিক (Political)—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।*

(১) লীগের সনন্দ ছিল লীগের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (Constitution)। এই সনন্দে কতকগুলি ফাঁক (gaps) ছিল যাহার ফলে লীগ অব-ন্যাশনস্-এর কার্যকারিতা বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছিল এবং লীগের পতন সহজ তথা অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। লীগের সনন্দে যুদ্ধমাত্রেই বে-আইনী বা নিষিদ্ধ এ কথা বলা হয় নাই অর্থাৎ যুদ্ধ কোন অবস্থায়ই করা চলিবে না এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা লীগ সনন্দে উল্লিখিত হয় নাই। ১২নং শর্তে বলা হইয়াছে যে, কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্পর্কে সালিশের (Arbitrator) সিদ্ধান্ত প্রকাশের তিন মাস অতিবাহিত না হইলে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে না। স্বভাবতই সনন্দের-ই শর্তানুযায়ী তিন মাস অতিবাহিত হইলে পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাধা ছিল না। কেবলমাত্র ১৩নং শর্তের ৪নং ধারা এবং ১৫নং শর্তের ৬নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, (১) লীগের সদস্যরাষ্ট্র লীগের অপর কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় তাহা হইলে সেই সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারিবে না। (২) লীগ কাউন্সিল কোন বিবাদে যদি সিদ্ধান্ত দান করে এবং বিবদমান রাষ্ট্রের যেটি বা যেগুলি সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লীগের কোন সদস্যরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। ইহা হইতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, লীগের সনন্দ রচয়িতাগণ যুদ্ধনিরোধ সম্পর্কে অতি দুর্বল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের একটি উপায় এই ধারণার উর্ধ্বে তাঁহারা উঠিতে পারেন নাই। ফলে সনন্দ অনুসারেই কোন কোন প্রকার যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও অপরাপর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাধা ছিল না। এই সহজাত সাংবিধানিক দুর্বলতা লীগের সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল।

সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা

* Morganthau : Politics among Nations, Chap. I.

(২) সাংগঠনিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, লীগে প্রধানত, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গেরই প্রাধান্য ছিল অথচ প্রথম যুদ্ধাবসানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইওরোপীয় গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইওরোপের বহির্দেশীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সহিতও জড়িত হইয়া গিয়াছিল। মূল ৩১টি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের মাত্র ১০টি ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্র। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই ত্রুটিও উহার পতনের অন্যতম কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

সাংগঠনিক

ইহা ভিন্ন, সনন্দের ১৭নং শর্তে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-কে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। লীগের সদস্য না হইলেও লীগ তাহাদের বিরোধে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭নং শর্তে একথাও বলা হইয়াছিল যে, লীগের সদস্যপদ বহির্ভূত কোন রাষ্ট্র যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে লীগ কাউন্সিল সেই রাষ্ট্রকে যে নির্দেশ দিবে তাহা লীগের সদস্যপদভুক্ত রাষ্ট্রবর্গের ন্যায়ই মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। অন্যথায় লীগ উহার সনন্দের ১৬নং শর্তে বর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ভাবে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় রাষ্ট্রের উপর লীগের কর্তৃত্ব ১৭নং শর্তে দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার ন্যায় লীগের সদস্যপদ বহির্ভূত রাষ্ট্রের উপর লীগের নির্দেশ কার্যকরী করা সম্ভব হইত কি? সেই চেষ্টা করিলে লীগকে এক বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইত, বলা বাহুল্য। সুতরাং ১৭নং শর্তের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব লীগের উপর ন্যস্ত করা সত্ত্বেও উহার কোন প্রকৃত মূল্য ছিল না।

(৩) রাজনৈতিক কারণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী। ফলে, লীগের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ন্যায্য-নীতি কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং আন্তর্জাতিক অব্যবস্থা বা বিরোধ দূরীকরণের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক

লীগের সনন্দ অনুসারে লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যগণ কেবলমাত্র বিজয়ী মিত্র শক্তিবর্গের মধ্য হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। পরাজিত জার্মানি উহাতে প্রথমে স্থান পায় নাই। ইহা ভিন্ন ভার্সাইয়ের চুক্তির অংশ হিসাবে লীগ সনন্দকে সন্নিবিষ্ট করা, বিজয়ী শক্তিবর্গ কর্তৃক প্যারিসের তথা ভার্সাইয়ের চুক্তি অনুসারে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা করিয়াছিল উহার স্থিতাবস্থা (Status Quo) বজায় রাখা-ই লীগের প্রধান দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে স্থিতাবস্থা

বজায় রাখিবার এই প্রকার দায়িত্ব উহার সময়ানুবর্তিতার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। লীগ সেজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে নাই।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামরিক নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর একটি মূলনীতি ছিল। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ছোট যুদ্ধজাহাজের এবং ফ্রান্স সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হয় নাই। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্-ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্ফারেন্সে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জার্মানি এই অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্পকাল পরেই ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করিয়া দেশের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধের ফলেই পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা : ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্স

নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান : সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্ক

(Rise of Soviet Russia : Soviet Foreign Relations)

সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান (Rise of Soviet Russia) : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউনিয়ন-এর উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উহার সুদূর-প্রসারী ফলাফল, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশের নীতি এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া চিরাচরিত অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারায় এক সম্পূর্ণ নূতন প্রবাহ আনিয়াছে। জার-শাসিত রাশিয়ায় যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অত্যাচার, সামাজিক বিভেদ-জনিত বিদ্বেষ দেখা দিয়াছিল তাহা মার্কস্‌পন্থী বল্‌শেভিক দলের প্রচারকার্য ও চেষ্টার ফলে বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইতেছিল। ১৯১৪-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসাবে রাশিয়ার পুনঃপুনঃ পরাজয়ে জারের শাসনের দুর্বলতা চরমে পৌঁছিলে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হইয়া ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে বল্‌শেভিক্ দলের হস্তে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হইলে বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করে।

রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা

রুশ বিপ্লব ছিল দুইটি প্রধান নীতির উপর নির্ভরশীল—(১) মার্কসীয় মতবাদ ও (২) উহার পদ্ধতি। মার্কসের মতবাদ (Marxian Philosophy)-এর উপর নির্ভরশীল, এই কারণে স্বভাবতই বিপ্লবী রাশিয়া শ্রেণীবৈষম্যহীন জনসমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর ছিল। আর শ্রেণীবৈষম্যহীন জনসমাজ গঠনের পন্থা (Method) হিসাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা ধনতন্ত্রের অবসান ঘটান অপরিহার্য। এবিষয়ে অতি অল্প-কালের মধ্যেই সুস্পষ্ট দুইটি মতবাদ দেখা দিয়াছিল—জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অবসানের নীতি ও সর্ব-জাগতিক ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া রুশ সাম্যবাদ তথা সাম্যবাদ-নীতি রক্ষা করিবার নীতি।

রুশ বিপ্লবের আদর্শ—মতবাদ ও পন্থা

যাহা হউক, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রুশ বিপ্লব অর্থাৎ বল্‌শেভিক্ বিপ্লব

সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্ন দেখা দিল।

ব্রেষ্ট্-লিট্‌ভস্কের শান্তি-চুক্তি

বল্‌শেভিক্ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে অপসরণের জন্য যে-কোন মূল্যে জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত হইলেন। ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্কের শান্তি-চুক্তি দ্বারা রাশিয়া জার্মানিকে মোট পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিশাল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই কঠোর শর্তে শান্তি স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল, কারণ ইহার ফলে বল্‌শেভিক সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন।

বল্‌শেভিক্ সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই পররাষ্ট্রের নিকট হইতে জার শাসনকালে গৃহীত ঋণ এবং স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অস্বীকার করিলে মিত্রশক্তিবর্গ রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অপরাপর দেশের ধনতান্ত্রিক শাসনের অবসান ও পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদ স্থাপনের সংকল্প ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সন্দেহ ও ভীতি বৃদ্ধি করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশ সমগ্র রাশিয়ার অবরোধ ঘোষণা

জাপান, আমেরিকা ও ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক বল্‌শেভিক শাসনের বিরোধিতা

করিয়া ভ্লাডিভস্টক, মারমান্স্ক, আর্চেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানে মিত্রপক্ষ সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। ইহা ভিন্ন এই সুযোগে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও ট্রান্সককেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। রুমানিয়া বেসারাবিয়া অধিকার করিয়া লইল। এইভাবে বল্‌শেভিক সরকার সমগ্র ইওরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রত্যক্ষ শত্রুতার সম্মুখীন হইলেন।* বিদেশী সৈন্যগণ বল্‌শেভিক্ শাসন-বিরোধী রুশদের সহিত যোগদান করিয়া 'লাল' (Red) সরকারের স্থলে 'সাদা' (White) সরকার স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল।†

এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া বল্‌শেভিক্ সরকারকে প্রথমে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বৈদেশিক সেনাবাহিনীর

*** Langsam, p. 317.**

† "The foreign troops co-operated with the anti-Bolshevik natives to set up 'white' government."—*Ibid*, p. 317.

রাশিয়ায় প্রবেশ প্রকৃত দেশপ্রেমিক রুশদের সমর্থন লাভ করিল না। বল্‌শেভিক্ শাসনের পক্ষপাতী না হইলেও বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে অনেকেই উহার সাহায্যে দণ্ডায়মান হইল। জারদের আমলে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন তাঁহাদের দান এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলের কৃষকসম্প্রদায় বল্‌শেভিক্ আদর্শের কোন ধারণা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এবং সেই সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক কৃষকদের নিকট হইতে ফসল আদায়ের নীতির বিরোধী হইলেও তাহারা জার-শাসন পুনঃস্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিল। স্বভাবতই তাহারা বিদেশীদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্ সরকারকে সাহায্যদানে দ্বিধা করিল না।

বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশ যুবক কর্মচারিবৃন্দ ও কৃষকদের সাহায্য

এমতাবস্থায় বল্‌শেভিক্ সরকার 'চেকা' (Cheka) নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। রুশ-বিপ্লব প্রতিরোধ, সরকারী সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি যাহাকিছু বল্‌শেভিক্ শাসনবিরোধীরা করিতেছিল তাহা বন্ধ করাই ছিল 'চেকা' নামক প্রতিষ্ঠানটির কর্তব্য। ফরাসী বিপ্লবের কালে ফ্রান্সে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল (Revolutionary Tribunal)-এর মতই রুশ 'চেকা' বহু বল্‌শেভিক্-বিরোধীর প্রাণনাশ করিল। ইহা ভিন্ন জারের আমলের সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে একলক্ষ লালফৌজ (Red Army)-কে আধুনিক সমরশিক্ষা দেওয়া হইল। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্রত্যেক দেশেই আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের সমস্যা দেখা দিল। ফলে, মিত্রশক্তি-বর্গের যে সকল দেশ রাশিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল সেগুলির পক্ষে বল্‌শেভিক্ সরকার দমনের আগ্রহ প্রদর্শন করা সম্ভব হইল না। তদুপরি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রাশিয়ায় একলক্ষ সৈনিকের 'লালফৌজ' গড়িয়া উঠিলে সেই আগ্রহ আরও দমিত হইল। রাশিয়ার ন্যায় বিশাল দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লাভবান হইবার ইচ্ছাও ইওরোপীয় দেশসমূহের ছিল। ফলে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি প্রভৃতি রাশিয়ার অবরোধ উঠাইয়া লইল। ঐ বৎসরেরই শেষ-ভাগে বল্‌শেভিক্ সরকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিরোধিতার অবসান ঘটাইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর পর (১৯১৪-২০) রাশিয়ায় শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক্ রাশিয়া স্বল্প-পরিসর ছিল, কারণ, তখনও

'চেকা' (Cheka) ও 'লালফৌজ' (Red Army) গঠন

বল্‌শেভিক্ সরকার কর্তৃক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান

ফিনল্যাণ্ড, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া, হোয়াইট রাশিয়া, ইউক্রাইন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীন অথবা বিদেশী অধিকারে ছিল। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই বল্‌শেভিক্ রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ বৎসরই বল্‌শেভিক্ রাশিয়া 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট্ রিপাব্‌লিকস্' (Union of Soviet Socialist Repulics) নাম ধারণ করে। সরকারী কাগজ-পত্রে 'রাশিয়া' নামটি ঐ সময় হইতে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য অর্থাৎ Republics-এর সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১৬টি।

ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট্ রিপাব্‌লিকস্ (U. S. S. R.) নামকরণ

সোভিয়েত পররাষ্ট্র-সম্পর্ক, ১৯১৯-১৯৩৯ (Soviet Foreign Relations, 1919-1939):

বিপ্লবী রাশিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার প্রভাব, পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে মার্কস্-লেনিন মতবাদ, রুশ ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক প্রয়োজন, বিপ্লবোত্তর যুগে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ—এই সব কিছু রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মৌল সূত্র নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সোবিয়েত রাশিয়ায় পররাষ্ট্র-নীতি জার আমলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুসরণ মাত্র। এমনকি, স্বয়ং কার্ল মার্কস্ একদা বলিয়াছিলেন যে, রুশ পররাষ্ট্র নীতি অপরিবর্তনশীল। রুশ-পদ্ধতি, কৌশল, প্রভৃতির পরিবর্তন যদিও বা ঘটে, তাহা হইলেও রুশ উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না—এই উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীব্যাপী রুশ প্রাধান্য বিস্তার।* রাশিয়ার জারতন্ত্রের প্রতি মার্কস্-এর বিরূপ ভাব এবং বিপ্লব প্রথমে জার্মানিতে শুরু হইবে এই বিশ্বাস তাঁহাকে ঐরূপ মন্তব্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে তাঁহার ঐ উক্তি সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছিল। বাল্টিক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার, বলকান অঞ্চলে অধিকার স্থাপন, কন্‌স্টানটিনোপ্‌ল্ কুক্ষিগত করা, মাঞ্চুরিয়া ভাগ করিয়া লওয়া, মঙ্গোলিয়ায় স্বীয়

রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মৌল সূত্র

* "The policy of Russia is changeless ..Its methods, tactics, its manoeuvers may change but the polar star of its policy—the world domination—is a fixed star." Vide Hartman :—*The Relations of Nations*, p. 470.

পদক্ষেপে অনুপ্রবেশ করা, পারস্যের উত্তরাংশে এবং আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রুশ প্রভাব বিস্তার করা এবং ভারতবর্ষকে আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা—প্রভৃতি ছিল জার-শাসিত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। সোভিয়েত রাশিয়া মূলত জারদের আমলে অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতির মূল ধারা অপরিবর্তিত রাখিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কমিউনিজমের আদর্শের দিক্ দিয়াও সর্ব পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের নীতি রাশিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সাম্যবাদ ও পুঁজীবাদ—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের কথা মার্কস্-এর কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে বহুপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছিল। এই মৌলিক কমিউনিষ্ট মতবাদের সরাসরি প্রভাব স্বভাবতই রুশ পররাষ্ট্র-নীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট বিপ্লব এবং বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে রুশ লালফৌজ (Red Army) উহার সাহায্যে অগ্রসর হইবার ঘোষণা পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কমিউনিজম্ মতবাদে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, শান্তির মাধ্যমে পুঁজীবাদকে পরাজিত করা সম্ভব নহে, এজন্য প্রয়োজন রক্তাক্ত বিপ্লবের। এই সকল নীতি এবং বিশেষভাবে লেনিন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পাশাপাশি সাম্যবাদী রাশিয়ার অবস্থান কোনক্রমেই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না—এই দুই প্রকার রাষ্ট্রপদ্ধতির একটি অবসান একান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়া ও পুঁজীবাদী দেশসমূহের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য—এই ঘোষণা পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে এক তীব্র ঘৃণা ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস

বিপ্লবোত্তর যুগে সোভিয়েত রাশিয়া ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে এই সকল কারণে সন্দেহ, ভীতি, অবিশ্বাস ও শত্রুতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিপ্লবী সরকার কর্তৃক জারদের আমলে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ বাতিল এবং পররাষ্ট্রের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অস্বীকার পাশ্চাত্য দেশসমূহে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটিলে স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থায়িত্বলাভ করিল। কিন্তু পররাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আরও কয়েক বৎসর সন্দেহ ও বিদ্বেষপূর্ণ রহিয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক যুগের ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতির মূলধারাকেই অস্বীকার করিয়াছিল। আধুনিক

যুগের ইওরোপীয় রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র-সম্পর্কের মূলধারা বা নীতি-ই হইল শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পররাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে তাহাদের নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অথবা সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবার নীতি অনুসরণ করিবে না। যুদ্ধের কালে এই নীতির ব্যতিক্রম হইলেও শান্তির কালে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন-ভাবে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি করিবে না।* কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সাম্যবাদের সর্ব-জাগতিক আবেদনে বিশ্বাসী, সেজন্য তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা, চিঠিপত্রাদি ও প্রচারের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্যবাদ বিস্তারের সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলেন।† ইহা ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশে ধনতন্ত্রের অবসান না ঘটিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্যবাদ স্থায়িত্বলাভ করিবে না এই ধারণার বশবর্তী হইয়াও তাঁহারা সাম্যবাদকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। এজন্য অপরাপর রাষ্ট্রে প্রচারকার্য চালান প্রয়োজন হইল। ফলে অপরাপর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই অবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য জনসাধারণের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারিবে, এই ভীতিও ইওরোপীয় দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রথমে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইল না।

সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী প্রচার-কার্যের ফলে অপরাপর রাষ্ট্রে বিদ্বেষ ও ভীতির সৃষ্টি

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক শত্রুতাপূর্ণ

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী আদর্শ ও প্রচারকার্যাদির ফলে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান

---

*"To undermine security of another state by spreading disaffection among its subjects was an expedient which might be justified in time of war; but which was altogether contrary to the idea of normal relations. Soviet theory boldly rejected these fundamental assumptions." Carr, pp. 72-73.

†"So proud, however, were the Russian Revolutionaries of their methods, that they largely neutralised their effects by the extreme frankness with which they were in the habit of discussing them." Hardy, p 105.

যেভাবে ব্যাহত হইয়াছিল উহার অবসান ঘটান সোভিয়েত সরকারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সোভিয়েত সরকার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ-সাম্যবাদের স্থলে 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' (New Economic Policy—NEP) চালু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আগ্রহের পশ্চাতেও প্রধান কারণ ছিল অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য চুক্তি (Anglo-Russian Trade Agreement) স্বাক্ষরিত হইল।

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি (১৯২১)

পরবৎসর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যায়েড্ জর্জের চেষ্টায় প্রথমে কেনেস এবং পরে জেনোয়াতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহূত হইল। ল্যায়েড্ জর্জ আশা করিয়াছিলেন যে, জেনোয়া সম্মেলনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্তু ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিনিধিদ্বয় রাশিয়া কর্তৃক জার আমলের যাবতীয় বৈদেশিক ঋণ স্বীকার না করিলে কোনপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে রাজী হইলেন না। ফলে, রাশিয়ার সহিত ইওরোপীয় শক্তিবর্গের কোনপ্রকার মৈত্রী স্থাপিত হইবার বাধার সৃষ্টি হইলে রুশ প্রতিনিধি দেখিলেন যে, একমাত্র জার্মানিকে নিজপক্ষে টানিতে পারা যাইতে পারে। জার্মানি তখনও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সমপর্যায়ভুক্ত হয় নাই, সুতরাং রুশ প্রতিনিধি জার্মানি যাহাতে সোভিয়েত-বিরোধী দলের সহিত যোগ না দেয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেনোয়া সম্মেলনের বাহিরে রুশ-জার্মান প্রতিনিধিদ্বয় আলাপ-আলোচনা করিয়া 'র‍্যাপালো চুক্তি' (Rapallo Pact) স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তাদির কোন গুরুত্ব ছিল না বটে, কিন্তু এই চুক্তি জার্মানির ন্যায় একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকর্তৃক সোভিয়েত রাষ্ট্রের তথা সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য তখন পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, র‍্যাপালোর সন্ধি একদিকে যেমন সোভিয়েত সরকার ও জার্মান সরকারের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে উভয় দেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানি ও রাশিয়ার ন্যায় দুইটি বৃহৎ দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার অদূরদর্শিতা

কেনেস ও জেনোয়া সম্মেলন (১৯২২)

'র‍্যাপালোর চুক্তি'—ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপ

সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুইটি দেশকে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবার-বহির্ভূত রাখিবার ত্রুটি র‍্যাপালোর চুক্তির পর সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লেবার পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করিলে লেবার মন্ত্রিসভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর যাবতীয় দেনা-পাওনা ও দাবি-দাওয়া নাকচ করা হইল। ইহা ভিন্ন উপযুক্ত গ্যারান্টির বিনিময়ে সোভিয়েত সরকারকে ঋণদানের প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দিলেন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনমত, বিশেষভাবে রক্ষণশীলদলের সমালোচনার ফলে, এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সাধারণ নির্বাচনে লেবার দলের পতন ঘটিলে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা পুনরায় গঠিত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তির শর্তানুসারে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেনে কোনপ্রকার সাম্যবাদী প্রচারকার্য চালাইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তাঁহারা রক্ষা করেন নাই।*

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃত

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালি, ফ্রান্স, জাপান ও অপরাপর ইওরোপীয় দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সোভিয়েত সরকারকে তখনও স্বীকার করিতে রাজী হইল না। যাহা হউক, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশেষভাবে লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত সরকার সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের উপর আর ততটা গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। ইহার ফলে অপরাপর দেশের পক্ষে সোভিয়েত সরকারের সহিত আদান-প্রদানের পথও সহজ হইয়া উঠিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকারের কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা হেতু পরিস্থিতির কতক অবনতি ঘটিল। সোভিয়েত সরকার ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদী প্রচারকার্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন অথচ সেই সকল দেশের নিকট হইতে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা গ্রহণের এবং সেই সকল দেশ কর্তৃক সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির চেষ্টাও

ইতালি, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি কর্তৃক সোভিয়েত সরকার স্বীকৃত

সোভিয়েত সরকারের কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা

*Tinoviev Letter, Vide Carr, p. 76.

তাঁহারা করিতে লাগিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো-চুক্তি ছিল আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সমতার প্রতীকস্বরূপ অথচ সোভিয়েত সরকার এই চুক্তিকে সোভিয়েত-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলিয়া আখ্যা দিলেন। লোকার্ণো-চুক্তি জার্মানির পূর্ব-সীমান্তের প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া জার্মানিকে উহা নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তনের সুযোগ দিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে ইহা ছিল আপত্তিজনক, একথা অবশ্য স্বীকার্য। পর বৎসর (১৯২৬ খ্রী:) সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক অদূরদর্শিতার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। ঐ বৎসর গ্রেট ব্রিটেনের খনিগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হইলে সোভিয়েত সরকার ধর্মঘটীদের অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলে, ব্রিটেনের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল উহা বহুলাংশে বিনষ্ট হইল। শুধু ব্রিটেনের সহিত-ই নহে, সোভিয়েত সরকারের নীতি ফ্রান্সের সহিতও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সও উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে ফরাসী-সোভিয়েত সৌহার্দ্যের পথ কতকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকার ফরাসী দেশ হইতে কোন কোন সামগ্রী আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া, ফরাসী সরকারের নিকট রাশিয়ার ঋণ অস্বীকার করিয়া, বিশেষভাবে প্রয়োজনবোধে ধনতান্ত্রিক দেশ হইতে সোভিয়েত রাশিয়ার লালফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে ঘোষণা করিয়া ফরাসী সরকারকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। সাময়িক-ভাবে পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটিল যে, ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটাইলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২৪-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে সোভিয়েত কূটনৈতিক অসাফল্যের প্রধান কারণ ছিল কমিন্‌-টার্নের অর্থাৎ তৃতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যাল (Third International)-এর সাম্যবাদ প্রচার নীতি।* যাহা হউক, সাম্যবাদী প্রচার-কার্য ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এমন কি গ্রেট ব্রিটেনেও অপ্রতিহতভাবে চলিতে

ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্যবাদী প্রচারকার্য—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য

তৃতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যাল-এর কার্য-কলাপে সোভিয়েত কূটনীতিকদের অসাফল্য

---

*Gathorne Hardy, p. 108.

লাগিল। ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত সরকারকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। উপরন্তু ইংলণ্ডে অবস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসে ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের কতক কতক প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ করিয়া দিলেন (১৯২৭)। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত দূতগণকে গ্রেট ব্রিটেন হইতে চলিয়া যাইবারও আদেশ দেওয়া হইল। ঐ বৎসরই পোল্যাণ্ডে অবস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূতের হত্যা এবং চীনদেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাস আক্রমণ সোভিয়েত সরকারের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যখন এইরূপ তখন কমিউনিস্ট পার্টি হইতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-এর বহিষ্কার সাম্যবাদী বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-স্পৃহা কতকটা হ্রাস করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে সাম্যবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। ট্রট্স্কির মতে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে এককভাবে রাশিয়া সাম্যবাদী আদর্শ বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে না, এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান নীতি হওয়া উচিত পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্যবাদী বিপ্লবের সৃষ্টি করা। এজন্য রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বিলম্বিত হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে স্টালিনও রাশিয়ার সাম্যবাদ পূর্ণ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কির বহিষ্কার সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি করিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রচারের দিকে আর ততটা মনোযোগী হইবে না।

সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের রূপান্তর: ট্রট্স্কির বহিষ্কার

পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া ইতালি ও তুরস্কের সহিত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করিয়া অর্থনৈতিক আদান-প্রদান শুরু করিল। ইহার দুই বৎসর পর (১৯৩৩) রাশিয়া পোল্যাণ্ড, পারস্য, আফগানিস্তান, ল্যাট্ভিয়া, এস্তোনিয়া, তুরস্ক, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করিল। ঐ বৎসরই চীনদেশের সহিত রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইল।

ইওরোপীয় ও প্রাচ্যাঞ্চলের দেশসমূহের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি সোভিয়েত সরকারের সমর্থন লাভ করে নাই। সোভিয়েত সরকার এই চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত বিভিন্ন রাজ্যের সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার (Status Quo) নীতির বিরোধী ছিল কিন্তু হিট্‌লারের অধীনে জার্মানির পুনরুত্থান সোভিয়েত রাশিয়াকে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অপরিবর্তিত রাখিবার অর্থাৎ Status Quo রক্ষা করিবার নীতির সমর্থক করিয়া তুলিল। কারণ, রাশিয়ার দিকে জার্মানির সম্ভাব্য বিস্তার-নীতি তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশা ছিল। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করিবার নীতিও মানিয়া লইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্তি ইহার পরিচায়ক।

সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির সমর্থন

লীগ-অব্‌-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্তি

সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরি-উক্ত পরিবর্তন স্বভাবতই ফরাসী-রুশ সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। রাশিয়া কর্তৃক জার্মানির সহিত র‍্যাপালোর (Rapallo) মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর, জার আমলের যাবতীয় ঋণ অস্বীকার এবং ফ্রান্স কর্তৃক জারতন্ত্রের সমর্থকদের আশ্রয় দান ও রাশিয়ার শত্রুদেশ রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপন, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়া কর্তৃক সর্বাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব প্রভৃতি রুশ-ফরাসী বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসি দলের অভ্যুত্থান, ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দলের অভ্যুত্থান, সুদূর প্রাচ্যে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের সহিত এক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করিল। প্রধানত ফ্রান্সের নির্দেশেই রুমানিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পর বৎসর (১৯৩৫ খ্রীঃ) ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরস্পর সাহায্যের এক মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। অপর দিকে জাপানের ক্রমপ্রসার নীতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার বহির্মঙ্গোলিয়ার সহিত পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৯৩৬)।

নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থান—রুশ পররাষ্ট্র-সম্পর্কের নীতি পরিবর্তন

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি—রুশ-মঙ্গোলিয়ার মৈত্রী

সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক যখন এইভাবে ইওরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারের সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ তথা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের উদাসীনতা রাশিয়ার মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। অনুরূপ জার্মানি কর্তৃক রাইন অঞ্চলে পুনরায় সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার বিরোধিতা না করাও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নীতি সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারকে সন্দিহান করিয়া তুলিল। তদুপরি অক্ষশক্তিবর্গ অর্থাৎ জার্মানি-ইতালি-জাপানের কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর এবং হিট্‌লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকারকালে ইঙ্গ-ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা ক্রমেই সোভিয়েত সরকারের ভীতির কারণ হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় মিউনিক্ চুক্তির (Munich Pact) (১৯৩৮) দ্বারা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি হিট্‌লারকে চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করিতে দিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ রাশিয়ার নিরাপত্তার কথা মোটেই ভাবিতেছে না ইহা সোভিয়েত সরকারের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করিলেন। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যে-কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিলে রাশিয়ার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা—সোভিয়েত সরকারের সন্দেহের কারণ

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় কর্তৃক ইতালি ও জার্মানির প্রসারনীতির পরোক্ষ সমর্থন রাশিয়ার উদ্বেগের কারণ

সুতরাং আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে হইল। জার্মানির সহিত যাহাতে শীঘ্রই যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইতে হয় সেজন্য সোভিয়েত সরকার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এক অনাক্রমণ-চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে হিট্‌লারও রাশিয়াকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির পক্ষে পোল্যাণ্ড আক্রমণের আর কোন বাধা রহিল না। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল।

মিউনিক্ চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল—রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (আগষ্ট, ১৯৩৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

পঞ্চম অধ্যায়

উইমার রিপাব্লিক : জার্মানির পুনরভ্যুত্থান : নাৎসি পররাষ্ট্র-সম্পর্ক

(The Weimar Republic : German Resurgence : Nazi Foreign Relations)

উইমার রিপাব্লিক (The Weimar Republic) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার অল্পকালের মধ্যেই জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিল। জার্মানির সমাজবাদীরা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত করিল। জার্মান সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক পার্টি (German Social Democratic Party) তখন ক্ষমতায় আসীন ছিল। এই দলেও মতবিরোধ দেখা দিল। দলের অধিকাংশই অবশ্য ফ্রিড্রিক্ ইবার্ট ও ফিলিপ শিডেম্যান্-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিল। পক্ষান্তরে ঐ দলেরই একাংশ হ্যাসি (Haase) নামক নেতার অধীনে এই যুদ্ধের জন্য কোন ব্যয়-বরাদ্দ আর না করিবার মত প্রকাশ করিতে লাগিল। জার্মানির কমিউনিস্ট্‌গণ তাহাদের নেতা কার্ল লাইব্‌নেক্‌ট্ ও রোজা লাক্সেম্‌বুর্গের নেতৃত্বে যুদ্ধের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন এবং জার্মানিতে প্রোলিট্যারিয়েট শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য শুরু করিলেন। জার্মান কমিউনিস্ট্‌গণ 'স্পার্টাকাস' (Spartacus) ছদ্মনামে প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে লাগিলে কমিউনিস্ট্ নেতৃবর্গের অনেককে গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের প্রচারের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না।

যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে জার্মানদের মধ্যে মত-বিরোধ

এইরূপ পরিস্থিতিতে জার্মানির চ্যান্সেলর থিওবোল্ড ফন্ বেথ্‌ম্যান পদত্যাগ করিলে (জুলাই, ১৯১৭) তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন চ্যান্সেলর যুদ্ধের গতির কোন পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হইলেন না। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্যাডেনের প্রিন্স্ ম্যাক্সিমিলিয়ান এক কোয়ালিশন সরকার গঠন করিয়া চ্যান্সেলর পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রিসভায় সোশিয়ালিস্ট্ দলের দুইজন যোগদান করিলেন। চ্যান্সেলর ম্যাক্সিমিলিয়ান ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে জার্মানির সম্রাটপদকে সম্পূর্ণ শাসন-

জার্মানির শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

তান্ত্রিক রাজতন্ত্রে (Constitutional Monarchy) রূপান্তরিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এজন্য তিনি দ্রুত কতকগুলি সংস্কার চালু করিলেন, ফলে জার্মানি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। জার্মান সম্রাট নামে মাত্রই 'সম্রাট' রহিলেন। মন্ত্রিসভা সাধারণ সভা রাইক্স্ট্যাগের (Reichstag)-নিকট দায়ী থাকিবে, যুদ্ধ বা শান্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাইক্স্ট্যাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে, প্রভৃতি নীতি চালু করিবার ফলে জার্মান সম্রাট নামে মাত্র সম্রাট অর্থাৎ সম্রাটের প্রতীক স্বরূপ রহিলেন। মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমবেত হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার জনসাধারণকে দেওয়া হইল। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। এইভাবে জার্মানিকে এক প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির অধীনে আনিয়া প্রিন্স্ ম্যাক্সিমিলিয়ান মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ উইলসনের নিকট শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু জার্মান সম্রাট পদত্যাগ না করিলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উইলসন বিবেচনা করিতে রাজী হইলেন না। রাইক্স্ট্যাগে কাইজার উইলিয়াম (২য়) পদত্যাগ করুন এইরূপ দাবী উত্থিত হইল। কাইজার এরূপ পরিস্থিতিতে জার্মান সেনাবাহিনীর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং জার্মানির সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থল স্পা (Spa) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। চ্যান্সেলর ম্যাক্সিমিলিয়ান হোহেনজলার্ণ রাজবংশের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে কাইজার উইলিয়ামকে তাঁহার নাবালক পৌত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু কাইজার ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার আশা ছিল জার্মানির সেনাবাহিনী জার্মানির জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে সম্রাট পদে বহাল রাখিবার জন্য সাহায্যদান করিবে। কিন্তু জার্মান সেনাবাহিনী জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না স্পষ্টভাবে সম্রাটকে জানাইলে, উইলিয়াম ১০ নভেম্বর ১৯১৮, নেদারল্যাণ্ডে পলাইয়া গেলেন। ২৮শে নভেম্বর তিনি নিজ এবং তাঁহার বংশধরদের পক্ষে জার্মানির সিংহাসন ত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইলে জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল। জার্মানি একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। সাময়িকভাবে 'কাউন্সিল-অব-পিপল্‌স্-কমিসার' (Council of People's Commissar) নামে এক কার্যনির্বাহক সমিতির উপর জার্মানির শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই সমিতি প্রধানত

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

কাইজার উইলিয়ামকে পদত্যাগের অনুরোধ

কাইজার উইলিয়ামের হল্যাণ্ডে পলায়ন

জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসান

সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত ছিল। সমিতির যুগ্ম সভাপতি হইলেন ফ্রেডারিক ইবার্ট ও হ্যাসি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলের বহু সরকারী কর্মচারী তখনও কাজে বহাল রহিলেন। একমাত্র কমিউনিস্ট্ দল এই নবগঠিত সরকারের সহিত সহযোগিতায় রাজী হইল না। জার্মানির কমিউনিস্ট্গণ 'স্পার্টাকাস্' (Spartacus) নামে পরিচিত ছিল। নবগঠিত সরকার জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইলেন। দেশের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এই আশ্বাসও দেওয়া হইল। 'স্পার্টাকাস্' দল তাহাদের নেতা লাইব্নেক্ট্ (Liebnecht) এর অধীনে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিজম্ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহিলে ইবার্ট তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। লাইবনেক্ট্-এর প্রধান সহচর ছিলেন রোসা লাক্সেমবুর্গ। তাঁহারা এক সশস্ত্র আন্দোলন চালাইতে গিয়া পরাজিত এবং সরকার কর্তৃক ধৃত হইলেন এবং জেলখানায় লইয়া যাওয়ার পথে বিরোধী পক্ষের উত্তেজিত সমর্থকগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে 'স্পার্টাকাস্' দল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা বিফল হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক সপ্তাহ গোলযোগের পর স্পার্টাকাস্দের পতন ঘটিলে ১৯শে তারিখ জাতীয়-সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

'স্পার্টাকাস্'

'স্পার্টাকাস্' দলের পতন

সমগ্র জার্মানির ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট ৩½ কোটি নাগরিকদের মধ্যে মোট ৩ কোটি স্ত্রী-পুরুষের ভোটে জাতীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইলেন। মোট ৪২১টি আসনের মধ্যে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক' ১৬৩টি আসন লাভ করিল, সেন্ট্রিস্ট্ বা খ্রীষ্টান ডিমোক্র্যাট্স্ ৮৮, ডিমোক্রেটিক দল ৭৫, ন্যাশন্যালিস্ট্ দল ৪২, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ দল ২২ এবং পিপ্লস্ পার্টি ২১টি আসন প্রাপ্ত হইল। বাকী দশটি আসন অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অধিকারে আসিল। স্পার্টাকাস্ দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল না।

জাতীয় সভার গঠন

এই জাতীয় সংবিধান সভা ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯, উইমার (Weimar) নামক স্থানে অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করিল। এই সংবিধান পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং

উইমার অধিবেশনে উহা গৃহীত হইতে অধিক সময় লাগিল না। এই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থির হইল। রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের ভোটে সাত বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং কার্যকাল শেষ হইলে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন। নিম্নকক্ষ অর্থাৎ রাইকৃস্ট্যাগে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাঁহাকে অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর গণভোটের মাধ্যমে উহা জনসাধারণ যদি সমর্থন করে তাহা হইলেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা চলিবে।

উইমার সভার কার্যাদি : রাষ্ট্রপতি

উইমার সংবিধানে কোন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রপতি অবশ্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত দায়িত্ব দিবার উদ্দেশ্যে একথা স্থির হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতির কোন আদেশ কার্যকরী করিতে হইলে উহা চ্যান্সেলর অথবা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য রাইকৃস্ট্যাগ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু উহার ৬০ দিনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। জরুরী পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর একমত হইয়া সংবিধানের কোন কোন ধারা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার অপরাপর মন্ত্রী নির্বাচন করিবেন। মন্ত্রিগণকে জার্মান পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হইবে এরূপ কোন নীতি ছিল না। তবে নিম্নকক্ষ অর্থাৎ রাইকৃস্ট্যাগের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা না থাকিলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অধিকাংশের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

চ্যান্সেলর

একটি দুই-কক্ষ-যুক্ত পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। উর্ধ্ব কক্ষের নাম হইল 'রাইকৃস্ট্যাডাট্' (Reichstadt) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হইল 'রাইকৃস্ট্যাগ' (Reichstag)। উর্ধ্ব কক্ষ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইবে আর নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবেন। মোট চারি বৎসরের জন্য এই পার্লামেণ্ট নির্বাচিত হইবে। ফ্রেডারিক ইবার্ট (Friedrich Ebert) এই শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। ধর্মপালনের স্বাধীনতা সংবিধানে গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়াছিল।

উর্ধ্বকক্ষ : রাইকৃস্ট্যাডাট
নিম্নকক্ষ : রাইকৃস্ট্যাগ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র : ইবার্ট প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-পরিচালিত বা সমর্থিত কোন ধর্মাধিষ্ঠান রাখা হইল না। ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের স্কুলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করা হইল। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ভিন্ন সকল স্কুলই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল।

ধর্মস্বাধীনতা

উইমার জাতীয় সভা সংবিধান গ্রহণ করিবার পর নূতন কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিয়া নিজেই পার্লামেণ্টে রূপান্তরিত হইল এবং সরকার গঠন করিল। উইমার সংবিধান অনুসারে গঠিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। প্রথমে এই সরকারকে কমিউনিস্ট্ দমনে ব্যস্ত থাকিতে হইল। সেই সুযোগে রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ বিভিন্ন সংগঠন গড়িয়া তুলিল। রাজতন্ত্রের সমর্থকগণের স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ ছিল। তাহারা একথা প্রচার করিয়া দিল যে, যুদ্ধের শেষ দিকে প্রজা-তান্ত্রিকগণ জার্মান সম্রাটের সামরিক শক্তি গোপনে দুর্বল করিয়া দিয়া যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই নূতন সরকারের সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি সম্পাদন। মিত্রপক্ষের চাপে জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উইমার সভা সন্ধির শর্তাদি অনুমোদন করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন।

ভার্সাই-এর সন্ধি স্থাপন

ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলির কঠোরতা এবং মিত্রপক্ষের হস্তে জার্মান জাতির অপমান জার্মানির সর্বত্র এক ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ সার উপত্যকা (Saar Valley) সাময়িকভাবে জার্মানির হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ইবার্টের শাসনের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানির দেশপ্রেমিক সৈনিক-সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সহ্য করিতে রাজী ছিল না। ফলে, নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাইবার গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর উল্ফ্গ্যাং ক্যাপ্ (Dr. Wolfgang Kapp) এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লুডেনড্রফ্ (General Ludendroff) বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

উলফ্গ্যাং ও লুডেন-ড্রফের বিফলতা

কিন্তু ইহাতেও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিপদ কাটিল না। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ সোশিয়েলিস্ট্ নামক বামপন্থীরা শ্রমিকদের অসন্তোষের সুযোগ লইয়া ধর্মঘট শুরু করিল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচন, সরকারের দমন নীতির সমর্থক সামরিক বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট প্রভৃতি চালান তাহারা স্থির করিল। শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাইকস্ট্যাগের নির্বাচন ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। নূতন নির্বাচনে উইমার জাতীয় সভায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পশ্চাতে যে সমর্থন ছিল সেই সংখ্যা হ্রাস পাইল। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশিয়েলিস্ট্ নামক বামপন্থী দল, কমিউনিস্ট্ দল ও অপরাপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সমর্থ হইল। Proportional representation বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নীতি অনুসরণের ফলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকে ৬০,০০০ ভোটারদের ভোটে একজন করিয়া সদস্য রাইকস্ট্যাগে নির্বাচনের নীতি অনুসৃত হইবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দলের কিছু কিছু সদস্য নির্বাচিত হইলেন। ডেমোক্রেটস্, পিপ্‌লস্ পার্টি, সেণ্ট্রিস্ট্, প্রভৃতি বিভিন্ন দলের এক যুগ্ম সরকার গঠিত হইল। কন্‌স্টান্‌টিন ফেরেন্‌বাক্ চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ছিলেন সেণ্ট্রিস্ট্ দলভুক্ত।

উইমার সংবিধান অনুসারে গঠিত সরকারের পতনের কারণ

নূতন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

নূতন নির্বাচন (১৯২০) নূতন সরকার

উল্‌ফ্‌গ্যাং ক্যাপ-এর বিফলতা প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। প্রতিক্রিয়াশীলগণ ভার্সাই-এর অপমানজনক শর্তাদি যাঁহারা মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নীতি শুরু করিল। ইবার্ট, সিডেম্যান প্রভৃতির প্রাণনাশের একাধিক চেষ্টা করা হইল। এর্জ্‌বার্গার, ওয়ালটার রাথেন প্রভৃতিকে হত্যা করা হইল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিকে হিট্‌লার-লুডেনডর্ফ্ বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু গাস্টাভ্ ফন্ কার-এর অপর বিপ্লবী দল এবং হিট্‌লার-লুডেন্‌ডর্ফের দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করিলে এই বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইল। বিদ্রোহের নেতৃবর্গকে কয়েদ করা হইল।

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

এদিকে ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা ও অর্থনৈতিক চাপ, বেকারি, ফ্রান্স কর্তৃক রুহ্‌র দখল, জার্মান মুদ্রার মূল্যের অভাবনীয় পতন প্রভৃতি হিট্‌লার ও তাঁহার দলের

প্রচারকার্য সহজতর করিয়া দিল। দেশপ্রেমিকগণ ভার্সাইয়ের চুক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা, দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য উইমার জাতীয় সভা ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে দায়ী করিতে লাগিলেন।

প্রজাতন্ত্রের পতন

এই সুযোগে হিট্লারের পশ্চাতে সমর্থন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির জনসাধারণ জার্মান মুদ্রা মার্ক গ্রহণ করিতে বা শহরাঞ্চলে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। এই সবকিছু মিলিয়া শেষ পর্যন্ত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিল, হিট্লার ও তাহার নাৎসিদল ক্ষমতায় আসীন হইলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশা (Economic Prostration of Germany after the First World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী দেশমাত্রেরই অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘটিয়াছিল। নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন প্রভৃতি সমস্যা প্রত্যেক দেশেই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছিল বহুগুণে বেশি। বিশাল ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধে পরাজয়-জনিত হতাশা জার্মানির যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এমতাবস্থায় জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। মূল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) জার্মানির মুদ্রা-ব্যবস্থাকে যেমন অচল করিয়া দিয়াছিল, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশার সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য সহজেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময়ে এডল্ফ্ হিট্লার নামে জনৈক প্রাক্তন সৈনিক 'ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্' (National Socialists) বা নাৎসি (Nazi) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। হিট্লারের নেতৃত্বাধীনে ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ দল বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হৃতমর্যাদা জার্মানিকে পুনরায় ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল। জার্মানি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি যে মানিয়া চলিবে না বা এইরূপ শান্তি-চুক্তি জার্মানির পক্ষে যে মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না একথা সকলেই, এমন কি, ফরাসীরাও স্বীকার করিত। কিন্তু ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিজম্-এর নামে এবং হিট্লারের নেতৃত্বাধীনে জার্মানিতে যে এইরূপ প্রতিক্রিয়াপন্থী সরকার স্থাপিত হইবে এবং জার্মানির পুনরুভ্যুত্থান যে

যুদ্ধোত্তর কালে জার্মানির দুর্দশা

নাৎসি দলের অভ্যুত্থান

সমগ্র ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া এক দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করিবে তাহা অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক টয়েনবি অবশ্য নাৎসিদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, নাৎসিবাদের সকল কিছুই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা না গেলেও একথা বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই যে, ইহা নিম্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক মতবাদ।* ডক্টর উলফার (Dr. Wolfer)-ও নাৎসি দল সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

হিট্‌লারের নেতৃত্ব

নাৎসি নেতা হিট্‌লারের সমগ্র জার্মানি ও জার্মান জাতির একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। হিট্‌লার মূলত জার্মানির নাগরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার অধিবাসী। অথচ তিনি জার্মানির শক্তি ও জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার সৃষ্টি করিয়া ইওরোপে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হের হেস্, গোয়েরিং, ফেডার, রোজেনবার্গ, গোয়েব্‌ল্‌স্ প্রভৃতির সাহায্যে হিট্‌লার 'ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্' নামক দল গঠন করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ফলে, তাঁহাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় হিট্‌লার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেঁই ক্যাম্পফ্' (Mein Kampf) রচনা করেন। নাৎসি দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ এই গ্রন্থে উল্লিখিত নীতির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, হিট্‌লার তথা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল (১) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি নাকচ করা (২) জার্মান জাতির লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা (Pan-Germanism), (৩) জার্মান-অধ্যুষিত বিদেশী সরকারের অধীন অঞ্চলসমূহে জার্মান ঐক্যের ধারণার সৃষ্টি করিয়া সেই সকল অঞ্চলকে জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা। এই শেষোক্ত নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হিট্‌লার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জার্মানির পদাতিক, নৌ, বিমান, গোলন্দাজ প্রভৃতি চারিটি বাহিনী ত' রহিয়াছেই ইহা ভিন্ন জার্মান জাতির লোক বিদেশে

হিট্‌লার, গোয়েরিং, হেস্, গোয়েব্‌ল্‌স্ প্রভৃতি কর্তৃক নাৎসিদল গঠন

মেঁই ক্যাম্পফ্ গ্রন্থে বর্ণিত নাৎসি দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

* "....many things might be obscure, but one thing you could count on was that Nazis were on the down-grade".—*Toynbee*, vide, *International Affairs*, 1934, p. 343 : Hardy, p.357.

যেখানেই বসবাস করিতেছে তাহারা সকলেই 'পঞ্চম বাহিনী' স্বরূপ কাজ করিবে। (এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশদ্রোহিতার কাজ এখন পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ—Fifth column activities নামে অভিহিত হইয়া থাকে)। (৪) নাৎসিবাদের অপর আদর্শ ছিল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা এবং যেহেতু জার্মানগণ জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ সেহেতু সর্বত্র জার্মান অধিকার স্থাপন করা।

উপরি-উক্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম পন্থা ছিল প্রচারকার্যের উপর জোর দেওয়া। এই প্রচারকার্যে সত্য-মিথ্যার কোন ধার ধারা হইত না। প্রচারকার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক করিয়া তোলা। ব্যক্তির জীবন ও কার্যকলাপ, রাষ্ট্রের উন্নতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নহে এই ধারণার সৃষ্টি করাও ছিল এই প্রচারকার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। হিট্‌লার 'জনসাধারণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবপ্রবণ, যুক্তি ও বিচারক্ষমতাহীন' বলিয়া মনে করিতেন। স্বভাবতই, জনসাধারণকে নানাভাবে উস্কাইয়া দিয়া তিনি কার্যসিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন।

নাৎসি কার্যপন্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির জনসাধারণের আর্থিক ও মানসিক অসন্তুষ্টির সুযোগ লইয়া হিট্‌লারের নেতৃত্ব ক্রমেই সমগ্র জার্মান জাতির উপর বিস্তৃত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির হস্তে জার্মানির পরাজয় এবং ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অপমানজনক শর্তাদি জার্মান জাতিকে প্রতিশোধপরায়ণ করিয়া রাখিয়াছিল। হিট্‌লারের নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও নীতি স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ফলে, নাৎসি দলের সদস্য সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাৎসি দলের সমর্থকদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসর সাধারণ নির্বাচনে জার্মান প্রতিনিধিসভা 'রাইকস্ট্যাগ' (Reichstag)-এ নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও হের্ ফন্ প্যাপেন-এর রাজনৈতিক কারসাজির ফলে নাৎসি নেতা হিট্‌লার জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় জার্মান প্রতিনিধিসভা 'রাইকস্ট্যাগ্'-এর মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮৪ জনের মধ্যে নাৎসি দলের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১৯৬ জন। যাহা হউক, একবার ক্ষমতায় আসীন হইয়া হিট্‌লার তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবার পাত্র ছিলেন না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাইকস্ট্যাগ্ সভাগৃহে জনৈক অর্ধ-

নাৎসি দলের সমর্থক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

হিট্‌লারের ক্ষমতা লাভ

উন্মাদ ওলন্দাজ অগ্নিসংযোগ করিলে হিট্‌লার সেজন্য কমিউনিস্ট্‌দিগকে দায়ী করিলেন। এই অজুহাতে তিনি কমিউনিস্ট্‌ ও সোশিয়েল ডেমোক্রেট্‌ দলের নেতৃবর্গ যাঁহারা রাইকৃস্ট্যাগের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দেশে কমিউনিস্ট্‌ ভীতির ধুয়া তুলিয়া হিট্‌লার নাৎসি দলের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পরবর্তী যে নির্বাচন হইল তাহাতে নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে হিট্‌লার রাইকৃস্ট্যাগের সাহায্যে চারি বৎসরের জন্য পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা বাতিল করিলেন এবং নাৎসি দল ও উহার নেতা—অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ আইন পাশ করাইয়া লইলেন। এইভাবে হিট্‌লার যখন জার্মান রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিনায়কে পরিণত হইলেন সেই সময় জার্মান প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিট্‌লার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেণ্ট উভয়পদেই নিযুক্ত হইলেন। তিনি হইলেন জার্মান জাতির 'ফুহ্‌রার' (Feuhrer)। হিট্‌লারের একক-অধিনায়কপদে আসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল ইহুদি নির্যাতন। জার্মান জাতি 'আর্য' সেহেতু সেমিটিক জাতির লোকের প্রতি তাহাদের তীব্র ঘৃণা ছিল। আর্য জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অন্যতম উপায় হিসাবে ইহুদি নির্যাতন পৃথিবীর সর্বত্র ঘৃণার উদ্রেক করিল। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও হিট্‌লারের ইহুদি নির্যাতন নীতির হাত হইতে রেহাই পাইলেন না।

কমিউনিস্ট্‌ ও সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দল দমন

হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্ব লাভ

নাৎসি পররাষ্ট্র-নীতি ও পররাষ্ট্র-সম্পর্ক (Nazi Foreign Policy and Foreign Relations): ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্‌ তথা নাৎসি দলের পররাষ্ট্র-নীতির আংশিক আলোচনা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোচনা কালে করা হইয়াছে। নাৎসি দলের আবেদন জার্মান জাতির নিকট যাহাতে মনোগ্রাহী হয় সেজন্য প্রচারকার্যের যেমন ত্রুটি ছিল না, তেমনি পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণেও নাৎসি দলের জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। হিট্‌লার তথা নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য ও নীতি হিট্‌লার রচিত মেঁই ক্যাম্পফ্‌ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

নাৎসি জার্মানির পররাষ্ট্র-নীতি

প্রথমত, ইওরোপীয় মহাদেশে জার্মানি ভিন্ন অপর কোন দেশকে প্রাধান্য অর্জনে বাধা দান। এজন্য জার্মানির সীমান্তবর্তী ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির

(১) ইওরোপ মহাদেশে জার্মানি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তির উত্থান রোধ

চেষ্টা জার্মান জাতিকে আক্রমণাত্মক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে বাধাদান করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন যে রাষ্ট্রের শক্তি জার্মান জাতির কোনপ্রকার অস্বস্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, ভার্সাই-এর চুক্তি জার্মানিকে পদানত ও হৃতমর্যাদা করিয়াছিল। এই চুক্তি ও সেণ্ট্ জার্মেইন (St. Germain)-এর চুক্তি বাতিল করিতে হইবে।

(২) ভার্সাই ও সেণ্ট জার্মেইন-এর চুক্তি বাতিলকরণ

বলা বাহুল্য এই নীতি জার্মানির সকল শ্রেণীর লোকের আন্তরিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি ছিল বলিয়া ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য হিট্‌লারের যাবতীয় কার্যকলাপ জার্মান জাতির স্বাভাবিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

তৃতীয়ত, জার্মান জাতির লোক-অধ্যুষিত ইওরোপের যাবতীয় অঞ্চল লইয়া বৃহত্তর জার্মান জাতি ও জার্মান রাষ্ট্র গঠন। 'প্যান-জার্মানিজম্' (Pan-Germanism) ছিল নাৎসি দলের অন্যতম প্রধান নীতি এবং পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তিস্বরূপ।

(৩) জার্মান জাতির সকলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা 'প্যান্-জার্মানিজম্'

চতুর্থত, জার্মান জাতির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য এবং জার্মানির উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় রাজ্য জয়। রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন সীমান্তবর্তী রাজ্য সম্পর্কেই এই নীতি প্রযোজ্য ছিল।

(৪) জার্মানির উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় রাজ্য জয়

সর্বশেষে, নাৎসি দল তথা হিট্‌লারের চরম উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিতে পারিলে হিট্‌লার নিজের তথা নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে মনে করিতেন।*

(৫) জার্মানিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নয়ন

উপরি-উক্ত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া হিট্‌লার তথা নাৎসি সরকার জার্মান জাতিকে ব্যাপক প্রচারকার্যের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। যুদ্ধ নীতিগতভাবে সকলের নিকট-ই ঘৃণ্য হইলেও জাতীয় মর্যাদা, রাষ্ট্রগত প্রাধান্য প্রভৃতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সম্মোহিনী শক্তির প্রভাব এড়াইয়া চলা বহু

নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির সম্মোহিনী প্রভাব

*"World-power or nothing." Hardy, p. 362.

লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মানির জাতীয় অপমান দূর করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জার্মান রাষ্ট্রের ও জার্মান জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার সংকল্প জার্মানির সকল শ্রেণীর লোকেরই সমর্থন লাভ করিল।

নাৎসি নীতি ও প্রচার-কার্যের ফলে ইওরোপে ভীতির সৃষ্টি

হিট্‌লারের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং জার্মান পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে তাঁহার নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রচার ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বভাবতই জার্মানি সম্পর্কে এক ভীতির সঞ্চার করিল। জার্মান আক্রমণের ভীতি জার্মান রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের মধ্যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। জার্মানির পুনরুত্থান আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইল।

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা

জার্মানির পুনরুত্থান ও 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ফ্রান্স ও রাশিয়ার সর্বাধিক ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইলেও ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভের উল্লাস শেষ হইবামাত্র জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই ফ্রান্স নিজ জয়কে প্রকৃত জয় বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। লীগের মাধ্যমে এবং লীগের বাহিরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে ফ্রান্সের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু কোনভাবেই ফ্রান্স নিজ মনোমত কোন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বা শান্তি ব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। লোকার্ণো চুক্তি এবিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইলেও নিরাপত্তা সম্পর্কে ফ্রান্সের যে ধারণা ছিল তাহা ইহাতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই। আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার উপায় হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল মাত্র। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর অনাক্রমণ-চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু হিট্‌লারের জার্মানির একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং তাঁহার সাম্যবাদ-বিরোধী নীতি সাম্যবাদী দেশ রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। জার্মানি ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলে রাশিয়ার তথা সাম্যবাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই কারণে সোভিয়েত সরকার

হিট্‌লারের অভ্যুত্থান—ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার ভীতির কারণ

ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি অপরিবর্তিত রাখিবার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

রাশিয়ার লীগ সদস্য-পদভুক্তি—রুশ-ফরাসী পরস্পর সাহায্যের চুক্তি (১৯৩৫)

এদিকে হিট্‌লারের নীতি ও প্রকাশ্য উক্তিতে ফ্রান্সের ভীতি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি কর্তৃক লীগ ত্যাগ ও ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক প্রস্তুতি ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, ফ্রান্স রাশিয়াকে লীগের সদস্যপদভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল এবং ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও ইতালির উদ্যোগে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাশিয়া প্রথমে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ বিরোধী ছিল কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় লীগের সদস্যপদভুক্ত হইয়া ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্য পরস্পর সামরিক সাহায্যের এক চুক্তিতে দৃঢ়তর হইল (১৯৩৫)।

নাৎসি জার্মানির উত্থান 'লিট্‌ল আঁতাত' (Little Entente)-এরও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। প্রধানত অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভার্সাই-এর শর্তাদি যাহাতে পরিবর্তন করিতে না পারে সেজন্যই 'লিট্‌ল আঁতাত' গঠিত হইয়াছিল। জার্মানির আক্রমণ হইতে কেবলমাত্র চেকোস্লোভাকিয়া ভিন্ন অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রের (যুগো-

জার্মানির পুনরুত্থান—'লিট্‌ল আঁতাত'-এর উপর প্রভাব

স্লাভিয়া ও রুমানিয়া) তেমন ভীতির কারণ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রুমানিয়ার ভীতির কারণ আর যুগোস্লাভিয়ার ভীতির কারণ ছিল ইতালি। লিট্‌ল আঁতাত-এর এই দুইটি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি অনভিপ্রেত ছিল না। ব্রেনার গিরিপথের দিকে জার্মানির বিস্তার ইতালি-অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভীতি হইতে যুগোস্লাভিয়াকে কতকটা মুক্ত করিয়াছিল। অনুরূপ রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বেসারাবিয়ার অধিকার লইয়া মনোমালিন্য ছিল বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী জার্মানির অভ্যুত্থান রুমানিয়ার পক্ষে কাম্য ছিল। এমতাবস্থায় বাহ্যত 'লিট্‌ল আঁতাত'-এর সদস্যরাষ্ট্রবর্গ পরস্পর সৌহার্দ্য ও সাহায্য-সহায়তার কথা বলিলেও প্রকৃতক্ষেত্রে রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার আন্তরিক সমর্থন ছিল জার্মানির পক্ষে আর চেকোস্লোভাকিয়ার সমর্থন ছিল রাশিয়ার পক্ষে। এইভাবে বলকান অঞ্চলে নাৎসি জার্মানির সমর্থকের অভাব হইল না।

জার্মানির পুনরুত্থান ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে ফ্রান্স চিরশত্রু জার্মানির

বিরুদ্ধে নিজ সীমারেখার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। বলা বাহুল্য জার্মানির পুনরুত্থান ফ্রান্সের পক্ষেই সর্বাধিক ভীতি ও ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বার্‌থো (Barthou) জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত পরস্পর সাহায্যের চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের সৌহার্দ্যমূলক দৌত্যকার্যে গমন করিলেন। ইহার পর তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে পূর্ব-ইওরোপীয় শক্তিবর্গের একটি মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করিলেন। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া ও বাল্টিক রাজ্যগুলির মধ্যে লোকার্ণো চুক্তির অনুরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করা হইলে পোল্যাণ্ড উহাতে রাজী হইল না। কারণ, পোল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে ইতিমধ্যে একটি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া পোল্যাণ্ড জার্মান-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরে স্বীকৃত হইল না। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার প্রতি পোল্যাণ্ড ছিল শত্রুভাবাপন্ন, কারণ, পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দীর্ঘকাল রাশিয়ার অধিকারে ছিল, পোল্যাণ্ডবাসীরা সেকথা ভুলে নাই। পোল্যাণ্ডের বিরোধিতায় পূর্বাঞ্চলের লোকার্ণো চুক্তি (Eastern Locarno Pact) শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হইল না। যাহা হউক ফরাসী প্রধান মন্ত্রী বার্‌থো গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া ও তুরস্ক—এই চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে অনুরূপ আঞ্চলিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জার্মানির বিরুদ্ধে আবেষ্টনী গড়িয়া তুলিবার কার্যে আরও উৎসাহিত হইলেন। বলকান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত উপরি-উক্ত মৈত্রী চুক্তি 'বলকান চুক্তি' (Balkan Pact) নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুলগেরিয়া বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজী হয় নাই। কারণ বুলগেরিয়া প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু বলকান চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রবর্গ উহা রক্ষা করিয়া বিশেষভাবে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি বজায় রাখিয়া জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করিবার পক্ষপাতী ছিল। যাহা হউক, বার্‌থো তাঁহার চেষ্টায়

জার্মানির পুনরুত্থান ফ্রান্সের ভীতির কারণ

ফ্রান্স কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের লোকার্ণো (Eastern Locarno) চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব

পোল্যাণ্ডের বিরোধিতা—পূর্ব-ইওরোপের লোকার্ণো চুক্তির চেষ্টা ব্যর্থ

বলকান চুক্তি (Balkan Pact) —বুলগেরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

দমিলেন না। কিন্তু বুলগেরিয়া ও ইতালি উভয়দেশই প্যারিসের শান্তি-চুক্তি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া এই দুই দেশে স্বভাবতই মিত্রতা স্থাপিত হইল। বুলগেরিয়া বলকান চুক্তিতে যোগ না দিয়া ইতালির সাহায্যের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিবার ফলে বলকান চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইল। কারণ এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ছিল বলকান অঞ্চলে জার্মানি তথা ইওরোপের কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের কোনপ্রকার প্রাধান্য বিস্তারে বাধা দান করা। বুলগেরিয়া-ইতালি সৌহার্দ্য এবং বুলগেরিয়া কর্তৃক বলকান চুক্তি প্রত্যাখ্যানের ফলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

বলকান চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ

এদিকে জার্মানির পুনরুত্থান পোল্যাণ্ডের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলে পোল্যাণ্ড আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিতই অনাক্রমণ নীতি এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর সমস্যার সমাধানের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিল (জানুয়ারি, ২৬, ১৯৩৪)। জার্মানি ও রাশিয়ার রাজ্যাংশ কাড়িয়া লইয়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ড গঠিত হইয়াছিল। জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তি আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ করে নাই এবং হিট্‌লার তথা নাৎসিদলের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতমপ্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উহার পরিবর্তন সাধন। এজন্য জার্মানি পোল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে একথা পোল্যাণ্ডবাসীদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু পূর্ব-শত্রু রাশিয়ার সহিত পোল্যাণ্ডের মিত্রতা স্থাপনের প্রশ্নও ছিল অবান্তর। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে দশ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ড ও জার্মানি পরস্পর সমস্যা সমাধানে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে র‍্যাপ্যালোর (Rapallo)-র মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে পোল্যাণ্ডে ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ, রাশিয়া ও জার্মানি উভয় দেশই ছিল পোল্যাণ্ডের শত্রুদেশ। এই দুই শত্রুদেশ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব লোপ পাইবে একথা পোল্যাণ্ডবাসীরা জানিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্রান্স ছিল পোল্যাণ্ডের একমাত্র মিত্র, কিন্তু যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের দুর্বলতার কথাও পোল্যাণ্ডবাসীদের অবিদিত ছিল না। এমতা-বস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন-বিরোধী নাৎসি জার্মানির উত্থান পোল্যাণ্ডের ভীতি কতক পরিমাণে দূর করিল। এইভাবে ক্রমে পোল্যাণ্ড জার্মানির দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সহিত পোল্যাণ্ডের এক চুক্তি

জার্মানি ও পোল্যাণ্ড

জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর সমস্যা সমাধানের দশসালা চুক্তি

স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অন্তত দশ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ডের ভীতি যেমন কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল, তেমনি জার্মানিকে অপরাপর সমস্যার প্রতি পূর্ণমাত্রায় মনোযোগ দিবার সুযোগ দিয়াছিল।

জার্মানির পুনরুত্থান ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। মুসোলিনি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভার্সাই-এর চুক্তির পরিবর্তনের উপরই ইওরোপীয় শান্তি নির্ভরশীল। জার্মানি ভার্সাই-এর চুক্তি পরিবর্তন না করিয়া ছাড়িবে না একথা নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইতালির দিক দিয়াও প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষেও শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইওরোপের নিরাপত্তা বা শান্তি বজায় রখিবার প্রয়োজনে ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তনই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া মুসোলিনি ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Four Power Pact) প্রস্তাব করিলেন। ইওরোপের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা এবং প্যারিসের শান্তি-চুক্তির—অর্থাৎ ভার্সাই, সেণ্ট জার্মেইন, নিউলি প্রভৃতি চুক্তির পরিবর্তন সাধনই ছিল এই চতুঃশক্তির উদ্দেশ্য। ইওরোপের প্রধান শক্তিবর্গের—ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেনের জার্মানির প্রতি তোষণমূলক নীতি অনুসরণের প্রস্তাব 'লিট্‌ল আঁতাত' স্বাক্ষরকারী দেশগুলি—চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রেট ব্রিটেনেও এই চুক্তির বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশিত হইল। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের চাপে চতুঃশক্তি চুক্তির শর্তাদির এমন পরিবর্তন করা হইল যে, ফলে উহার মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া উহা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হইয়া পড়িল।

চতুঃশক্তি চুক্তি
(Four Power Pact)

১৯১৯ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বাবধি অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ লোকই জার্মানির সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তির (Anschluss) পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলন থামাইয়া দিল। কারণ, অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ—সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দল,

ইহুদিগণ কেহই জার্মান জাতির ন্যায় নাৎসি স্বৈরাচারের অধীন হইতে রাজী হইল না। হিট্লারের ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী নীতির ফলে অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক চার্চ নাৎসি-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার ক্যাথলিক চার্চের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে ক্যাথলিক চার্চও নাৎসি জার্মানির সহিত সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করিলে অস্ট্রিয়া কেবল জার্মানির সহিত সংযুক্তির বিরোধী হইল না নাৎসিদের প্রতিও শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে নাৎসি সরকার অস্ট্রিয়ায় জার্মানির পক্ষে এবং অস্ট্রিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইলেন এবং গোপনে অস্ট্রিয়ার নাৎসি দলকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইতে লাগিলেন। ফলে অস্ট্রিয়ায় নাৎসি দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়া ইতালির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইল। ইতালি অস্ট্রিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিল, কিন্তু সেই সাহায্যের বিনিময়ে সোশিয়েল ডেমোক্রেটিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ফ্যাসিস্ট্ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসনব্যবস্থা অস্ট্রিয়ায় স্থাপন করিতে হইল। ফলে, অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে ইতালির প্রভাব বিস্তৃত হইল। এইভাবে হিট্লারের অষ্ট্রীয়-নীতি বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়া

ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মিত্রতা

হিট্লারের অষ্ট্রীয়-নীতির ব্যর্থতা

হিট্লার তাঁহার অষ্ট্রীয়-নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া পরবর্তী দুই বৎসর (১৯৩৪-৩৬ খ্রীঃ) অস্ট্রিয়ার প্রতি কতকটা উদার-নীতি অবলম্বন করিলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বন্ধ করা হইল, ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা জার্মানি কখনও ক্ষুন্ন করিবে না এরূপ ঘোষণাও হিট্লার একাধিকবার করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ইওরোপে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিলে ইওরোপীয় মহাদেশে মুসোলিনির প্রভাব হ্রাস পাইল। অস্ট্রিয়া এমতাবস্থায় জার্মানির সহিত এক সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইতালি-জার্মানি সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিলে অস্ট্রিয়ার উপর ইতালি ও জার্মানির এক যুগ্ম প্রভাব বিস্তৃত হইল।

ইতালি-জার্মানি মৈত্রী

হিট্লার কর্তৃক ভার্সাই ও সেণ্ট জার্মেইনের চুক্তি বাতিলকরণ (Repudiation of the Treaties of Versailles and St. Germain by Hitler) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে পদানত করিবার এবং জার্মানি

যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া না উঠিতে পারে সেজন্য প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সমবেত বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ নিজেদের ইচ্ছামত শর্তাদি জার্মানির উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহা-ই নহে, এ ব্যাপারে জার্মানির বক্তব্যের কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ না করিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইবে এই ভীতি প্রদর্শন করিতেও তাহারা দ্বিধাবোধ করে নাই। উপরন্তু জার্মানির প্রতিনিধিবর্গকে অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলন কক্ষে আনা এবং অনুরূপভাবে তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া, প্রভৃতির ফলে পরাজিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই সকল কথা স্মরণ রাখিলে এডল্‌ফ্‌ হিট্‌লারের আমলে জার্মানির পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতি জার্মানির ব্যবহারের নীতি সহজে উপলব্ধি করা যাইবে। জার্মানির প্রতি অহেতুক কঠোরতা কেবলমাত্র জার্মান জাতির মনেই যে হতাশা ও প্রতিশোধপরায়ণতার সৃষ্টি করিয়াছিল, এমন নহে। ইওরোপের অপরাপর দেশসমূহেও জার্মানির উপর এইরূপ কঠোর শর্ত-সম্বলিত শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হইয়াছিল। উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই ও সেণ্ট্‌ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি অমান্য করিবার প্রশ্নের আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

হিট্‌লার কর্তৃক শান্তি-চুক্তি ভঙ্গের যুক্তি

হিট্‌লারের ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট্‌ পার্টির (National Socialist Party) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ভার্সাই ও সেণ্ট্‌ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি নাকচ করিবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অষ্ট্রিয়ায় Anschluss বা জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছিল। কিন্তু ভার্সাই শান্তি-চুক্তিতে উহা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, অধিকতর সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়া যেরূপ অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হিসাবেই জার্মানির সহিত অষ্ট্রিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই কারণেও হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই, সেণ্ট্‌ জার্মেইন ও লোকার্ণো চুক্তি অমান্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট্‌ পার্টির নির্দেশ

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানির চান্সেলর পদ লাভ করিবার অব্যবহিত পরে জার্মানি জেনিভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে বাহির হইয়া আসে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই হিট্লার কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি অমান্যের ইতিহাস শুরু হয়। গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতে ভার্সাই শান্তি-চুক্তির কঠোরতা হিট্লারকে উহা অমান্য করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল একথা ঠিক নহে। তাঁহার মতে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার Anschluss অর্থাৎ ঐক্য সুদূরপরাহত একথা উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর এবং বিশেষভাবে ইওরোপের দেশসমূহকে সচকিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে হিট্লার ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অমান্য করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্যাথোর্ণ হার্ডির এই মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কারণ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা হিট্লারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ-সম্বলিত গ্রন্থ মেঁই ক্যাম্পফ্ (Mein Kampf)-এ পাওয়া যায়। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি উপেক্ষা করিয়া জার্মানিকে পুনরায় সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করিয়া তোলার কাজ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অর্থাৎ হিট্লারের ক্ষমতায় আসীন হইবার সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল।

গ্যাথোর্ণ হার্ডির মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নহে

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় ইঙ্গ-ফরাসী সরকার ভার্সাই শান্তি-চুক্তির দ্বারা জার্মানির উপর আরোপিত সামরিক শর্তাদি নাকচ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিমান বাহিনীর আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকার্ণো চুক্তির অনুরূপ একটি 'বিমান লোকার্ণো' (Air Locarno) চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত জার্মানিকেও আমন্ত্রণ করা স্থির হইয়াছিল। জার্মানিকে বিমান লোকার্ণো চুক্তির অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতে অন্তত একথা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, সেই সময়ে জার্মানির নিজস্ব একটি বিমানবহর ছিল ইহা ইঙ্গ-ফরাসী সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নতুবা Air Locarno চুক্তিতে জার্মানিকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের কোন যুক্তিই ছিল না। সুতরাং জার্মানি যে প্রকাশ্যভাবে শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার পূর্বেই সামরিক প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা ইওরোপীয় দেশসমূহ, বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জানা ছিল। ঐ বৎসরই (১৯৩৫) ৪ঠা মার্চ তারিখে ব্রিটিশ সরকার এক পার্লামেন্টারি পেপারে (Parliamentary Paper) জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই চুক্তির পঞ্চম অংশের (Part V) শর্তাদি ভঙ্গ করিয়া সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিয়াছে, সে কথার উল্লেখ করেন। সুতরাং ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয় জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি অমান্য করিয়া

ইঙ্গ-ফরাসী সরকার কর্তৃক জার্মানির সামরিক প্রস্তুতি স্বীকার

সামরিক প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হইতে কোন বাধা দান করেন নাই। এই পরোক্ষ সমর্থন হিট্‌লার কর্তৃক শান্তি চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিবার সুযোগ ও ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। অবশ্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পার্লামেন্টারি পেপারে জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির উল্লেখ ব্রিটিশ সরকারের জার্মান-ভীতির পরিচায়ক ছিল সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ শক্তির এই ভীতি ফরাসী সরকারের ভীতির মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। ফরাসী সরকার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নিয়ম-কানুন শিথিল করিয়া দিয়া ফরাসী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে হিট্‌লার প্রকাশ্যভাবে জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ভার্সাই শান্তি-চুক্তির বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও হিট্‌লার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ঘোষণা করিলেন যে, জার্মানি একটি বিমানবাহিনী গঠন করিয়াছে। ইহাই ছিল ভার্সাই শান্তি-চুক্তির পঞ্চম অংশের (Part V) প্রকাশ্য লঙ্ঘনের প্রথম উদাহরণ। ইহার এক সপ্তাহের মধ্যে হিট্‌লার জার্মানির শান্তিকালীন সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা ৫,৫০,০০০ করিবার আদেশ জারি করিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নিয়ম পুনরায় চালু করা হইল। বলা বাহুল্য, এই সকলই ভার্সাই শান্তি-চুক্তির শর্তাদির বিরোধী ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী ভীতি

জার্মানি কর্তৃক বিমান-বাহিনী গঠনের প্রকাশ্য ঘোষণা, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের নীতি গ্রহণ

জার্মানি কর্তৃক এককভাবে ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি এইভাবে লঙ্ঘন করায় যে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে স্ট্রেসা (Stressa) নামক স্থানে এক সম্মেলনে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত হইয়া জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি লঙ্ঘনের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার পর জেনিভায় এক সম্মেলনে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ জার্মানি ভার্সাই শান্তি-চুক্তি, লোকার্ণো চুক্তিসমূহ প্রভৃতির শর্তানুসারে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পালন না করিয়া সেগুলি ভঙ্গ করিয়াছে, এই ঘোষণা করিল। কিন্তু তাহাতে হিট্‌লার কর্তৃক অনুসৃত নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

স্ট্রেসা সম্মেলন, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক জার্মানির শান্তি-চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা

এমতাবস্থায় হিট্‌লার ঘোষণা করিলেন যে, রাশিয়া ও ফ্রান্স সামরিক নিরাপত্তার

চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করিয়াছিল, সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানি কর্তৃক লোকার্ণো চুক্তি বা ভার্সাই চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করা অন্যায় ছিল না। কারণ, প্রথম ফ্রান্স ও রাশিয়া-ই এই অপরাধে অপরাধী ছিল।

হিট্লারের যুক্তি

জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভীতসন্ত্রস্ত গ্রেট্ ব্রিটেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির সহিত এক নৌ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জার্মানিকে ব্রিটেনের সহিত ৩৫ : ৬৫ শতাংশ ভিত্তিতে নৌবহর গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। পরিস্থিতি বিবেচনায় জার্মানির সহিত আপস-মীমাংসার পথ অনুসরণ করিয়া চলা-ই শ্রেয় এই কথাই ব্রিটেন মনে করিয়াছিল। এই নৌ-চুক্তির ফলে স্ট্রেসা সম্মেলনে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে ঐকমত্য সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি

পরবৎসর (১৯৩৬) ৭ই মার্চ হিট্লার ইওরোপীয় রাষ্ট্র প্রতিনিধিবর্গকে জানাইলেন যে, জার্মান সেনাবাহিনী রাইনল্যাণ্ডের অ-সামরিকীকৃত (Demilitarised) অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই হিট্লার রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাইনল্যাণ্ডে সেনাবাহিনী প্রেরণের প্রতিক্রিয়া হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে হিট্লার ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক আক্রমণ নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে এবং পূর্ব-ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে ও কতকগুলি শর্ত পূরণ করিলে লীগ অব-ন্যাশন্স্-এ পুনরায় যোগদান করিতে রাজী আছেন। লীগ-অব-ন্যাশন্স্ হিট্লারকে এককভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পক্ষান্তরে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে হিট্লার রাজী আছেন এই ঘোষণায় গ্রেট্ ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির প্রতি কতকটা নম্রভাব ধারণ করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্স্ও জার্মানিকে চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। বিষয়টি লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন কিছু-ই

হিট্লার কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড দখল

জার্মানি কর্তৃক চুক্তি-ভঙ্গের অন্যতম কারণ ইওরোপীয় দেশ-সমূহের দুর্বলতা ও পরোক্ষ সমর্থন

করা হইল না। সুতরাং হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি, লোকার্ণো চুক্তি, কেলগ্‌ চুক্তি এবং পরে অষ্ট্রিয়া দখল করিয়া সেণ্ট্‌ জার্মেইনের চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিবার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষ সমর্থন।

হিট্‌লারের অধীন জার্মানির উত্থান ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন (Rise of Germany under Hitler : Change in the European Balance of Power) : ভার্সাই শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জার্মান জাতির মধ্যে যেমন ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হইয়াছিল তেমনি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির প্রতিহিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। এই পরিস্থিতিই হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির চরম শাস্তিমূলক শর্তাদি

ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির ফলে জার্মান জাতির মনে প্রতিক্রিয়া

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির উপর বলপূর্বক চাপাইয়া দিয়াছিল, এই ধারণা সেই সময় হইতেই জার্মান জাতির মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। জার্মানির পরাজয়ের সুযোগ লইয়া জার্মানির প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল তাহা জার্মান জাতি কেন, ইওরোপের অপরাপর দেশের জনসাধারণের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।

সেণ্ট্‌ জার্মেইন চুক্তির প্রভাব

ইহা ভিন্ন সেণ্ট্‌ জার্মেইনের চুক্তি দ্বারা মিত্রশক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়ার উপর যে অর্থনৈতিক চাপ দিয়াছিল এবং দীর্ঘকালের সংযুক্তি আন্দোলন Anschluss যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিল তাহাও জার্মান জাতির মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতি স্বভাবতই হিট্‌লারের উত্থান সহজ করিয়া দিয়াছিল এবং হিট্‌লার সেই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে ত্রুটি করেন নাই। এই

হিট্‌লার ও নাৎসি দলের উদ্দেশ্য

পরিস্থিতি ও জার্মান জাতির মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হিট্‌লার ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ও সেণ্ট্‌ জার্মেইনের শান্তি-চুক্তি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব এবং তাঁহার ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট্‌ পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার

উদ্দেশ্যেই হিট্লার ও ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট্ তথা নাৎসি দলের কর্মপন্থা স্থির করিয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানিতে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল উহার উপর ক্ষতিপূরণের বিশাল অঙ্ক চাপাইবার ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরম সঙ্কটপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। হিট্লার ও নাৎসি দলের পক্ষে এই অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করা এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করা স্বভাবতই সহজ ছিল। এই পরিস্থিতিতে নাৎসি দলের মতবাদ ও কর্মপন্থার জনসমর্থন সহজেই পাওয়া সম্ভব হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসি দলের জনপ্রিয়তা যে কি পরিমাণ তাহা প্রমাণিত হইল নাৎসি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে। এমতাবস্থায় জার্মান প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিট্লারকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করিলেন। অল্পকালের মধ্যে হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে প্রতিনিধি সভা রাইক্স্টাগের (Reichstag) অনুমোদনক্রমে হিট্লার প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলর—উভয়পদই একা গ্রহণ করিলেন। শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ক্ষমতাও রাইক্স্টাগ হিট্লারের উপর ন্যস্ত করিল।

হিট্লারের একক অধিনায়কত্ব পদ লাভ

এইভাবে আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে একক অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিট্লার ভার্সাই ও সেণ্ট্ জার্মেইনের চুক্তি ভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশের খাদ্যদ্রব্য, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, রসদ ইত্যাদি, পেট্রোল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী সবকিছুই প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কোন দিকেই কোন ত্রুটি হইল না। এইভাবে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন

হিট্লারের অধীন জার্মানির দ্রুত উত্থান ইওরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে তিনি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দিলেন যে, জার্মানির ভার্সাই এবং সেণ্ট্ জার্মেইনের শর্তাদি মানিবে না। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

হিট্লারের উত্থানে ইওরোপীয় দেশসমূহের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

জেনিভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে জার্মানির অপসরণ এই নীতিরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল।

হিট্‌লারের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নীতি তথা ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির স্ট্রেসা সম্মেলনে সমবেত হইয়া হিট্‌লারের আন্তর্জাতিক চুক্তি এককভাবে অমান্য করিবার তীব্র নিন্দায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অল্পকালের মধ্যে জেনিভায় অনুষ্ঠিত লীগ অব-ন্যাশন্‌সের অধিবেশনে জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই ও লোকার্ণো চুক্তিসমূহ লঙ্ঘনের প্রতিবাদও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে জার্মানির উত্থানে যে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল উহা প্রমাণিত হয়। এদিকে ইতিমধ্যে ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত এক সামরিক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জার্মানির উত্থানে ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য যে পরিবর্তিত হইয়াছিল উহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অবশ্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় হিট্‌লার রাইনল্যাণ্ডে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবার যুক্তি ও অজুহাত পাইয়াছিলেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে এই অজুহাতে হিট্‌লার রাইনল্যাণ্ডের অসামরিকীকৃত অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড অধিকার

হিট্‌লারের উত্থান ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য কিরূপ বিনষ্ট করিয়াছিল তাহা গ্রেট্ ব্রিটেনের ভীতি হইতেই অনুমান করা যায়। জার্মানির সহিত আপস-মীমাংসা-ই সেই পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ পন্থা একথা বিবেচনা করিয়া ব্রিটেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডন শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে জার্মানিকে ব্রিটেনের সহিত ৩৫ : ৬৫ অনুপাতে নৌ-বহর গঠনের অধিকার দানে স্বীকৃত হইয়াছিল। স্ট্রেসা সম্মেলনে যে ঐক্যবদ্ধভাবে হিট্‌লারের বিরোধিতার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা ব্রিটেনের নৌ চুক্তির ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল। ফলে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নতা জার্মানিকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল।

ব্রিটেনের সহিত নৌ-চুক্তি

জার্মানির উত্থানে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য যে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং জার্মানির সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার আগ্রহ যে ইওরোপীয় দেশসমূহে দেখা গিয়াছিল

জার্মানির সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ

তাহা হিট্লার কর্তৃক ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত পঁচিশ বৎসরের অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের জার্মানির প্রতি নম্র নীতি অবলম্বনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং হিট্লারের অধীন জার্মানি যে ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনাশ করিয়া নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল তাহা ইওরোপীয় দেশসমূহের ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইতালির মুসোলিনি কর্তৃক জার্মানির সহিত মিত্রতা এবং জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষ অবলম্বন এবং জাপানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া এক অক্ষ-শক্তি-জোট সৃষ্টি করিবার ফলে জার্মানি

ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট

ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য বিনাশ করিয়া জার্মানিকে নিয়ন্তার পদে স্থাপন করিয়াছিল। ইহার পর হিট্লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, সুদেতেন অঞ্চল অধিকার, চেকোস্লোভাকিয়া দখল এবং পক্ষান্তরে ইওরোপীয় দেশসমূহের নিষ্ক্রিয়তা, জার্মান-তোষণ-নীতি প্রভৃতি ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য যে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে।

রোম বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গ (Rome-Berlin-Tokyo Axis) : ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকারের (১৯৩৬) পূর্বাবধি গ্রেট্ ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মৈত্রী হিট্লারের অস্ট্রীয়-নীতির ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এই মৈত্রী নাশ করিলে অস্ট্রিয়ার উপর জার্মান প্রভাব বিস্তারের যেমন সুযোগ বৃদ্ধি পাইল, তেমনি ইতালি-জার্মানি মিত্রতার পথও উন্মুক্ত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়া নিজেকে একটি 'জার্মান রাজ্য' (German State) বলিয়া স্বীকার

ইতালি ও জার্মানির মধ্যে মিত্রতার পটভূমিকা

করিল এবং জার্মানি অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া এবং অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত একটি পরস্পর মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এদিকে আবিসিনিয়া অধিকারে ব্যস্ত থাকার ফলে ইতালি অস্ট্রিয়ার উপর নিজ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে আর তেমন আগ্রহান্বিত হইল না। ইতালি অস্ট্রিয়ায় নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসে আপত্তি না করিবার ফলে

জার্মানির পক্ষে অষ্ট্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইতালি ও জার্মানির পরস্পর বৈরীভাব দূরীভূত হইয়া উভয়ের মধ্যে মিত্রতার পথ উন্মুক্ত হইল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও ও স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় অপরাপর দেশ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করিল। কিন্তু এই সমর্থন বাস্তব সাহায্যে রূপান্তরিত হইল না। মুসোলিনি অবশ্য প্রকাশ্যভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। হিট্‌লারও এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তাঁহার নবগঠিত বিমান বাহিনীর (Luftwaffe) যুদ্ধ-দক্ষতা এবং নূতন নূতন মারণাস্ত্রের শক্তি পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। স্পেনের অন্ত-র্যুদ্ধ সেই পরীক্ষার সুযোগ দান করিলে হিট্‌লার মুসোলিনির সহিত যুগ্মভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। উদারনৈতিক ইওরোপীয় দেশসমূহ একক অধিনায়কত্বের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহাও এই স্পেনীয় অন্ত-র্যুদ্ধে যাচাই করা যাইবে ইহাও হিট্‌লারকে মুসোলিনির সহিত যুগ্মভাবে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে ইতালি-জার্মানি মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিট্‌লার ইতালির সহিত 'অক্টোবর প্রোটোকোল' (October Protocol) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর দুই দেশের সৌহার্দ্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে হিট্‌লার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী (Anti-Comintern) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া সাম্যবাদীদের অর্থাৎ কমিউনিস্ট্‌দের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং রাশিয়ার সহিত কোনপ্রকার চুক্তিবদ্ধ না হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর বৎসর (১৯৩৭, নভেম্বর) ইতালি ও জার্মানির মধ্যে একটি কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইল। এইভাবে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর মিত্রতা স্থাপিত হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো (Franco)-ও হিট্‌লারের পক্ষে যোগদান করিলেন। এই শক্তিজোটের বিপক্ষে তখন ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া।

অক্টোবর প্রোটোকোল

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের মিত্রতা

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানির সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইলে জার্মানির সামরিক শক্তিশকট যথেচ্ছভাবে চালনার কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সামরিক অধিনায়ক মাত্রেই হিট্‌লারের প্রাধান্যধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার

ইচ্ছামত রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসরণেও কোন বাধা রহিল না। ঐ বৎসরই (১৯৩৮ খ্রীঃ) হিট্লারের ইঙ্গিত ও প্ররোচনায় অষ্ট্রিয়ায় নাৎসি দল এক দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে হিট্লার অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর স্থচ্নিগ্ (Schuchnigg)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিট্লারের চাপে স্থচ্নিগ্ নাৎসি দলভুক্ত অষ্ট্রিয়াবাসীদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থচ্নিগ্ হিট্লারের প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও অষ্ট্রিয়া শেষপর্যন্ত জার্মানির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অল্পকালের মধ্যেই হিট্লার সৈন্য প্রেরণ করিয়া বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়া স্পেনীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে অগ্রসর না হইবার ফলে এই সকল শক্তির পক্ষে জার্মানিকে বাধা দিবার শক্তি বা আগ্রহ তেমন নাই একথাই হিট্লার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি ভার্সাই-চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অষ্ট্রিয়া দখল করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিট্লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

হিট্লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল

অষ্ট্রিয়ার পর আসিল চেকোস্লোভাকিয়ার পালা। চেকোস্লোভাকিয়ার স্থদেতেন অঞ্চল ছিল জার্মান জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল। হিট্লার ঐ অঞ্চলে তাঁহার 'পঞ্চম বাহিনী' (fifth column) অর্থাৎ অর্থভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানির সহিত সংযুক্তির সপক্ষে এক তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করাইলেন। এই আন্দোলনের অজুহাতে হিট্লার জার্মানির সহিত স্থদেতেন অঞ্চলের (Sudeten Land) সংযুক্তি দাবি করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি আরও দুইদিক হইতে আসিল। দানিউব নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দশলক্ষ ম্যাগিয়ার হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্তি দাবি করিল। পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে টেশেন (Teschen) দাবি করিয়া বসিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে চেকোস্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা দেখা দিল। হিট্লার চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি উপলব্ধি করিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার সীমায় সৈন্য সমাবেশ শুরু করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার এই জাতীয় বিপদে রাশিয়া ও ফ্রান্সের শরণাপন্ন হইলেন। এই দুই দেশ চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানে রাজী হইলে এক বিরাট ইওরোপীয় যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল

হিট্লারের স্থদেতেন অঞ্চল দাবি

চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) আসন্ন যুদ্ধ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মিউনিক (Munich) নামক স্থানে হিট্‌লারের সহিত আপস মীমাংসার প্রস্তাব আলোচনা করিলেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মসিয়ে দালাদিয়ার (Daladiar) তাঁহার সহিত এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে আসিলেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়া সরকারকে জার্মানির নিকট সুদেতেন অঞ্চল হস্তান্তর করিতে চাপ দিলে চেকোস্লোভাকিয়া সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন।* ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দুর্বলতাজনিত জার্মান-তোষণ নীতি হিট্‌লারের দাবি ও ঔদ্ধত্য আরও বাড়াইয়া দিল। হিট্‌লার এখন কেবলমাত্র সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না, তিনি সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়াই অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স বাধ্য হইয়াই স্থির করিল যে, হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা চেকো-স্লোভাকিয়াকে সামরিক সাহায্য দান করিবে। চেম্বারলেন ইংলণ্ডের সামরিক দুর্বলতার কথা জানিতেন। তিনি এবিষয়ে মধ্যস্থতার জন্য মুসোলিনির নিকট আবেদন জানাইলে মুসোলিনির চেষ্টায় মিউনিক শহরে হিট্‌লার, চেম্বারলেন, দালাদিয়ার ও মুসোলিনির এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কোন প্রতিনিধিকে ইহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। চেম্বারলেন, দালাদিয়ার, মুসোলিনি প্রভৃতির অনুরোধে হিট্‌লার কেবলমাত্র সুদেতেন অঞ্চল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই আপস-মীমাংসা 'মিউনিক চুক্তি' (Munich Pact) নামক একটি দলিলে সন্নিবিষ্ট হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসহ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দেশ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি-প্রচেষ্টা

ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের জার্মান-তোষণ-নীতি

মুসোলিনির মধ্যস্থতা

---

* "This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary surgical operation." Carr, p. 270.

চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেশেন দাবি এবং হাঙ্গেরী কর্তৃক ম্যাগিয়ার অধ্যুষিত অঞ্চলটির উপর দাবি চেকোস্লোভাকিয়াকে মানিতে হইল। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার এক বিশাল অঞ্চল জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী কর্তৃক অধিকৃত হইল।

মিউনিক চুক্তি (Munich Pact, 1938)

মিউনিক চুক্তি ইঙ্গ-ফরাসী তথা ইওরোপের কূটনৈতিক পরাজয় ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এই চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে ইওরোপীয় যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইলেও চেকোস্লোভিয়াকে জার্মানির গ্রাস হইতে রক্ষা করা বা দীর্ঘকাল ইওরোপকে যুদ্ধ-মুক্ত রাখা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর সাময়িক কালের জন্য ইওরোপে যে শান্তি বজায় ছিল সেই সুযোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময় পাইয়াছিল—ইহাই হইল মিউনিক চুক্তির সপক্ষে একমাত্র যুক্তি। বস্তুত, ইহা হিট্‌লার-তোষণ-নীতির এক অতি লজ্জাকর উদাহরণ।

ইঙ্গ-ফরাসী তথা ইওরোপীয় কূটনৈতিক পরাজয়

মিউনিক চুক্তি মানিয়া চলা হিট্‌লারের ইচ্ছা ছিল না। চেকোস্লোভাকিয়ার শাসনাধীন জার্মান জাতির অবশিষ্ট প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের নিরাপত্তার অজুহাতে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হ্যাচা (Hacha)-কে এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। এই বৈঠকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া হিট্‌লার হ্যাচাকে চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া নামক দুইটি প্রদেশ জার্মানির সংরক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানির কবলে আসিল।

হিট্‌লার-হ্যাচা বৈঠক

জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া কবলিত

ইহার পর চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লার লিথুয়ানিয়াকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মেমেল (Memel) বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডানজিগ্ (Danzig) বন্দরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাংশের সহিত সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একখণ্ড সংযোগপথও (corridor) দাবি করিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড হইতে 'ডানজিগ্' বন্দর ও সংযোগ পথ দাবি

হিট্‌লারের মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করা এবং অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হইল না। অচিরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিট্‌লার-তোষণ-নীতি পরিত্যাগে বাধ্য হইল। ডানজিগ্ ও সংযোগ পথ দখল করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে

ফ্রান্স ও ব্রিটেন কর্তৃক পোল্যাণ্ডকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান

স্থির হইল। ইহা ভিন্ন রাশিয়াকেও দলে টানিবার চেষ্টা চলিল। এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হিট্‌লার-তোষণ-নীতি এবং জার্মানির কমিউনিস্ট্-বিরোধী কার্যকলাপ ও প্রচারকার্য রাশিয়ার ভীতি সৃষ্টি করিল। জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া, 'সুদেতেন ল্যাণ্ড', ক্রমে সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস, পক্ষান্তরে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি কর্তৃক মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর রাশিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া চলিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ রাশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (Russo-German Non-Aggression Pact, 1939)

সম্পর্কে মোটেই মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন, বরঞ্চ কমিউনিস্ট্-বিরোধী জার্মানির রাশিয়ার প্রতি শত্রুতা তাঁহাদের অনভিপ্রেত নহে, এই সব বিবেচনা করিয়া রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিত একটি অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে প্রস্তাব করিল। জার্মানিও রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণের সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে উপলব্ধি করিয়া রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

আগ্রহান্বিত হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৪শে তারিখ রাশিয়া ও জার্মানি পরস্পর অনাক্রমণ ও তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরপেক্ষতার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। কয়েকদিন পরই (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্যাসিস্ট ইতালির অভ্যুত্থান : ফ্যাসিস্ট পররাষ্ট্র সম্পর্ক
(Rise of Fascist Italy : Fascist Foreign Relations)

যুদ্ধোত্তর ইতালি : ফ্যাসিজম্-এর উদ্ভব (Post-war Italy : Rise of Fascism) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির জাতীয়তা-বিরোধী শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক একতা লাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা ইতালির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয়দিগের জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিল। জাতীয় মর্যাদা বা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কিছুই ইতালীয় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা যেমন ছিল স্ব স্ব প্রধান তেমনি ছিল হুজুগপ্রিয়। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষে যেসকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির কিছুই তাহাদের ছিল না। জাতির এই ধরনের অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফল মিলিত হইলে ইতালিতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যে স্বার্থনাশ হইয়াছিল এবং যে পরিমাণ তাহাকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সেই তুলনায় প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালি অতি সামান্য মাত্রই ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত লণ্ডন চুক্তিতে প্রতিশ্রুত স্থানসমূহ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। ফলে, প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালিবাসীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এই ধারণা ইতালিবাসীদের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তন সাধন ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইতালি-বাসীদের মনোভাব যখন এইরূপ সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমস্যা-প্রসূত

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ইতালিতে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের অভাব

ইতালির অসন্তুষ্টি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির সাহায্যের বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর ক্ষতি-পূরণ

অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা দেশের সর্বত্র এক দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য জিনিস-পত্রের অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধিতে মজুরদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিলে মজুরী বৃদ্ধিকল্পে তাহারা ধর্মঘট শুরু করিল। এমতাবস্থায় সাম্যবাদী প্রচারকার্য স্বভাবতই উৎসাহিত হইল। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের উপর শ্রেণীবৈষম্যহীন, জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার মত উদারপন্থী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ এক সম্মোহিনী শক্তির ন্যায় কাজ করিল। ফলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, রাশিয়ার ন্যায় ইতালিও উগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ সাম্যবাদী দেশে পরিণত হইবে এই আশঙ্কা সকলের মনেই জাগিল। 'রাজতন্ত্রের পতন হউক' (Down with the King), 'লেনিন দীর্ঘজীবী হউন' (Long live Lenin) প্রভৃতি ধ্বনি ইতালির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক দুর্দশা—সাম্যবাদী প্রচার-কার্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত

বিপ্লবী পন্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ ইতালির সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকগণ জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কৃষকেরা দখল করিয়া লইল। শহর এলাকায় শিল্পপতিগণ মজুরী হ্রাস না হইলে এবং শ্রমিকরা অধিক সময় কাজ না করিলে কারখানা চালু রাখা অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তেই গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিক ও কৃষকরা তাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা কারখানা বা জমি দখল করা গেলেও সেগুলি পরিচালনা করা তত সহজ নয়। অনভিজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকগণ ক্রমেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষক-মজদুর সরকার স্থাপন ও পরিচালন তেমন সহজ হইবে না। প্রচলিত পার্লামেণ্টারী প্রথা যেমন দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজদুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অনুরূপ অক্ষম হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া ইতালিবাসীরা পুনরায় একটি কার্যকরী সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সমাজ ও যুব সমাজ ইতালির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সরকারের আমূল পরিবর্তনের

কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন

কৃষক-মজদুরদের অকৃতকার্যতা

সরকারের প্রতি শিক্ষিত ও যুব-সমাজের অশ্রদ্ধা

পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নূতন কোন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) দলের উত্থান অতি সহজ হইল। ফলে, জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং শাসনব্যবস্থায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুসোলিনি।)

মুসোলিনির নেতৃত্ব

(১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি যুদ্ধাবসানে কর্মচ্যুত সৈনিকদের ও দেশের মঙ্গলার্থী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে সমবেত ব্যক্তি-বর্গ এক বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সর্বসম্মতিক্রমে সমাজের প্রতি স্তর হইতে সংখ্যানুপাতে দেশের সকল প্রতিনিধি সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ, শ্রমিকদের দৈনিক আটঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর স্থাপন, মূল-ধনীদের উপর কর স্থাপন, ধর্মাধিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, উর্ধ্ব কক্ষ সেনেট-এর বিলোপ সাধন, জাতীয় সভা আহ্বান, গোলা-বারুদ তথা অস্ত্রশস্ত্রের কারখানাগুলির জাতীয়করণ, রেলপথ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের পরিচালনাধীনে স্থাপন প্রভৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরি-কল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈনিকদের জন্যই প্রচার করা হইতে লাগিল। মুসোলিনি যে সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন উহার অধিকাংশ সভ্যই Fasci'd azione নামে এক সংঘের সহিত জড়িত ছিল। এই সংঘের নাম হইতে ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।)

ফ্যাসিষ্ট্ আন্দোলনের সূচনা

ফ্যাসিষ্ট্ দলের উৎপত্তি

মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালির শাসনব্যবস্থা তখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নিজ হইতেই গ্রহণ করিল। যেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা বা গোলযোগ দেখা দিল সেখানেই ফ্যাসিস্ট্ দল বলপূর্বক তাহা দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ বিপ্লব-বিরোধী ফ্যাসিস্ট্‌গণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্‌দিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুদ্ধ এই সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট্ দলের সহিত ফ্যাসিষ্ট্‌দের বিরোধ

যুদ্ধোত্তর ইতালির শাসনভার ছিল প্রথমে মন্ত্রী নিটি (Nitti) এবং পরে মন্ত্রী গিওলিটি (Giolitti)-এর অধীনে। কিন্তু ইহারা কেহই দেশের অরাজকতা দমন করিতে সমর্থ হন নাই। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের যুদ্ধোত্তর দুর্দশারও কোন উপশম করিতে তাঁহারা পারেন নাই। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্‌দল দেশে শান্তি-ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্‌দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করিলে সরকার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিটি ও গিওলিটির মন্ত্রিত্ব

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট্‌দল সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ করিত এবং কাল পোশাক (Black shirt) পরিত। সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ তাহা-দিগকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্‌দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ফ্যাসিস্ট্‌দলই জয়লাভ করিল। এইভাবে ফ্যাসিস্ট্‌দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ফ্যাসিস্ট্‌দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এদিকে ইতালীয় সরকারের দুর্বলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু মুসোলিনি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। কারণ, তিনি এইভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ইতালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্‌ বাহিনীর সাহায্যে রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। এইজন্য তিনি মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন।

মুসোলিনির 'Coup d' etat'

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনি তাঁহার ফ্যাসিস্ট্‌ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ইতালির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে মুসোলিনিই ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার উপাধি হইল দুচে (Duce), রাজা স্বভাবতই ক্রমে নেপথ্যে সরিয়া গেলেন।

ফ্যাসিস্ট্‌দলের ক্ষমতা লাভ

ফ্যাসিস্ট্‌দলের শাসনক্ষমতা লাভের পশ্চাতে জনমতের সক্রিয় সহায়তা না

থাকিলেও, জনমত উহার বিরোধী ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট্-দল জনস্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং মুসোলিনি যখন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন ইতালীবাসীর সমর্থন যে তাঁহার পশ্চাতে ছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।*

জনমতের সমর্থন

মুসোলিনির ঘোষণা হইতেই ফ্যাসিস্ট্ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন যে, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদাবৃদ্ধিই হইবে ফ্যাসিস্ট্ শাসনের মূল উদ্দেশ্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিক মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তি রাষ্ট্রের তথা সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার্থ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইবে। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবশ্য স্বীকৃত হইবে। শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না। এই কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রের পরিদর্শনাধীনে থাকিবে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা Laissez faire নীতি স্বভাবতই আর রহিল না। ধর্মের ক্ষেত্রেও মুসোলিনি ঐক্যনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্দলের উদ্দেশ্য ছিল ইতালির মর্যাদা অর্জন এবং প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ।

ফ্যাসিবাদ তথা মুসোলিনির উদ্দেশ্য ও নীতি: আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ ও প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ

ইতালির পররাষ্ট্র সম্পর্ক: ইতালি ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ: (Italian Foreign Relations: Italy & South-Eastern Europe):

প্যারিসের শান্তি-চুক্তি ইতালির ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল তাহার উপযুক্ত গুরুত্ব বা মূল্য দেয়

*"It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had not enjoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant section of public opinion." Riker, p. 757.

নাই, এই ধারণা ইতালিবাসীর এক গভীর অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত লণ্ডন চুক্তি অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদানের বিনিময়ে ইতালিকে দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট্, ইষ্ট্রিয়া প্রভৃতি আড্রিয়াটিক অঞ্চলের স্থানসমূহ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এই চুক্তির তৃতীয় শর্তের* দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে, আফ্রিকা মহাদেশে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিলে ইতালির আফ্রিকাস্থ উপনিবেশের এবং গ্রেট্ ব্রিটেন বা ফ্রান্সের উপনিবেশের সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে যাহাতে ইতালির স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয় এবং ইতালি উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করে।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট্ ও ইষ্ট্রিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল ইতালীয়দের হইতে ভিন্ন জাতির লোক। উইলসনীয়-নীতি অনুসারে সংখ্যালঘু ইতালীয় জাতির লোক-অধ্যুষিত অঞ্চল ইতালির সহিত সংযুক্ত হওয়া অবৈধ ছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ লণ্ডনের গোপন চুক্তি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল বলিয়া উহা সমর্থন করিতে বাধ্য হইল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, ইতালি দক্ষিণ-টাইরল লাভ করিবে। কিন্তু ইতালি একদিকে লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে টাইরল, ট্রিয়েস্ট্ প্রভৃতি স্থানগুলিতে ইতালীয়গণ সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও অধিকার করিতে চাহিল, অপরদিকে উইলসনের জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া যুগোস্লাভিয়া হইতে 'ফাইউম্' (Fium) নামক স্থানটিও দাবি করিল। কারণ, সেইস্থানে ইতালীয় জাতির লোক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এইভাবে একই সময়ে উইলসনীয়-নীতির বিরোধিতা ও সমর্থন দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে

ইতালি ও প্যারিসের চুক্তি

ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার বিরোধ

* "In the event of Great Britain and France increasing their colonial territories in Africa at the expense of Germany, Italy should obtain equitable compensation by a favourable adjustment of the forntiers between her existing African colonies and the contiguous colonies of Great Britain and France." Vide : Carr, p. 70.

সমবেত রাজনীতিকগণ বরদাস্ত করিলেন না। কারণ, ফাইউম্ ছিল যুগোস্লাভিয়ার একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া এই শহরটি ইতালির অধীনে স্থাপিত হওয়া যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ফলে, প্যারিস সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ, বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট উইলসন্ ইতালির দাবির বিরোধিতা করিলেন। ফাইউম্-এর উপর ইতালির দাবি প্রত্যাখ্যাত হইল।

ইতালি কর্তৃক ফাইউম্ দাবি—প্যারিস-সম্মেলন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

এইরূপ পরিস্থিতিতে ইতালীয় সরকারের ইঙ্গিতে ডি' এ্যানুন্‌জিও (D' Annunzio) নামে জনৈক অবাস্তব ইতালীয় কবি একদল বেসরকারী সৈন্য লইয়া ফাইউম্ শহরটি দখল করিলেন। মিত্রশক্তি যুগোস্লাভিয়া ও ইতালি ফাইউম্-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিজেরাই মিটাইয়া লইবে এই মনে করিয়া আর কোন কিছু এবিষয়ে করিতে চাহিল না। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে ফাইউম্ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল। অবশেষে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির চাপে পড়িয়া যুগোস্লাভিয়া এক চুক্তি দ্বারা (২৭শে জানুয়ারি, ১৯২৪) ফাইউম্ অঞ্চল ইতালির সহিত ভাগ করিয়া লইল। আর ফাইউম্ শহরটি যুগোস্লাভিয়া ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল। মুসোলিনি ফাইউম্ নিকটস্থ ব্যারোস নামক বন্দরটি যুগোস্লাভিয়াকে ফিরাইয়া দিলেন। ফাইউম্-এর বন্দরের মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়াকে বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগও দেওয়া হইল। এইভাবে দীর্ঘকালের বিবাদের মীমাংসা হইলে ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। পর বৎসর (১৯২৫ খ্রীঃ) অপর একটি চুক্তিপত্রের দ্বারা—নেটিউনো চুক্তিপত্র (Nettuno Convention)—উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল।

ইতালি কর্তৃক ফাইউম্ দখল

ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার চুক্তি (১৯২৪)

ফ্যাসিস্ট্ নেতা মুসোলিনির অধীনে ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব তথা পূর্ব-ইওরোপে (Eastern Europe) রাজ্য গ্রাস এবং সেই অঞ্চলে ইতালির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন। এই নীতি অনুসরণের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, পশ্চিম-ইওরোপের জাতীয়তার ভিত্তিতে সুগঠিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ইতালির রাজ্যগ্রাস নীতি কার্যকরী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অথচ পূর্ব-ইওরোপে নবগঠিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে এই নীতি সাফল্যলাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। যুগোস্লাভিয়ার

দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে ইতালীয় বিস্তার-নীতি

প্রতি অনুসৃত নীতিও এই মূল নীতিরই অনুসরণ মাত্র। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কতকটা সৌহার্দ্য স্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই মুসোলিনির আলবানিয়া নীতি সেই সৌহার্দ্য বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে ইতালিতে 'ভেলোনা' বন্দরটি (Velona Port) এবং আলবানিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণে অধিকার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলবানিয়ার উপর বা ভেলোনা বন্দরের উপর ইতালির অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। উপরন্তু আলবানিয়াকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইতালির বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই এই ধারণা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্মিয়াছিল। ফলে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান লীগ কাউন্সিল দ্বারা প্রস্তাব পাস করাইয়া লইল যে, কোন শত্রুশক্তিদ্বারা আক্রান্ত হইলে আলবানিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব ইতালি গ্রহণ করিবে। মিত্রশক্তিবর্গ ইতালিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে আলবানিয়ার উপর ইতালির প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। ইতালির এই কূটচাল যুগোস্লাভিয়ার গভীর সন্দেহ ও ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নেটিউনো চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্কের কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু মুসোলিনির আক্রমণাত্মক নীতি এই সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দিল না। যে-কোনপ্রকারে আলবানিয়া কুক্ষিগত করা-ই ছিল ইতালির উদ্দেশ্য। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও আলবানিয়ার মধ্যে টিরানা চুক্তি (Treaty of Tirana) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। তদুপরি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি লীগ কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করিল যে, যুগোস্লাভিয়া আলবানিয়া অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বৎসরই আলবানিয়ার জনৈক মন্ত্রীকে ইতালির অর্থভোগী একজন আলবানিয়াবাসী হত্যা করিলে মুসোলিনি যে-কোন উপায়ে আলবানিয়া গ্রাস করিতে এবং পরে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে ব্যগ্র একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। (এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ইতালি আলবানিয়া অধিকার করিয়াছিল)। এদিকে বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সংযুক্তির চেষ্টা চলিতেছিল। মুসোলিনির ইঙ্গিতে বুলগেরিয়ায়

ইতালি-আলবানিয়া সমস্যা

ইতালি-যুগোস্লাভিয়া পরস্পর সম্পর্কের অবনতি

যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু হইলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ঐ বৎসরই (১৯২৭) ইতালি ও হাঙ্গেরীর মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য এবং পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটমাট করিবার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে এবং মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্ ইতালি কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে আধিপত্য-বিস্তার-নীতি যুগোস্লাভিয়ার সমূহ বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যুগোস্লাভিয়াকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিবার উদ্দেশ্যেই ইতালি উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, এই ধারণা যুগোস্লাভিয়াবাসীদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ইতালি কর্তৃক যুগোস্লাভিয়াকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া সরকার যখন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত নেটিউনো চুক্তিপত্র (Nettuno Convention) আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিবেন কিনা বিবেচনা করিতেছেন সেই সময়ে যুগোস্লাভিয়ায় এক ব্যাপক ইতালি-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইলে যুগোস্লাভিয়া ও ইতালির পরস্পর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিল।

ইতালির সহিত দ্বন্দ্বে যুগোস্লাভিয়ার সাফল্য লাভ অসম্ভব একথা যুগোস্লাভিয়াবাসী তথা যুগোস্লাভিয়া সরকার ভালভাবেই জানিত। এজন্য যুগোস্লাভিয়া ইতালির সহিত মিত্রতা-নীতি অনুসরণে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ইতালির আক্রমণাত্মক নীতি সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত যুগোস্লাভিয়া মিত্রতাবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার কালেও ইতালিকে সেই মিত্রতাচুক্তিতে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইতালি যুগোস্লাভিয়ার সহিত কোনপ্রকার মিত্রতার পক্ষপাতী ছিল না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে নাৎসি নেতা হিট্লারের অভ্যুত্থান ও তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতির প্রকাশ্য বিশ্লেষণ অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বলকান অঞ্চল এমনকি ইতালিতেও ভীতির সঞ্চার করিল। ইতালি ও অষ্ট্রিয়া পরস্পর বিরোধিতা ভুলিয়া মিত্রতা নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। অষ্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিল। ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতার স্থলে মিত্রতা নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। হাঙ্গেরী ও ইতালি পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইতে বিলম্ব করিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বলকান অঞ্চলে পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিসম্বলিত এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিল (১৯৩৪)। এই

যুগোস্লাভিয়া কর্তৃক ইতালির প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণের চেষ্টা

হিট্লারের অভ্যুত্থান —ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্কের অবনতি

চুক্তি যুগোস্লাভিয়ার ইতালি ভীতি কতক পরিমাণে দূরীভূত করিল বটে, কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যে অক্টোবরে (১৯৩৪ খ্রীঃ) ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বার্থুকে ও যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার মার্সাই (Marsseilles) বন্দরে আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলে যুগোস্লাভিয়াবাসী এই হত্যাকাণ্ড ইতালির ইঙ্গিতেই ঘটিয়াছে সন্দেহ করিল। এই বিষয়টি লীগ কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য যুগোস্লাভ সরকার প্রস্তুত হইলে ফরাসী সরকারের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত উহা আর করা হইল না। ইতালির মিত্রতানাশের আশঙ্কা হইতেই ফরাসী সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য। ইতালি ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক এইভাবে অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক এইরূপ তিক্ত ছিল।

মার্সাই হত্যাকাণ্ড

ফ্যাসিস্ট্ নেতা মুসোলিনি আড্রিয়াটিক সাগরের উপর ইতালির প্রাধান্য বিস্তার, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থবৃদ্ধি করিতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা উপরি-উক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত যুগ্মভাবে মরক্কোর পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত ট্যাঞ্জিয়ার শহরের উপর আন্তর্জাতিক সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত নৌ-সম্মেলনে (Naval Conference, 1930) ফ্রান্সের সহিত সামরিক সমতা লাভের দাবি উত্থাপন ও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদির পরিবর্তন দাবি প্রভৃতি এবং সাইরেনেইকা ও মিশরের মধ্যে সীমা-নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে উহা ইতালির সপক্ষে মীমাংসিত হওয়া ইতালির আন্তর্জাতিক মর্যাদার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ইতালির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

ইতালি ও ফ্রান্স (Italy & France): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছিল। এই কারণে বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাহ দিতেন। এদিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং প্রধানত জীবিকা অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে

ইতালি ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের কারণ:

লাগিল। ফরাসী সরকার এই সকল ইতালীয়কে ফরাসী নাগরিকত্ব দান করিয়া ইতালিবাসীকে ফ্রান্সে চলিয়া আসিতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের লোকক্ষয় এইভাবে পূরণ করিবার ইচ্ছাও ফরাসী সরকারের ছিল। এই বিষয় লইয়া ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ফরাসী সরকার কর্তৃক ইতালিবাসীদের ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণে উৎসাহ দান

কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির মনোমালিন্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইতালির স্বার্থের উপেক্ষা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডন চুক্তির শর্তানুসারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইতালিকে দক্ষিণ-টাইরল, ট্রিয়েস্ট্, ইস্ট্রিয়া, ভেলোনো বন্দর, আলবানিয়ার উপর সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সুযোগ-সুবিধাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল শর্ত উইলসনীয় জাতীয়তা-বাদী নীতি বিরোধী ছিল বলিয়া এবং বিশেষভাবে জাতীয়তার অজুহাতে ফাইউম্ শহরের উপর ইতালির দাবি প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সমর্থিত হয় নাই এজন্য ইতালি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। লণ্ডন চুক্তির সকল শর্তে রাজী না হইবার পশ্চাতে ফ্রান্সের দায়িত্ব বেশী ছিল। একথা ইতালীয় সরকার তথা ইতালিবাসীরা মনে করিত। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইতালির স্বার্থনাশের জন্য ফ্রান্সকে তাহারা দায়ী করিয়া-ছিল। আফ্রিকায় ইতালির ঔপনিবেশিক শক্তিবৃদ্ধিও ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের অভিপ্রেত ছিল না। লণ্ডন চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া শক্তি-সাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইতালির ক্ষমতা যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেই উদ্দেশ্যে প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় কর্তৃক ইতালির ন্যায্য দাবি স্বীকৃত হয় নাই। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট্‌বাদের অভ্যুত্থান এবং ফ্যাসিস্ট্ সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি ইতালি-ফ্রান্স বিরোধিতা আরও তীব্র করিয়া তুলিল। ফ্যাসিস্ট্‌গণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থহানির জন্য প্রধানত ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিলে এবং ফ্যাসিস্ট্ ইতালির আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিল। ইতালির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য স্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল কাঁচামালের। ইতালীয় সাম্রাজ্য বিস্তার-ই ছিল এই উভয়

প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থ উপেক্ষিত

ইতালিবাসীদের মতে প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালির স্বার্থ-নাশের জন্য দায়ী ফ্রান্স

ফ্রান্স কর্তৃক প্যারিসের শান্তি চুক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার চেষ্টা—পক্ষান্তরে ইতালি কর্তৃক প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তন দাবী

ফ্যাসিস্ট্-বিরোধী ইতালীয়গণ কর্তৃক ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ

উদ্দেশ্য সফল করিবার একমাত্র পন্থা। প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তানুসারে যে রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হইয়াছিল উহার পরিবর্তনের মধ্যেই ইতালির পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নিহিত ছিল। এজন্য ইতালি প্যারিসের শান্তি-চুক্তির পরিবর্তন দাবি করিল। পক্ষান্তরে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ফ্রান্স প্যারিসের শান্তি-চুক্তি—ভার্সাই, সেণ্ট্ জার্মেইন প্রভৃতি চুক্তিসমূহ অপরিবর্তিত রাখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। এই পরস্পর-বিরোধী পররাষ্ট্র-নীতি স্বভাবতই ফ্রান্স ও ইতালির বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ফ্যাসিস্ট্-বিরোধী যে-সকল ইতালিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ফ্যাসিস্ট্-বিরোধী প্রচার কার্য এবং ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনিকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র স্বভাবতই ইতালি-ফ্রান্স বিরোধ গভীর শত্রুতায় পরিণত করিল।*

ফ্রান্স ও ইতালির পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ

ভূমধ্যসাগর, বলকান, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিযোগিতা

ইতালি ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের অপর কারণ ছিল ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এবং ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস। পক্ষান্তরে ইতালি ছিল ফ্যাসিস্ট্ একক অধিনায়কত্বে বিশ্বাসী। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বও দুই দেশের সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন দানিউব অঞ্চল, উত্তর-আফ্রিকা-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ও বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতাও এই দুই দেশের বিবাদের অন্যতম কারণ ছিল। ফ্রান্স অধিকৃত স্যাভয়, নিস্, কর্সিকা ও টিউনিসিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালির দাবি-ই অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ইতালীয়গণ মনে করিত। ট্যাঞ্জিয়ারের উপর আধিপত্য বিস্তার লইয়াও ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইতালিকে ট্যাঞ্জিয়ারের শাসন ব্যাপারে অংশ দান করিতে হইয়াছিল। সর্বশেষে, ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সহিত নৌ-বলের সমতা দাবি ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বস্তুত, ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্ফারেন্সে ইতালি নৌ-বলে ফ্রান্সের সহিত সমতা দান

---

* **G. Hardy, p. 161.**

করিলে ফ্রান্স তাহা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে নৌ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ফ্রান্স তাহাতে ইতালির সহিত সমতার বিরোধিতা করিতে শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইতালি এই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইভাবে ইতালি ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিলে উভয় দেশই ইওরোপ, বিশেষভাবে পূর্ব-ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে সচেষ্ট হইল। ইতালি কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর এবং ফ্রান্স কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন ফরাসী-ইতালি প্রতিদ্বন্দ্বিতারই 'পর্যায় বিশেষ। 'লিট্‌ল আঁতাত' (Little Entente) দেশসমূহ অবশ্য ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া থাকুক ইহা-ই ইচ্ছা করিত, কারণ তাহা হইলে এই দুই দেশের কোনটি-ই বলকান অঞ্চলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রলাভের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। হাঙ্গেরী, আলবানিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক, স্পেন, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ইতালি মিত্রতাবদ্ধ হইল, পক্ষান্তরে ফ্রান্স রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করিল। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইতালি এই সকল দেশের সহিত একচেটিয়াভাবে মিত্রতা লাভ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স একাধিক ক্ষেত্রে ইতালির সহিত যুগ্মভাবে অপরাপর শক্তি-বর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল।* ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরের কালে ফ্রান্সের এই মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। এমন্ কি, ফ্রান্সের মিত্রদেশ যুগোস্লাভিয়ার সহিত ইতালির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ইতালি ও ফ্রান্স নিজ নিজ সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিতেও ত্রুটি করিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হয় নাই।

ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সহিত নৌ-বলের সমতা দাবি

উভয় দেশ কর্তৃক অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার প্রতিযোগিতা

ইতালির একচেটিয়া মিত্রতা লাভের ইচ্ছা

যুগোস্লাভিয়া-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে ইতালি ও ফ্রান্স কর্তৃক সৈন্য সমাবেশ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-ইতালীয় মনোমালিন্যের কতকটা লাঘব ঘটে। কারণ

Ibid p. 165.

ঐ বৎসর ব্রিয়াঁ ও মুসোলিনি ইতালীয় নাগরিকগণ ফ্রান্সে এবং ফরাসী নাগরিকগণ ইতালিতে কিরূপ অধিকার ও মর্যাদা পাইবে তাহা বর্ণনা করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঐ বৎসরই ট্যাঞ্জিয়ারের শাসনব্যবস্থায় ইতালিকে অংশদানের ফলে ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্কের কতকটা উন্নতি ঘটে।

ব্রিয়াঁ-মুসোলিনি সৌহার্দ্য—ট্যাঞ্জিয়ারের শাসনব্যবস্থায় ইতালিকে অংশদান

এদিকে দক্ষিণ-টাইরলে মুসোলিনি কর্তৃক জার্মান অধিবাসিবৃন্দকে ইতালীয়তে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা জার্মানির অসন্তুষ্টির কারণ হইলে স্বভাবতই ইতালি ও জার্মানির সম্পর্ক তিক্ত হইল। এদিকে লোকার্ণো চুক্তির ফলে (১৯২৫) জার্মানির আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলে এবং ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিলে জার্মানি টাইরলের জার্মান জাতির লোকের উপর মুসোলিনির দমন-নীতির বিরোধিতা শুরু করিল। জার্মানি ইতালীয় পণ্যদ্রব্য বয়কট করিলে মুসোলিনি 'আল্টো এডিজ' (Alto Adige) নামক স্থানে জার্মানগণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহারা সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক—এই বলিয়া ঘোষণা করিলে মুসোলিনি ইতালীয় অধিকার সেই অঞ্চলে বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর একথা জার্মানির নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতালি-জার্মানি বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও জার্মানি পরস্পর সৌহার্দ্য এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসার শর্তসম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহার পর হইতে ইতালি-জার্মানি সম্পর্ক ক্রমেই সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান ও হিট্‌লারের 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবপ্রসূত আস্ফালন ইতালি ও ফ্রান্স—উভয় দেশেরই ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্ক ক্রমেই সৌহার্দ্যপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে একটি মিত্রতা চুক্তি (Rome Agreement) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা ইতালি ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান করিল। ফ্রান্স আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশের একাংশ ইতালিকে ছাড়িয়া দিল। জিবুতি-আদ্দিস-আবাবা রেলপথের ৭ শতাংশ শেয়ার ইতালিকে দিল। জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলে উভয় দেশ পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করিবে

দক্ষিণ-টাইরলের জার্মানদের উপর ইতালির দমন-নীতি—ইতালি-জার্মানি শত্রুতা

নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান—ইতালি ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্যের কারণ

স্বীকৃত হইল। রোম চুক্তির আলোচনাকালে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ইথিওপিয়ায় ইতালির স্বার্থবৃদ্ধির কোন বাধাদান করিবেন না এই প্রতিশ্রুতিও দিয়া আসিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইতালি ইথিওপিয়া অধিকার করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। ইথিওপিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করা-ই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। রোম চুক্তির ফলে ইতালির ইথিওপীয় নীতি ফ্রান্সের সমর্থন লাভ করিবে এই ইঙ্গিত পাইবামাত্র মুসোলিনি ইথিওপিয়ার সহিত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত পরস্পর মিত্রতা ও অনাক্রমণ-চুক্তি উপেক্ষা করিয়া ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলেন (১৯৩৫)। ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা এবং লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর দুর্বলতা মুসোলিনিকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে সাহসী করিয়াছিল। ইথিওপিয়ার রাজা হেইলি সেলাসি লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর শরণ লইলে ইতালিকে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু ইতালির মিত্রশক্তি ফ্রান্স লীগ কাউন্সিলে ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ সমর্থন না করায় ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে সৌহার্দ্য হ্রাস পাইল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ইতালির বিরুদ্ধে লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না।

ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ

লীগ-অব-ন্যাশনস্ কর্তৃক ইতালির বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইথিওপিয়ার অধিকাংশ ইতালিকে অধিকার করিতে দিয়া এক ক্ষুদ্র অংশ হেইলি সেলাসির জন্য রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। মুসোলিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের মধ্যে সমগ্র ইথিওপিয়া দখল করিয়া লইলেন। সেই সময়ে হিট্‌লার ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া রাইন অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলে বৃটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-প্রীতি স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বীকার করিয়া লইল। কেবলমাত্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সাম্রাজ্যবাদী জবরদখল সমর্থন করিল না। এমতাবস্থায় লীগ-অব-ন্যাশনস্—ইতালির বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-প্রীতি

হিট্‌লার কর্তৃক রাইন অঞ্চলে সামরিক ব্যবস্থা গঠনের ফলে ইতালি-ফ্রান্স ব্রিটেনের মিত্রতা বৃদ্ধি

ইতালি ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্য অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। মুসোলিনির ন্যায় হিট্‌লারের একক অধিনায়কত্ব ক্রমে ইতালি ও জার্মানিকে মিত্রতাবদ্ধ হইবার পথে আগাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক ইতালির ইথিওপিয়া অভিযানের নৈতিক সমর্থন ক্রমে ইতালি ও জার্মানির পরস্পর সম্পর্ক মিত্রতাপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে ইতালি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সামরিক সাহায্য দান করে। পক্ষান্তরে স্পেনীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উদারনৈতিক দেশের কোন কার্যকরী সমর্থন লাভ করে নাই। এই সুযোগে হিট্‌লার তাঁহার নবগঠিত বিমানবাহিনীর দক্ষতা পরীক্ষা করিবার এবং তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতি ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে মুসোলিনির সহিত যুগ্মভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে অগ্রসর হন। এইভাবে ইতালি ও জার্মানির সৌহার্দ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জার্মানির শত্রু-দেশ ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠে। ইতালি ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্পর্কও ক্রমেই তিক্ত হইতে থাকে। এদিকে ইতালি ও জার্মানি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করিলে জার্মানি-ইতালি-জাপান এই তিন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়, কারণ ইতিপূর্বে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে এই ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইতালি ও জার্মানির মিত্রতা যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ফ্রান্স ও ইতালির সম্পর্কের ততই অবনতি ঘটিতে লাগিল। মিউনিক চুক্তির ফলে পরিস্থিতির চাপে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইতালির মধ্যস্থতা গ্রহণ করিলেও ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্কের কোন উন্নতি তাহাতে ঘটে নাই। ইতালি কর্তৃক হিট্‌লারের অষ্ট্রিয়া অধিকারের সমর্থন এবং জার্মানির সহিত সামরিক চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ইতালি কর্তৃক টিউনিসে বিদ্রোহের উস্কানি প্রভৃতি ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করিল।

জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান: জার্মান-ইতালীয় মৈত্রী বৃদ্ধি

ইতালির কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান

ইতালি-জার্মানি মিত্রতা - ফরাসী-ইতালির শত্রুতার অন্যতম কারণ

সপ্তম অধ্যায়

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক

(British Foreign Relations)

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি (Fundamental Principles of British Foreign Relations) : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতিগুলি মোটামুটিভাবে একই রূপ ছিল বলা যাইতে পারে। অবশ্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান, সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত একথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল সামুদ্রিক প্রাধান্য বজায় রাখা, ইওরোপীয় মহাদেশে কোন অত্যধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান রোধ করা, ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিয়ন্তার পদে স্থাপন করা এবং গ্রেট ব্রিটেন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করিতে পারা যায় এরূপ ঘাঁটি স্থাপনে বাধা দান করা। সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থানের পর সাম্যবাদের বিরোধিতা এবং সেহেতু পরোক্ষভাবে নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থানে সমর্থন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি : সামুদ্রিক প্রাধান্য বজায়, শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান রোধ, শক্তি-সাম্য রক্ষা, শত্রুপক্ষ কর্তৃক ঘাঁটি নির্মাণ-রোধ ও সাম্যবাদের বিরোধিতা

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্ক (British Foreign Relations Between the two World Wars) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ ও ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি পরিলক্ষিত হয় এবং এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্স জার্মানির উপর জয়লাভকে প্রকৃত বিজয় বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে নাই। কারণ, পরাজিত জার্মানির পুনরুজ্জীবন ও সম্ভাব্য আক্রমণ ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স :

এজন্য ফ্রান্স ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতিদানে অস্বীকৃত হইলে ব্রিটেনও এককভাবে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইল না। ফলে, স্বভাবতই ফ্রান্স অসন্তুষ্ট হইল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সম্পর্কও কতকটা বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিল জার্মানির প্রতি এই দুই দেশের অনুসৃত নীতির বৈষম্য হেতু। ব্রিটেন জার্মানির সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির উপর বিশাল ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপান ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। প্রধানত ইঙ্গ-ফরাসী মতের অনৈক্য হেতুই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের প্রশ্নটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission)-এর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জ-এর মতে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর সভ্যতার স্বার্থেই জার্মানির পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থান একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য

ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিবার আরও কারণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ-অব-ন্যাশন্স্, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি প্রভৃতির সব কিছুতেই যোগ দিতে অস্বীকৃত হইলে ক্ষতিপূরণ কমিশনে ব্রিটেন এককভাবে ফ্রান্সকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। ফলে, ব্রিটেনের ইচ্ছা না থাকিলেও ফ্রান্সের প্রভাবে ক্ষতিপূরণ কমিশন জার্মানির উপর এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপাইতে বাধ্য হইল। এই ব্যাপারে এবং জার্মানির ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার ক্ষমতা আছে কিনা সেই বিষয় লইয়া ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানিকে ইচ্ছাকৃত ক্ষতিপূরণ অনাদায়ের দোষে অভিযুক্ত করিয়া রুহ্‌র অঞ্চল অধিকার করিলে ব্রিটেন উহার সমর্থন করিল না। এইভাবে ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা-সংক্রান্ত মতানৈক্য

ফ্রান্স কর্তৃক রুহ্‌র অধিকার—ব্রিটিশ অসন্তুষ্টি

যাহা হউক, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর একদিকে যেমন ফরাসী-জার্মান বিদ্বেষ কতকাংশে দূরীভূত হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে ইঙ্গ-

ফরাসী তিক্ততাও হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি দেখা দিল। ইংলণ্ডের জনমত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের অনুগতভাবে পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধিও ইংলণ্ডের জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখিল না। ফলে, ব্রিটিশ সরকার ফ্রান্স-তোষণ-নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার প্রমাণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হেইগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক সভায় ব্রিটিশ চ্যান্সেলর লর্ড স্নোডেন (Lord Snowden)-এর বক্তৃতায় পাওয়া যায়।

লোকার্ণো চুক্তি—ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের উন্নতি

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি

ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্যের ফলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্কে যে পুনরায় তিক্ততা দেখা গিয়াছিল তাহার প্রমাণ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে নৌ-সম্মেলনে পাওয়া গেল। ফরাসী প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায়ে অকৃতকার্য হইয়া ইতালি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ নৌ-বল রাখিবার দাবির বিরোধিতা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান একটি ত্রি-শক্তি নৌ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হইলেও নৌ-বল হ্রাস ব্যাপারে উহার কোন প্রকৃত মূল্য রহিল না। ইহার পর জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহিত শুল্কসংঘ স্থাপনের চেষ্টা এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি প্রধানত ফ্রান্সের বিরোধিতায় বানচাল হইয়া গেল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির দুর্বলতাই যে এজন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

লণ্ডন নৌ-চুক্তিতে (১৯৩০) ফরাসী-ইতালীয় বিরোধিতা—ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির দুর্বলতা

জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি বা নাৎসি নেতা হিট্‌লারের ঔদ্ধত্যও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না। নাৎসি জার্মানির পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্ভবত জার্মানি কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে সাম্যবাদী রাশিয়ার বিরোধিতা ব্রিটেনকে ক্রমে জার্মানির প্রতি কতকটা উদার নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করিল। এমন কি, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা (Stresa) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইতালির সহিত যুগ্মভাবে নাৎসি জার্মানির সামরিক সাজ-

ফ্রান্স-ব্রিটেন-ইতালি কর্তৃক জার্মানির সামরিক সাজ-সরঞ্জামের নিন্দাবাদ (স্ট্রেসা-সম্মেলন, ১৯৩৫)

সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদ করিলেও ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটেন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি (Naval Agreement) স্বাক্ষর করিয়া জার্মানিকে ব্রিটেনের মোট নৌ-বলের ৩৫ শতাংশ গঠন করিবার অনুমতি দিল। ফলে, ইহা ফ্রান্সের দিক দিয়া ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল, স্বভাবতই ইঙ্গ-ফরাসী বিদ্বেষও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির ফলে জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি ব্রিটেন পরোক্ষভাবে অনুমোদন করিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা-সম্মেলনে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি কর্তৃক যুগ্মভাবে নাৎসি জার্মানির সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদেরও কোন মূল্য রহিল না। ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক যখন এইভাবে পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ সেই সময়ে মুসোলিনি ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ সরকার ফরাসী সরকারের সহিত যুগ্মভাবে উহার বিরোধিতা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ইতালির বিরোধিতা করিতে অসম্মত হওয়ায় মুসোলিনিকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। সমগ্র ইথিওপিয়া রাজ্যটি ইতালির কুক্ষিগত হইল। ব্রিটেন কর্তৃক মুসোলিনির ইথিওপিয়া অধিকারে বাধাদান না করা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু ক্রমেই নাৎসি জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে হিট্‌লার-তোষণে বাধ্য হইল। মিউনিক চুক্তিই ইহার প্রমাণ। অতঃপর, হিট্‌লার কর্তৃক ডানজিগ্‌ নামক শহর ও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-এশিয়ার সহিত সংযোগ-পথ (Polish Corridor) দাবি করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্রমেই পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া মিত্রতাবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপিত হইল।

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি—ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের তিক্ততা

ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া জয়—ইঙ্গ-ফরাসী মতানৈক্য হেতু মুসোলিনির পূর্ণ সাফল্য

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মান-তোষণ-নীতি

পোল্যাণ্ডের উপর হিট্‌লারের দাবি—ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী পুনঃস্থাপনের প্রত্যক্ষ কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হৃতমর্যাদা জার্মানিকে যুদ্ধ-অপরাধের শাস্তিদানে ইচ্ছুক থাকিলেও এই শাস্তি অনুকম্পা মিশ্রিত হউক ইহাই ছিল ব্রিটিশ মনোভাব। পুনরুজ্জীবিত জার্মানি ইওরোপীয় তথা মানব সভ্যতার খাতিরেও প্রয়োজন ছিল, একথাও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ মনে করিতেন। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত

ব্রিটেন ও জার্মানির পরস্পর সম্পর্ক

বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনও ব্রিটেনকে জার্মানির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায়ও জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের অসন্তুষ্টি সাধন করিয়াও ব্রিটিশ সরকার জার্মানির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিপূরণের কিস্তি দানে বিলম্ব করিয়াছে এই অজুহাতে ফ্রান্স বেলজিয়ামের সহিত যুগ্মভাবে জার্মানির রুহ্‌র অঞ্চল দখল করিলে ব্রিটেন প্রকাশ্যভাবে উহার প্রতিবাদ করিল। কারণ, জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনোভাব কতকটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্রিটিশ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের কালে জার্মানিকে বিজেতা রাষ্ট্রগুলির সহিত সম-মর্যাদায় স্থাপন এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদ দান প্রভৃতি জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতিরই প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের পর হইতে জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর শর্তাদি ভঙ্গ ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, হিট্‌লার তাঁহার কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্যভাবে জানাইতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। জার্মানি ও জাপান কর্তৃক কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী মিত্রতা চুক্তিও ব্রিটেনের জার্মান-প্রীতির অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রেসা-সম্মেলনে (Stresa Conference) ফ্রান্স ও ইতালির—প্রধানত ফ্রান্সের চাপে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি নাৎসি সরকার কর্তৃক সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির নিন্দাবাদ করিলেও ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রিটেন জার্মানির সহিত এক নৌ-চুক্তি (Naval Agreement) স্বাক্ষর করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই চুক্তির শর্তানুসারে ব্রিটেনের মোট নৌ-বলের ৩৫ শতাংশ জার্মানি গঠন করিতে পারিবে স্থিরীকৃত হয়। ইহা জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করিয়া সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির প্রকাশ্য সমর্থন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এইভাবে জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের সহানুভূতি ও সমর্থনের মনোভাব আরও কিছুকাল পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনো-ভাবকে 'সহানুভূতিমূলক সমর্থন' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী চারি বৎসর (১৯৩৫-১৯৩৯ খ্রীঃ) ব্রিটেন জার্মানির প্রতি

ব্রিটেনের জার্মান-প্রীতি

ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি

ব্রিটেনের সহানুভূতিমূলক সমর্থন তোষণ-নীতিতে রূপান্তরিত

যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা 'তোষণ-নীতি' (Appeasement) ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

বলডুইন্ (Baldwin) ও চেম্বারলেন (Neville Chamberlain)-এর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে জার্মানির প্রতি ব্রিটিশ-নীতি যেমন ছিল দুর্বল তেমনি তোষণ-মূলক। নাৎসি জার্মানির ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি এবং রাজ্যগ্রাস-স্পৃহা ব্রিটেন এবং অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের উদাসীনতা ও তোষণ-নীতির ফলে যখন মিউনিক চুক্তিতে পরিণতি লাভ করিল তখন ব্রিটেন ও অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চৈতন্যোদয় হইল। মিউনিক চুক্তি জার্মান তোষণ-নীতির চরম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার নিজ পররাষ্ট্র-নীতির অকর্মণ্যতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন। ব্রিটিশ জনমতও এই ধরনের জার্মান-তোষণ নীতির বিরোধিতা শুরু করিল। এদিকে জার্মানি ডান্‌জিগ্ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' (Polish Corridor) দখল করিবার জন্য পোল্যাণ্ডকে চাপ দিলে ব্রিটেন দৃঢ়নীতি অনুসরণে বাধ্য হইল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার জন্য যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার প্রতিশ্রুতিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটেন রুমানিয়া ও গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। ইহা ভিন্ন নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে ব্রিটিশ সরকার পশ্চাদ্‌পদ নহেন একথাও এই সকল দেশকে জানাইয়া দিলেন। ঠিক সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতির ত্রুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিল। জার্মানির রাজ্য-গ্রাস-নীতি সোভিয়েত রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভীতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের জার্মান-তোষণ-নীতি এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আরও বৃদ্ধি পাইলে সোভিয়েত সরকার নিজ নিরাপত্তার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আত্মরক্ষা-মূলক চুক্তির সুযোগ উপস্থিত হইল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইল। কিন্তু রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার ব্যাপারে ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক আলোচনায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অদূরদর্শিতাহেতু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া জার্মানির সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরাপত্তা ও সামরিক সাহায্য-সহায়তা চুক্তি

জার্মান-তোষণ-নীতি: মিউনিক চুক্তি

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি

স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত আলাপ-আলোচনায় পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাহারা রাশিয়ার সাহায্য চাহিলেও ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার রাশিয়াকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দানে অগ্রসর হইলেন না। তাহারা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু জার্মানির তথা অপর কোন শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। সোভিয়েত রাশিয়া এই ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় রাজী হইল না। সেই সুযোগে জার্মানি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের সাফল্যের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণের চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহান্বিত হইল। রাশিয়া স্বভাবতই জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতির ভয়ে ভীত ছিল। এজন্য রাশিয়াও জার্মানির সহিত দশ বৎসরের জন্য পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল (আগস্ট ২৩, ১৯৩৯)। এইভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবাস্তব এবং অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতির ফলে জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি পাইল এবং জার্মানি রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবামাত্র পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল।

রাশিয়ার সহিত ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক আলোচনা

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ — ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে উহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ইতালিকে দেওয়া হয় নাই। ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইতালি প্যারিসের শান্তি-চুক্তি পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিল। প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে ইতালি যে ন্যায্য ব্যবহার লাভ করে নাই ইহা ব্রিটেন উপলব্ধি করিয়া ইতালিকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ড ইতালির সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বেলজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্রিটেন ও ইতালি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বেলজিয়াম-ফ্রান্স-জার্মানির পরস্পর সীমারেখা রক্ষা করিবার দায়িত্বও অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেন ও ইতালি যুগ্মভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই অধিকতর মিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঞ্জিয়ার নামক শহরের শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেনের আগ্রহের ফলে ইতালিকেও অংশ দান করা হইয়াছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি নেতা হিট্‌লারের

ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক

সৌহার্দ্যপূর্ণ ইঙ্গ-ইতালীয় সম্পর্ক

অভ্যুত্থানের ফলে ব্রিটেন ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ইতালি ষ্ট্রেসা-সম্মেলনে সমবেত হইয়া নাৎসি জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির তীব্র নিন্দাবাদ করে। কিন্তু পর বৎসর (১৯৩৬ খ্রী:) মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকার উহার যখন তীব্র নিন্দা করিলেন সেই সময় হইতে মুসোলিনি ক্রমেই নাৎসি নেতা হিট্‌লারের সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইতালিকে নিজপক্ষে রাখিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স রোমে মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রিটেন ও ইতালির মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি জার্মানি ও জাপানের সহিত যুগ্মভাবে মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ ও অধিকার—ব্রিটেন-ইতালির মৈত্রী নাশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষের মিত্র হিসাবে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়া তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের পূর্বাবধি ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক মিত্রতামূলকই ছিল। কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি কিরূপ হইবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা রাশিয়ার জনসাধারণের—এ বিষয়ে ব্রিটেনের কোন অংশ গ্রহণের ইচ্ছা নাই—এইরূপ প্রকাশ্য উক্তি করা সত্ত্বেও বল্‌শেভিক্ রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবে কোনপ্রকার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর 'বেল্‌ফার মেমোরেণ্ডাম্' (Balfour Memorandum)-এ তৎকালীন ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ইহাতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের নাই, একথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও সাইবেরিয়া, ট্রান্স-ককেশিয়া, ট্রান্স-কাস্‌পিয়া, শ্বেতসাগর ও আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে মিত্রপক্ষের সাহায্যে বল্‌শেভিক-বিরোধী যে শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব একথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া বল্‌শেভিক্

ইঙ্গ রুশ সম্পর্ক

বেল্‌ফার মেমোরেণ্ডাম্ (Balfour Memorandum)-এ ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক বিশ্লেষণ

সরকারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে চেকোস্লোভাকিয়ার নিরাপত্তা, এস্তোনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ব্রিটিশ সরকার সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন, এই ঘোষণা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ল্যায়েড্ জর্জ করিয়াছিলেন। এস্তোনিয়ার নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে প্রেরিত ব্রিটিশবাহিনী উত্তর-রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল কারণে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক স্বভাবতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সোভিয়েত সরকারের সাম্যবাদী প্রচারকার্য এবং বিপ্লবের মাধ্যমে অপরাপর ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার আগ্রহ রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রাশিয়া হইতে ব্রিটিশ তথা সকল বিদেশীয় সৈন্য অপসারিত হইলে ক্রমে ইঙ্গ-রুশ বিদ্বেষভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে দুই দেশের মধ্যে এক দিকে যেমন বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয় অপর দিকে তেমনি সোভিয়েত সরকার ব্রিটেনে সাম্যবাদী কোনপ্রকার প্রচারকার্য চালাইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়যুক্ত হইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-নীতির কতকটা পরিবর্তন ঘটিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত সরকারকে আইনত স্বীকার করিলে ইতালি, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক কতকটা প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও ব্রিটেনে সোভিয়েত সরকারের প্রচারকার্য গোপনে চলিতে লাগিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে রাশিয়া নানাপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য দান করিলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বাহ্যত ইঙ্গ-রুশ আদান-প্রদান বজায় থাকিলেও ব্রিটিশ জনসাধারণ রাশিয়ার প্রতি সর্বদাই এক বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে লাগিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট্-বিরোধী নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান রাশিয়াকে ব্রিটিশ-মিত্রতা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশনস্‌-এ রাশিয়াকে স্থান দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স এ

ব্রিটেনের সোভিয়েত বিরোধী-নীতি

রাশিয়া হইতে ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণ—ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের উন্নতি

ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য-চুক্তি (১৯২১)

ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েত সরকার আইনত স্বীকৃত

ব্রিটেনে রুশ প্রচার-কার্য—ইঙ্গ-রুশ তিক্ততা

বিষয়ে তৎপর হইলে রাশিয়াকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্ত করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্র পরিবারের সম-মর্যাদায় স্থাপন করা হইল। নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান ও রাজ্যগ্রাস-নীতিই ব্রিটেনকে রাশিয়ার প্রতি এইরূপ সৌহার্দ্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক অনুসৃত জার্মান-তোষণ-নীতি রাশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী একথা ব্রিটিশ বা ফরাসী রাষ্ট্রনায়কগণ উপলব্ধি করিতেছেন না এই কারণে রাশিয়া এই দুই দেশের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিল। হিট্‌লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকার, সুদেতেন অঞ্চল অধিকার, সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রীস প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনায়কগণের অকর্মণ্যতা তথা মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দান রাশিয়াকে নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। অবশেষে হিট্‌লার ডান্‌জিগ্‌ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং রাশিয়াকেও ইওরোপের পূর্বাঞ্চলে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাতে স্বভাবতই আগ্রহান্বিত হইল না। কারণ, পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পর নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিলেও রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইহা পরস্পর নিরাপত্তার কোন প্রস্তাব ছিল না, কেবলমাত্র রাশিয়ার নিকট হইতে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায়েরই চেষ্টা করা হইয়াছিল মাত্র। এই বৈষম্যমূলক নীতি রাশিয়া স্বভাবতই সন্দেহের চক্ষে দেখিল। ফলে, আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সম্ভাব্য শত্রু জার্মানির সহিতই দশ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি করিয়া বসিল। ব্রিটিশ কূটনীতির অবাস্তবতা ও অদূরদর্শিতা এবং সেহেতু উহার ব্যর্থতা এইভাবে প্রমাণিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি উপেক্ষা করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে, মিত্রশক্তিবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন সেই পরিস্থিতিতে সহজ হইল।

নাৎসি জার্মানির অভ্যুত্থান—ইঙ্গ-রুশ মিত্রতার পথ প্রস্তুত

ব্রিটেনের হিট্‌লার-তোষণ-নীতি—রুশ সন্দেহ

রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে অসাফল্য—ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক ব্যর্থতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ও মিত্রশক্তি-বর্গের সংবদ্ধতা

বেলজিয়ামের প্রতি ব্রিটিশ-নীতি ছিল সংরক্ষণমূলক। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা ব্রিটিশ সরকার নিজ নিরাপত্তার সামিল মনে করিতেন। বৃটেনের প্রতি

শত্রুভাবাপন্ন কোন রাষ্ট্রের প্রাধান্য বেলজিয়ামে স্থাপিত হইবার তীব্র বিরোধিতা ব্রিটিশ সরকার চিরকালই করিতেন। এজন্য লোকার্ণো চুক্তিতে বেলজিয়ামের সীমারেখার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দিয়াছিলেন।

ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের সম্পর্ক

ব্রিটেনের তুরস্ক-নীতি দার্দানেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া ব্রিটিশ নৌবহরের অবাধ যাতায়াত ও কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রুমানিয়ার নিরাপত্তার জন্যও ব্রিটিশ সরকার এই পথে অবাধ-ভাবে যাতায়াতের অধিকার বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন থেস, আনাটোলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য স্থাপনের বিরোধিতা করাও ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ-নীতি।

ব্রিটেন ও তুরস্ক

[বিশদ আলোচনা 'মধ্যপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

অষ্টম অধ্যায়

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্ক

(Foreign Relations of France)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা (Problem of French Security after the First World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল সূত্রই ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। বস্তুত, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি চিরকালই ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফ্রান্সের উত্তর ও পূর্ব-সীমারেখা বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে সহজ ছিল, এজন্য এই দুই সীমারেখার সংরক্ষণ ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়ী হইলেও এই বিজয় ফ্রান্সের জার্মানি ভীতি দূর করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়লাভ প্রকৃতপক্ষে পরাজয়েরই নামান্তর ছিল। বিজয়ের উল্লাস স্তিমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সমগ্র রাইন অঞ্চল ফ্রান্স দাবি করিয়াছিল। এই দাবি অবশ্য সমর্থিত হয় নাই। ফলে, ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই-এর সন্ধি বা লীগ-অব-ন্যাসন্‌স্‌-এর চুক্তিপত্র কোন কিছুই গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বভাবতই ভার্সাই-এর চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত ফরাসী-জার্মান সীমারেখার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বাতিল হইয়া গেল। এমতাবস্থায় ব্রিটেন এককভাবে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইল না। ফরাসী নিরাপত্তার প্রশ্ন পুনরায় জটিল আকারে দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্স ব্রিটেনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর চুক্তিপত্রের (Covenant) উপর ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। এজন্য নিজ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স লীগের মাধ্যমে এবং

ফ্রান্সের ভৌগোলিক অবস্থান—নিরাপত্তা সমস্যা

ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিশ্রুতি

ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিশ্রুতি বাতিল

লীগের বাহিরে নিরাপত্তার উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত হইল। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ফ্রান্স বিভিন্ন দেশের সহিত পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বেলজিয়াম ফ্রান্সের ন্যায়ই জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। পুনর্গঠিত পোল্যাণ্ড জার্মানির সর্বনাশের কারণ ছিল, কারণ জার্মানির অংশ ছিন্ন করিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। স্বভাবতই পোল্যাণ্ড জার্মানির ভয়ে ভীত ছিল। এমতাবস্থায় বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপনের পথ প্রস্তুত ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে পশ্চিমে বেলজিয়াম এবং পূর্বে পোল্যাণ্ডের সাহায্যের ব্যবস্থা ফ্রান্স করিতে সমর্থ হইল। ঐ একই নীতি অনুসরণ করিয়া ফ্রান্স ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়ার সহিত এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল।

ফ্রান্স-বেলজিয়াম, ফ্রান্স পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স-চেকো-স্লোভাকিয়া, ফ্রান্স-রুমানিয়া, ফ্রান্স-যুগোস্লাভিয়া পরস্পর নিরাপত্তার চুক্তি

এদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে উহার শর্তানুসারে ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর সীমারেখার নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ফ্রান্স পাইল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে আপাতদৃষ্টিতে ফরাসী-জার্মান শত্রুতা এবং ফ্রান্সের জার্মান ভীতি কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। ফ্রান্স ও জার্মানির সীমারেখা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রিটেনের উপর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ব্রিটেন প্রয়োজন হইলে সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে এরূপ আশা অনেকটা অবাস্তব ছিল, বলা বাহুল্য। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের আর্থিক, সামরিক নানাবিধ দুর্বলতা স্বভাবতই দেখা দিয়াছিল। জার্মানি ফ্রান্সকে আক্রমণ করিলে ব্রিটেন উহা সত্যিই বাধা দিতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেনশো এজন্য বলিয়াছিলেন যে, লোকার্ণো চুক্তি এক অতি ক্ষণভঙ্গুর ব্যবস্থা, ফ্রান্সকে ভুলাইয়া রাখিবার পন্থা মাত্র। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সৌহার্দ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল উহার সূত্র ধরিয়াই কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফলে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইল যে, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধ-নীতির উপর তেমন আর জোর দিবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-জার্মান বিদ্বেষ পুনরায় দেখা দিল। ফ্রান্স কর্তৃক

লোকার্ণো চুক্তি

জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি এবং জার্মানি কর্তৃক অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার পাল্টা দাবি শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। জার্মানি কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ ও ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধি উত্তরোত্তর ফ্রান্সের ত্রাস বৃদ্ধি করিয়া চলিল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন—ফরাসী-জার্মান বিরোধ

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে নিরাপত্তার প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যে মনোমালিন্য ও মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে একদিকে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ফ্রান্সের যেমন দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল অপর দিকে তেমনি জার্মানির পুনরুত্থানের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। [ইঙ্গ-ফরাসী পরস্পর সম্পর্কের আলোচনা ১৯৫ পৃষ্ঠায় এবং ফ্রান্স ও ইতালির পরস্পর সম্পর্ক ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] হিট্‌লারের উত্থান এবং রাজ্যগ্রাস-নীতি যখন এক ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল তখন হইতে পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইতে থাকিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে (১৯৩৯) ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মৈত্রী ও পরস্পর নির্ভরশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

ইঙ্গ-ফরাসী ও ফরাসী-ইতালীয় সম্পর্ক

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সম্পর্ক প্রথমে মোটেই সৌহার্দ্য-মূলক ছিল না। সোভিয়েত সরকারকে ফ্রান্স প্রথমে স্বীকারও করে নাই। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সোভিয়েত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলে ফ্রান্স ও অপরাপর ইওরোপীয় রাষ্ট্র অনুরূপ স্বীকৃতি ঘোষণা করে। তথাপি রুশ-ফরাসী সম্পর্ক বেশ প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, একথা বলা চলে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসি নেতা হিট্‌লারের উত্থান এবং তাঁহার রাজ্যগ্রাস-নীতি যখন ক্রমে রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল তখন স্বভাবতই ফরাসী-রুশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে লাগিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা এবং একের রাজ্যসীমা আক্রান্ত হইলে অপরে সামরিক সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে—এরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই চুক্তি রাশিয়া এবং ফ্রান্সের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিয়া ছিল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন মূল্য ছিল

ফরাসী-রুশ সম্পর্ক

ফ্রান্স ও রাশিয়ার পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি (১৯৩৫)—ইহার ব্যর্থতা

না। কারণ, পোল্যাণ্ড নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া রুশ সৈন্য ফ্রান্সের সাহায্যে যাইবার অনুমতি না দিলে ফ্রান্সের বিপদে রাশিয়ার সাহায্য লাভ সম্ভব ছিল না। পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সুতরাং পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া রুশ সৈন্য যাতায়াতের অনুমতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই কারণে এবং ফরাসী সরকারের উদাসীনতার ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি (১৯৩৫) অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর করিলে রাশিয়া স্বভাবতই ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠে। ফ্রান্সের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ম্যাজিনো লাইন (Maginot line) ইতিপূর্বে তৈয়ার হইয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোনে (Bonnet) জার্মানিকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, চেকোস্লোভাকিয়ার উপর কোনপ্রকার আক্রমণ ফ্রান্সের উপর আক্রমণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরে ফ্রান্স সম্মত হইলে ফ্রান্সের প্রতি রাশিয়ার বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। তারপর হিট্‌লার যখন ডান্‌জিগ্‌ ও 'পোলিশ কোরিডোর' দাবি করিলেন তখন পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স পরস্পর সাহায্য-সহায়তার এবং নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করিল। রাশিয়াকে নিজেদের দলে টানিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার নিকট হইতেও পোল্যাণ্ডের এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ও সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টা ফ্রান্স ব্রিটেনের সহিত যুগ্মভাবে শুরু করিল। কিন্তু রাশিয়ার নিরাপত্তা বা রাশিয়াকে সামরিক সাহায্যদানের কোন প্রতিশ্রুতির ব্যবস্থা হইল না। ফলে, রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিত দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল। হিট্‌লার এইভাবে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের রুশ-নীতি অবাস্তবতা ও অদূরদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল।*

মিউনিক চুক্তি—ফরাসী-রুশ সম্পর্কের অবনতি

ফ্রান্সের অবাস্তব ও অদূরদর্শী রুশ-নীতি

---

* ফরাসী পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিশদ আলোচনা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে

নবম অধ্যায়

মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্ক

(American Foreign Relations)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি (Fundamentals of the Foreign Relations of the U. S. A.) : প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র সম্পর্ক ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার বিদায়ী ভাষণে (১৭৯৭ খ্রী:) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের নীতিগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি তথা পররাষ্ট্র সম্পর্কের আলোচনায় জর্জ ওয়াশিংটনের উল্লিখিত নীতিগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা এবং রাজনৈতিক-সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া চলা। ইওরোপীয় মহাদেশের পরস্পর সমস্যা এবং সেই সকল সমস্যাপ্রসূত দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবান্তর। এজন্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সহিত রাজনৈতিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক দিয়া কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সামিল। মার্কিন জাতির একত্ববোধ এবং সমগ্র জাতির অখণ্ড আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা সাধনের নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে তাহা হইলে ন্যায়, সভতা ও মার্কিন জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিন সরকার যুদ্ধ অথবা শান্তি—যে-কোন পন্থা বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব

জর্জ ওয়াশিংটন ঘোষিত মার্কিন-পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূলনীতি : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা—অর্থনৈতিক যোগাযোগ

ভৌগোলিক পরিস্থিতি উহাকে পররাষ্ট্রের সহিত কোনপ্রকার স্থায়ী রাষ্ট্র-জোট গঠন হইতে বিরত থাকিবার ইঙ্গিত দিতেছে। অবশ্য কোন সম্মুখীন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে পররাষ্ট্রের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করিবে।"*

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলা-ই ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল নীতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮২৩ খ্রীঃ) প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো ঘোষিত মন্‌রো-নীতি (Monroe Doctrine) জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্লেষিত মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কেরই অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখা এবং আমেরিকার কোন অংশে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির স্থলে পরিণত হইতে না দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। মন্‌রো-নীতিতে একথাও বলা হইয়াছিল যে, ইওরোপীয় কোন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিবে না, দক্ষিণ-আমেরিকার কোন অংশে কোন বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও বরদাস্ত করিবে না। মার্কিন স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে ওয়াশিংটন ও মন্‌রো ঘোষিত নীতি খুবই সহায়ক ছিল সন্দেহ নাই।

মন্‌রো-নীতি (Monroe Doctrine)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হইত। শেষ পর্যন্ত এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ জার্মানি কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ আক্রমণেরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি জার্মানি মার্কিন সরকারকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিল যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ব্রিটেনের চতুঃপার্শ্বের জলখণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন উল্লিখিত অংশে দেখা গেলে জার্মান ডুবোজাহাজ সেগুলি আক্রমণ করিতে

* *George Washington's Farewell Address, 1797.* Quoted in Mahajan's *International Politics.* p. 211.

দ্বিধা করিবে না। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ অবশ্য "পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাহাতে রক্ষা পায় এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয়" সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিতেছে একথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ এক অভূত-পূর্ব নৈতিক প্রাধান্য অর্জন করেন। তাঁহার সনির্বন্ধতায় ভার্সাই-এর চুক্তিতে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তিপত্র (Covenant) সন্নিবিষ্ট হয়। তাঁহার আদর্শবাদী চৌদ্দ দফা শর্ত ও চারি নীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন সেনেট (Senate) ভার্সাই-এর চুক্তি তথা লীগ-চুক্তিপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করিয়া মার্কিন সরকার তথা মার্কিন জাতির আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বাড়াইতে অসম্মত হইলে লীগের গুরুত্ব প্রথমেই কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইতে অসম্মতির পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের অনেকেই প্যারিসের শান্তি-চুক্তির শর্তাদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কেহ কেহ জার্মানির উপর ভার্সাই-এর চুক্তি চাপাইয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়মূলক হইয়াছিল বলিয়া মনে করিলেন। আর অনেকে মনে করিলেন যে, যুদ্ধের ফলে 'যাবতীয়' সুযোগ-সুবিধা একা গ্রেট ব্রিটেনই আদায় করিয়া লইয়াছিল। আয়র্লণ্ডের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন মার্কিন নাগরিকগণ আয়র্লণ্ডের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে উপেক্ষিত হইয়াছিল মনে করিলেন। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌কেও তাঁহারা এজন্য দায়ী করিতে দ্বিধা করিলেন না। অনুরূপ গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি দেশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মার্কিন নাগরিকগণও এই দুই দেশ প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে যথাযোগ্য ব্যবহার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে নাই বলিয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ প্যারিসের শান্তি-চুক্তি ও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক অর্থাৎ রিপাব্লিকান দলের কোন প্রতিনিধিকে প্যারিসের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

মার্কিন সরকার কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এ যোগদান না করিবার কারণ

শান্তি সম্মেলনে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া রিপাব্‌লিকানগণ প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের শাসনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। উইল্‌সনের আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতিও তখন সর্বসাধারণ্যে সমর্থিত ছিল না। ফলে, তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। যুদ্ধোত্তরকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের অসন্তোষ প্রভৃতি মার্কিন জাতিকে উইল্‌সন্‌-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন Clayton Anti-Trust Law, Federal Reserve Act, Underwood Tariff প্রভৃতি আইনের বিরোধিতা এবং যুদ্ধকালে উইল্‌সন্‌ সরকার কর্তৃক অত্যধিক ক্ষমতা প্রয়োগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া উইল্‌সনের চেষ্টায় গৃহীত লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর চুক্তিপত্র মার্কিন সেনেট অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিল।

ল্যাটিন আমেরিকায় লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব যাহাতে বিস্তৃত না হইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই চেষ্টাও চালাইল। লীগ-চুক্তিপত্রে ২১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে আঞ্চলিক রাষ্ট্র-জোট গঠন করা লীগ চুক্তিপত্রের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না। মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ দ্বারা দক্ষিণ-আমেরিকার উপর মার্কিন অভিভাবকত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যেই ২১ ধারা সংযোজিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের বা নীতির কোন তারতম্য হইল না। মন্‌রো-নীতি ল্যাটিন আমেরিকা—অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহাতে বিস্তারলাভ করিতে না পারে সেইজন্য ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু মন্‌রো-নীতি ঘোষণা (১৮২৩ খ্রীঃ) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই একটি বিশাল রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্‌রো-নীতির ব্যাখ্যারও এমন পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল যে, এই নীতি ল্যাটিন আমেরিকার নিরাপত্তার কারণ না হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকার শোষণ এবং প্রাধান্যের অজুহাত হইয়া দাঁড়াইল।* মন্‌রো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকায় লীগ-অব ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরোধিতা

মন্‌রো-নীতির রূপান্তর

* The Monroe Doctrine "......was intended to preserve the young weak republics of America from interference or exploitation by any of the Great Powers which, at that date, were to be found exclusively in Europe. This purpose it served admirably; but the irony of fate had now raised the United States themselves to the (Contd.)

নৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূত্র এবং উপায়ে পরিণত হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ না হইলেও দুর্বল রাষ্ট্রগুলির—বিশেষত মধ্য-আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা

এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দক্ষিণ-আমেরিকাস্থ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল। এজন্য এই সকল রাষ্ট্র লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ করিতে চাহিল। একমাত্র মেক্সিকো ভিন্ন ল্যাটিন আমেরিকাস্থ সকল রাষ্ট্রই লীগের সদস্য হইল। মেক্সিকো সরকার তখনও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বলিয়া উহা লীগের সদস্যপদলাভে সমর্থ হয় নাই। ল্যাটিন আমেরিকা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃতির আশঙ্কা করিতেছিল তাহা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে চিলি, বোলিভিয়া ও পেরু নামক রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাক্‌না (Tacna) ও আরিকা (Arica) নামক স্থান দুইটি লইয়া পেরু, বোলিভিয়া ও চিলির মধ্যে বিবাদ শুরু হইলে পেরু ও বোলিভিয়া বিষয়টি লীগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেরুর উপর এমনভাবে চাপ দিতে লাগিল যে, পেরু শেষ পর্যন্ত অভিযোগটি লীগ কাউন্সিল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইল। বোলিভিয়ার অভিযোগ ছিল অন্যরূপ। কিন্তু লীগ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটি এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পানামা লীগ-অব ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট কোস্টারিকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল। এইভাবে লীগ ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আস্থা হারাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকার লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব বিস্তৃতির বাধা সৃষ্টি

চিলি-পেরু-বোলিভিয়া ঘটনা

কোষ্টারিকা-পানামা ঘটনা

---

position of a Great Power which was inclined to interpret the doctrine not as the palladium of the Latin American Republics, but as conferring upon herself a monopoly of exploitation and control." Hardy, p. 198.

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকায় প্রসারিত হইবার পরিপন্থী, ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। লীগ ইওরোপীয় মহাদেশের যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা মাত্র এই ধারণা ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বভাবতই জন্মিল। ফলে, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহ যেমন কিউবা, হাইটি ও ক্যারিবিয়ান প্রজাতন্ত্রসমূহ লীগের সদস্যপদভুক্ত রহিল। ল্যাটিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিই লীগের সদস্যপদভুক্ত হইল না বা রহিল না।

ল্যাটিন আমেরিকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির লীগ ত্যাগ বা লীগের সদস্যপদ-ভুক্তিতে অসম্মতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের প্রভাব যাহাতে মনরো-নীতির প্রয়োগ দ্বারা অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরোধী না হইতে পারে সে বিষয়ে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মধ্যস্থতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে, এইভাবে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। কোনপ্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আন্ত-র্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণ করা ভিন্ন সাহায্য-সহায়তা দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত একথাও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলেন। ইহার পর লীগের বহু সংখ্যক অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দর্শক হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই সকল দর্শক প্রতিনিধি মার্কিন সরকারের অভিমতও লীগের সদস্যদের নিকট ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ২২টি অধিববেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সেনেট কতকগুলি বিশেষ শর্তাধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে অংশগ্রহণে রাজী হইল। কিন্তু লীগের সদস্য না হইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার লাভের প্রস্তাব লীগ কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও অর্থসাহায্য দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃত হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক লীগের অধিবেশনে আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ

যুদ্ধোত্তর ইওরোপের অর্থনৈতিক অবনতির পরোক্ষ চাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অল্প-বিস্তর অনুভূত হইতে থাকিলে তদানীন্তন মার্কিন সেক্রেটারী হিউজেস্‌ জার্মানির যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার ক্ষমতা কতদূর আছে সে বিষয়ে পুন-

বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবক্রমেই ক্ষতি-পূরণ কমিশন ডাওয়েজ কমিটি (Dawes Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া জার্মানির ক্ষতিপূরণ দিবার সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় এবং জার্মানির মুদ্রাব্যবস্থাকে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশের দায়িত্ব দেওয়া হইল। ডাওয়েজ কমিটি জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে যে প্রকল্প প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্দশার বাস্তব পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইয়ং কমিটি রচিত ইয়ং পরিকল্পনা দ্বারাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। জার্মানির ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানের উপরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। ফলে, এই সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ইওরোপের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। জার্মানির ক্ষতিপূরণ আদায় দিবার উপায় হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট অর্থ জার্মানিকে ঋণদান করিয়াছিল। (ডাওয়েজ পরিকল্পনা ও ইয়ং পরিকল্পনা ৬৪, ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জার্মানি ও ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য দান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি অর্থনৈতিক দিক দিয়া খুবই শক্তিশালী ছিল। সমগ্র ইওরোপের মহাজন দেশ বলিতে দুই-তিনটি দেশকেই বুঝাইত কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের মহাজন অর্থাৎ উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে বেসরকারীভাবে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র মোট ৫০০ শত কোটি ডলার ঋণ দান করিয়াছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১১০০ কোটি ডলার। ইহা ভিন্ন ১৯২৪-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯০০ কোটি ডলারের সামগ্রী ইওরোপে প্রেরণ করিয়াছিল। এইসব হিসাব হইতে ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ

(১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাটিন আমেরিকার উপর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের নীতি পরিবর্তিত হইল। মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ-নীতি পরিত্যাগ করাই এই সকল অঞ্চল হইতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের একমাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। ফলে নিকারাগুয়া, হাইটি প্রভৃতির উপর হইতে মার্কিন আধিপত্যের অবসান ঘটিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সমগ্র পৃথিবী এবং বিশেষভাবে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি সৎ-প্রতিবেশী নীতি (Good Neighbour Policy) অনুসরণ করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের মূল সূত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নীতির সুফল মেক্সিকো কর্তৃক ব্রিটিশ-মার্কিন মূলধনে গঠিত তেলের কোম্পানিগুলির জাতীয়করণের কালে পরিলক্ষিত হয়। মেক্সিকো তেল কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ শুরু করিলে স্বভাবতই মার্কিন জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল। কিন্তু 'সৎ-প্রতিবেশী নীতি'র প্রয়োগের ফলে এইরূপ স্বার্থ-নাশের ক্ষেত্রেও মেক্সিকোর সহিত কোন বিবাদ বাধিল না। উভয় দেশের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া মার্কিন কোম্পানিগুলি কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইবে তাহা স্থির করিলেন। বোলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের (Bolivia & Paraguay) মধ্যে সীমারেখা-সংক্রান্ত বিবাদও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মীমাংসা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নীতি অনুসরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার সহিত স্থায়ী সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল ল্যাটিন আমেরিকার মনরো-নীতির ভীতি দূর করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র মার্কিন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উপায় হিসাবে মনরো-নীতিকে Pan-Americanism-এ রূপান্তরিত করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Pan-American Conference ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বুয়েনোস্ এইরিস কন্‌ফারেন্স' (Buenos Aires Conference) বৃহত্তর মার্কিন ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিল। দুই বৎসর পর (১৯৩৮ খ্রীঃ) 'লিমা ঘোষণা' (Declaration of Lima) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্যের শপথ গ্রহণ করিল। এইভাবে মনরো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের রক্ষাকবচে পরিণত হইল।

ল্যাটিন আমেরিকার উপর মার্কিন অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগ পরিত্যক্ত

"সৎ-প্রতিবেশী নীতি" (Good Neighbour Policy)

প্যান-আমেরিকানিজম্

এদিকে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত ব্রিয়াঁ-কেলগ-চুক্তি-ও (Briand-Kellogg Pact) আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সহিত যুগ্মভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ তখনও আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল সন্দেহ নাই। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ইওরোপীয় দেশসমূহ যে অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কেবল নামমাত্রই আদায় করা সম্ভব হইল। এজন্য ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Johnson Debt Default Act পাস করিয়া আমেরিকা ইওরোপীয় কোন দেশ কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার পর একমাত্র ফিন্‌ল্যাণ্ড ভিন্ন অপর কোন দেশ হইতে ঋণ শোধের কোন কিস্তি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদায় করিতে পারিল না। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িল। রুজ্‌ভেল্ট ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অন্যতম সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ-এর সদস্যপদভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের অন্তর্মুখী হইয়া পড়িবার ফলে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিচারালয় (World Court)-এর সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাব সেনেট কর্তৃক গৃহীত হইল না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা, জাপান কর্তৃক ওয়াশিংটন কনফারেন্সের (Washington Conference) শর্ত অমান্য করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমপরিমাণ নৌ-শক্তি গঠন করিবার দাবি এবং শেষ পর্যন্ত পূর্বেকার যাবতীয় প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া জাপান কর্তৃক সামরিক ও নৌ-শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট্‌কে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যুদ্ধ-ঋণ অনাদায়ের কারণে এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধনীতির বিরোধী বহু সংখ্যক উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশনের ফলে রুজ্‌ভেল্ট্‌-এর চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন-জাতি নিরপেক্ষতার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। বস্তুত ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে নির্লিপ্ততার নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্মুখী নীতির পশ্চাতে মূল কারণ

ইওরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে মার্কিন নাগরিকদের মনোভাব তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি যখন আবিসিনিয়া দখল করে তখনও আমেরিকা ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সেগুলি অনুসরণ করিয়া চলিল। এই সকল নিরপেক্ষতামূলক আইন অনুসারে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রকে কোন সমর উপকরণ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিতে বা মার্কিন জাহাজে করিয়া কোন সমর উপকরণ যুদ্ধরত দেশে প্রেরণে সাহায্য করা নিষিদ্ধ করিতে, কোন সামগ্রী নগদমূল্য ভিন্ন এবং ক্রেতা দেশের জাহাজ ভিন্ন অন্য কোনভাবে বিক্রয় করা বা চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। এই শেষোক্ত শর্তটি 'Cash and carry' নিয়ম নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্দরে যুদ্ধরত দেশের জাহাজ নোঙ্গর করাও প্রেসিডেণ্ট নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু নাৎসি জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাফল্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই দুইটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন্ রুজ্‌ভেল্ট ততই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষতার আইনগুলি বাতিল করা হইল। হিট্‌লারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর এই কথা বিবেচনা করিয়া রুজ্‌ভেল্ট আমেরিকাকে সামরিক দিক্ দিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডকে তথা অক্ষ-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Lease & Lend Bill) প্রণয়ন করিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র, বিমান ও নৌবাহিনীর উপযোগী যাবতীয় কিছু প্রস্তুত করা পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রান্ত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।*

ইওরোপীয় রাজনীতি-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স আহ্বান ও অপরাপর নৌ-চুক্তিতে যোগদানের বিবরণ ১১৭-১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

মধ্য-প্রাচ্য : আরব জাতীয়তাবাদ : প্যালেস্টাইন সমস্যা

(The Middle East : Arab Nationalism : Palestine Problem)

মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East) : ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর হইতে ভারতবর্ষের (বর্তমানে পাকিস্তানের) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত যাবতীয় দেশ মধ্য-প্রাচ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এই নামের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। মিশর উপরি-উক্ত সংজ্ঞার আওতায় না আসিলেও মধ্য-প্রাচ্য বলিতে মিশরকেও যোগ করা হইয়া থাকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে (১৯১৯—১৯৩৯) এই সকল দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশগুলি কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, আরব জাতির তীব্র জাতীয়তাবোধ ও ইহুদিদিগের (Zionist) পুনর্বাসন সমস্যা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যাগুলিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

মধ্য-প্রাচ্য নামকরণ

তুরস্ক (Turkey) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রশক্তি হিসাবে তুরস্কের পরাজয় ঘটিলে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেভ্‌রে (Sevres)-এর সন্ধিদ্বারা মিত্রপক্ষ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল-সমন্বিত এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই চুক্তি কার্যকরী করা হইলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ নিজ দুর্বলতাহেতু হয়ত এই চুক্তি অনুমোদন করিতে দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই মুস্তাফা কামাল নামে জনৈক দেশপ্রেমিক নেতার অভ্যুত্থান ঘটিলে মিত্রশক্তিবর্গ (The Allies) তুরস্কের উপর সেভ্‌রে-এর চুক্তি চাপাইতে পারিল না।

সেভ্‌রে-এর সন্ধি ও তুরস্ক সাম্রাজ্য

মুস্তাফা কামালের ন্যায় সামরিক প্রতিভা ও দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সেভ্‌রে-এর সন্ধির মত অপমানসূচক ও সর্বনাশাত্মক চুক্তি সমর্থন করা অসম্ভব ছিল। তিনি তুর্কী সরকারকে এই চুক্তি গ্রহণে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তুর্কী সরকারের আদেশে তাঁহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হইল।

মুস্তাফা কামালের জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

এই সময় তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন
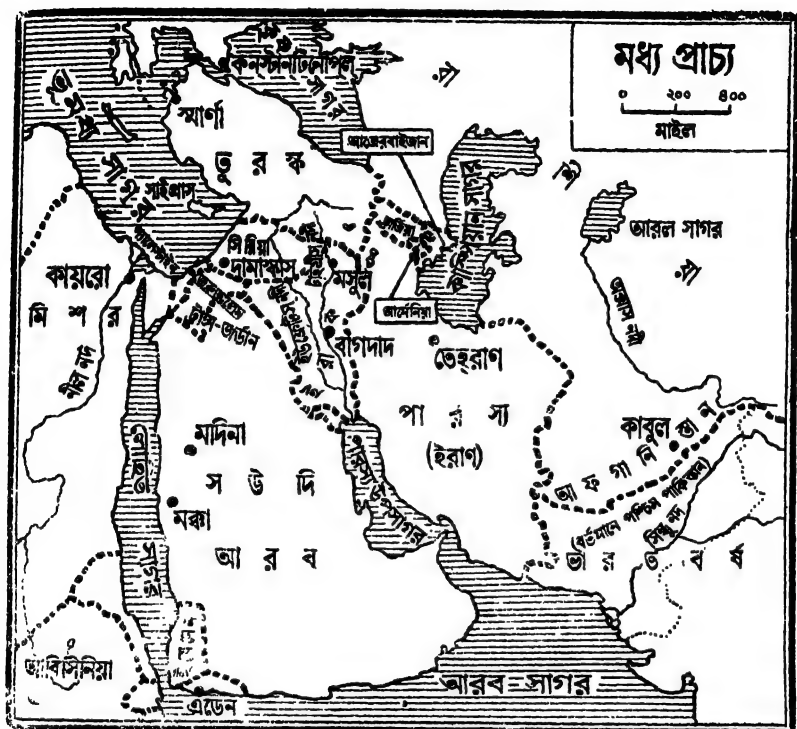
করেন। এই দলের সাহায্যে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। কামাল তুরস্কের সর্বত্র এই জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাছে ইতালি আনাটোলিয়া অধিকার করিয়া লয় সেজন্য কামাল গ্রীসকে স্মার্ণা দখল করিয়া লইতে উৎসাহিত করেন। গ্রীক সেনাবাহিনী এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হইয়া স্মার্ণা দখল করিবার কালে নানাপ্রকার বর্বরোচিত অত্যাচার করিল। এই অত্যাচার কামাল আতাতুর্ককে সহজেই সমগ্র তুরস্কের দেশাত্মবোধসম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার সুযোগ দিল। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এরজুরাম (Erzurum) নামক স্থানে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলন

গ্রীস কর্তৃক স্মার্ণা দখল—কামালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি

দুই মাস পর পুনরায় সিবাস (Sivas) নামক স্থানে দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া এরজুরাম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিল। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তুর্কী পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেণ্ট এরজুরাম ও সিবাস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয়টি শর্তসম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল এবং এই শর্তগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্তগুলির প্রথম তিনটি দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে যে সকল স্থান মিত্রপক্ষ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সেই সকল স্থানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কনস্টান্‌টিনোপলের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হইল, অবশ্য দার্দানেলিস্‌ ও বস্‌ফোরাস্‌ প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পঞ্চম শর্তে তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ষষ্ঠ শর্তে বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা চলিবে না, এই কথা বলা হইল। এই শর্তটি যে তুরস্কের স্বাধীন দেশ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই কথাও বলা হইল।

তুর্কী পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৯১৯)

মিত্রপক্ষের সহিত ছয়টি শর্তসম্বলিত চুক্তি গৃহীত

তুর্কী পার্লামেণ্ট উপরি-উক্ত চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করিলে ব্রিটিশ জেনারেল আর্চিবল্ড্‌ মিল্‌ন (Archibald Milne)-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনী কন্‌স্টান্‌টিনোপলে উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করিল। ইঁহাদের অনেককে আবার দেশের বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকে কন্‌স্টান্‌টিনোপল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন শুরু করিলেন। কন্‌স্টান্‌টিনোপলে জাতীয়তাবাদী সদস্য ভিন্ন অপরাপর সদস্যদের লইয়া তুর্কী সুলতানের অধীন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদ্বারা সংরক্ষিত পুরাতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট ও কন্‌স্টান্‌টিনোপল পার্লামেণ্ট নামে দুইটি

ব্রিটিশ সৈন্যের কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল দখল

এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট

পার্লামেণ্ট যেমন অধিবেশনে বসিল, তেমনি তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ব্রিটিশ জেনারেল আর্চিবল্ড্ মিল্‌ন কর্তৃক তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ এবং জাতীয় আন্দোলন দমনের চেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপই তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সুলতানের অধীন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল দ্বারা সমর্থিত জনসাধারণের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ লোকচক্ষুর অন্তরালে তীব্র বেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিল এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিল (১৯২০)। পর বৎসর (১৯২১) এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট 'মূল গণতন্ত্রের আইন' (Law of Fundamental Organisation) নামে এক আইন পাস করিয়া তুর্কী শাসনতন্ত্র মূলত কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিল। এই আইনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পরবর্তী সময়ে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা তুরস্ক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এঙ্গোরা পার্লামেণ্টকেই তুর্কী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল চারি বৎসর। আঠারো বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।* রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একজন প্রেসিডেণ্ট ও একটি দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভার হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি লইয়া একটি স্বাধীন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তুরস্ক দুই ভাগে বিভক্ত

তুর্কী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কামাল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্‌স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুই স্থান তুরস্কের সহিত সংযুক্ত করিলেন। সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলি দখলের জন্য গ্রীস তুরস্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ স্বার্থের কারণে গ্রীসকে কোনপ্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন সময় (১৯২১) লণ্ডনে এক বৈঠকে সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু

বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কামালের যুদ্ধ

* ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়।

গ্রীস ইহা মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে (মে, ১৯২১)। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরস্কের খুবই সুবিধা হইল।

সাখারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়

তুরস্ক আক্রমণ করিয়া গ্রীস প্রথমে সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু সাখারিয়া (Sakharia)-এর যুদ্ধে কামালের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বৎসর তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। গ্রীকবাহিনী বিতাড়নকালে ব্রিটিশবাহিনীর সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কামাল ফ্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং একমাত্র ব্রিটিশ শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত এক নূতন যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

তুর্কী-ফরাসী-ইতালীয় মৈত্রী
ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতির নূতন চুক্তি সম্পাদন

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জাপান, গ্রীস ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ ল্যাসেন (Lausanne) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাসেনের সন্ধি দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ছয়টি শর্তসম্বলিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইল। ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট রাজ্য ইরাক ও তুরস্কের সীমায় মসুল (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা তখন অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। এইভাবে একমাত্র মুস্তাফা কামালের একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ ও অক্লান্ত শ্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

ল্যাসেন-এর সন্ধি (১৯২৩)

ইতিমধ্যে (১৯২২, ১লা নভেম্বর) তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং পরবৎসর (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩) তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মুস্তাফা কামাল তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত: কামাল সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

এইভাবে তুরস্ক সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদের অগ্রগতিহীন অকর্মণ্য শাসনব্যবস্থা এবং

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের উপর কঠোর শর্তসম্বলিত সেভ্রে-এর চুক্তি চাপাইবার চেষ্টার ফলে স্বভাবতই শিক্ষিত তুর্কী যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল। এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সুযোগেই কামাল পাশা তথা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে নূতন তুরস্কের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল।

নূতন তুরস্কের উত্থান

ল্যসেন-এর সন্ধি (Treaty of Lausanne): এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও আড্রিয়ানোপল পুনরায় লাভ করিল। গ্রীসের আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কারাগাচ্ (Karagach) রেলনির্মাণ-কেন্দ্র তুরস্ক দখল করিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপল্ তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বসফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ শান্তি বা যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শত্রুশক্তির জাহাজ যুদ্ধকালে এই দুই প্রণালী ব্যবহার করিতে পারিবে না স্থির হইল। ইজিয়ান্ সাগরস্থ ইম্‌ব্রস্ (Imbros), টেনেডস্ (Tenedos) ও র‍্যাবিট দ্বীপপুঞ্জ (Rabit Islands) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর দ্বীপগুলি ইতালি ও গ্রীসকে দেওয়া হইল। সীরিয়ার সীমা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ফরাসী চুক্তির শর্তানুযায়ী অনুমোদিত হইল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সীরিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্ক যাবতীয় দাবি ত্যাগ করিল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং তুর্কী সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এইভাবে সেভ্রে-এর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

শর্তাদি

তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্ক (Foreign Relations of Turkey): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলি সম্পর্কে তুরস্ক স্বভাবতই সন্দিহান হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় রুশ-তুরস্ক মৈত্রীতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কমিউনিজমের প্রভাব তুরস্কে বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে তুরস্ক সরকার ক্রমে রুশমৈত্রীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল রহিলেন না। অপর দিকে পাশ্চাত্য দেশগুলির তুরস্কের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, ফরাসী জাহাজ

পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি তুরস্কের সন্দেহ: রুশমৈত্রী

'লোটাস' (Lotus) তুর্কী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরস্ককে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুরস্কের মৈত্রীর পটভূমিকা রচনা করিল। ফলে ইতালি-তুরস্ক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সীরিয়ার সীমা-সংক্রান্ত তুরস্ক-ফরাসী দ্বন্দ্ব তুরস্কের সপক্ষে মীমাংসিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি সন্দেহ দূর হইলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্য হইল। আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ল্যাসেন-এর সন্ধির শর্তগুলির কতক পরিবর্তন দাবি করিল। ঐ বৎসর মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাসের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের সময় লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর কর্তৃত্বাধীনে যে সকল শক্তি যুদ্ধ করিবে কেবলমাত্র সেগুলির নিকট এই দুই প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি (Eastern Pact) দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বলকান আঁতাত নামে অপর এক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুই চুক্তির দ্বারা তুরস্কের শক্তি এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদ্‌পদ তুরস্ক রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ইতালি-তুরস্ক মৈত্রী

তুরস্ক কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদ গ্রহণ

দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর সামরিক নিরাপত্তা বিধান

বলকান আঁতাত, পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু (১৯৩৮)

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনমু আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূলত কামাল আতাতুর্কের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেও কামালের আমলে যে-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, সেদিকেও তিনি মনোযোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না। পররাষ্ট্র-সম্পর্কে তাঁহার নীতি ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি স্বাদেশিকতাপূর্ণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টিতে আর 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) রহিল না। তুরস্কের মৈত্রী তখন সকলের নিকটই কাম্য হইয়া উঠিল।

নূতন প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনমু

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত পরস্পর সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism) : মধ্য-প্রাচ্যের আরবীয় দেশ ইরাক, সিরিয়া, আরব ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীনে থাকিয়াও আরবজাতি তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয় নাই। তুর্কী শাসনের প্রতি তাহারা যেমন ছিল বিদ্বেষভাবাপন্ন তেমনি তুর্কী সুলতানের 'খলিফা'-পদ গ্রহণের ফলে ধর্মের ব্যাপারে তাহারা ছিল তুর্কী জাতি ও সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী। মক্কার আরব বংশোদ্ভূত হুসেনকে তাহারা মোহাম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং তুর্কী সুলতানের খলিফাপদ গ্রহণ ন্যায় এবং ধর্মের দিক দিয়া তাহারা সমর্থনযোগ্য মনে করিত না।

আরব-তুরস্ক বিদ্বেষ

আরব ও তুর্কীদের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব ব্রিটিশ রাজনীতির ফলে আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে আরবদের জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ কর্মচারীকে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইল; ইহাদের মধ্যে কর্নেল লরেন্স যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হইলেও আরবদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ ক্রমেই এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইতে চলিল। কর্নেল লরেন্স্ও আরবদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হুসেনের পুত্র ফৈসল-এর সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুর্কী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার হুসেনের মাধ্যমে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন (১৯১৬)। হুসেনের অধীনে হেজ্জাজ প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র আরবজাতির মধ্যে এক তীব্র জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিলে হুসেনের পুত্র ফৈসল কর্নেল লরেন্সের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করিলেন (১৯১৮)। এইভাবে আরবদের জাতীয়তাবাদ যখন আরব-স্বাধীনতার পথে ধাবিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের আরব জাতীয়তাবাদের সহায়তা

হুসেনের বিদ্রোহ

আরবীয় দেশগুলির 'ম্যাণ্ডেট্'-এ পরিণতি

হইতেছিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তি আরবদের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া আরব দেশগুলিকে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandates)-এ পরিণত করিল। ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় হুসেনের পুত্র ফৈসলকে ইরাকের রাজা এবং অপর পুত্র আবদুল্লাকে ট্রান্স্‌জর্ডানের আমীর পদে স্থাপন করা হইল। হুসেনকে হেজ্জাজের স্বাধীন আরব রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। তথাপি প্যালেস্টাইন ও ইরাক ব্রিটিশের অধীন এবং সিরিয়া ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করায় আরবদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। আরবদের অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ হইতে ক্রমে আরব-ব্রিটিশ, আরব-ফরাসী গোলযোগ উপস্থিত হইল।* ঐ সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও আক্রমণ চলিল।

ফৈসলকে ইরাক, আবদুল্লাকে ট্রান্স্‌জর্ডান এবং হুসেনকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া স্বীকৃতি

অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ ইংরেজ ও ফরাসী বিদ্বেষে পরিণত

ইরাক (Iraq)ঃ ইরাকের রাজা ফৈসল ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও সুচতুর কূটনৈতিক। তিনি ইরাকের আরবদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ চুক্তি দ্বারা ইরাকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে একটি পরস্পর সামরিক সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ইরাকে ব্রিটিশ সরকারকে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইল।

ইরাকের স্বাধীনতা লাভ (১৯৩২)

ট্রান্স্‌জর্ডান (Transjordan)ঃ ট্রান্স্‌জর্ডান-এর আমীর আবদুল্লা ফৈসলের ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে, তিনি ক্রমেই ব্রিটিশ সাহায্যের উপর অধিকতরভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। স্বভাবতই তাঁহার রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন খুব মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রান্স্‌জর্ডানের ব্রিটিশ নির্ভরশীলতা

---

* "(But) Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discomfiture of the Turk on many occasions after the war brought Arab peoples into conflict both with the Mandatory powers and with non-Arab minorities living in their midst."—Vide E. H. Carr, p. 234.

হেজ্জাজ : সাউদি আরব (Hejjaz : Saudi Arabia) : হেজ্জাজের রাজা হুসেন প্রথম দিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সহকারেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহারই এক পুত্র ফৈসল ছিলেন ইরাকের রাজা, অপর পুত্র আবদুল্লা ছিলেন ট্রান্‌স্‌জর্ডানের আমীর। হুসেন স্বয়ং 'খলিফা' উপাধি ধারণ করিয়া মুসলমান জগতের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তায় তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের একপ্রকার তাঁবেদার হইয়া পড়িলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ আরবজাতি ইহা ক্ষমা করিল না। হুসেন ক্রমেই জনগণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে ইব্‌ন সউদ নামে একজন ওহাবি-নেতা হুসেনকে পদচ্যুত করিয়া হেজ্জাজের রাজা হইলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন সউদ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হুসেন ইতিপূর্বেই জেরুজালেমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুসেনের রাজত্বকাল : জনসাধারণের অশ্রদ্ধা

ইব্‌ন সউদ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ (১৯২৫)

রাজা ইব্‌ন সউদ পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলিকে পরাজিত করিয়া আরব উপদ্বীপের সমগ্র স্থানের উপরই নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারেই হেজ্জাজের নাম হইল সাউদি আরব (Saudi Arabia)। রাজা ইব্‌ন সউদ খুব ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তাঁহার সামরিক ক্ষমতার বলে যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার সুশাসনে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা দূর হইয়া আরব রাজ্যে এক প্রগতিশীল সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন সউদ নিজ রাজ্যে পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশীদের বিশেষ সুবিধা যাহা হুসেন দান করিয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিয়া আরবদের মধ্যে এক নব-জাগরণ আনয়ন করেন। তিনি ইরাক ও ট্রান্‌স্‌জর্ডানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বংশধরই বর্তমানে সাউদি আরবে রাজত্ব করিতেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাউদি আরব, ট্রান্‌স্‌জর্ডান, ইরাক, মিশর, লেবানন ও ইয়েমেন প্রভৃতি আরব জাতি-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে 'আরব লীগ' (The Arab League) নামে এক মিত্রসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই মিত্রসঙ্ঘের মূল শর্ত

সাউদি আরবের জন্ম

ইব্‌ন সউদের শাসন-দক্ষতা

আরব লীগ (১৯৪৫)

হইল এই যে, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে।

প্যালেস্টাইন সমস্যা (Palestine Problem) : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-সম্মেলন যখন প্যালেস্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপন করে তখন উহার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরবজাতির লোক ছিল। মোট সাত লক্ষ ছাপান্ন হাজার অধিবাসীর অতি ক্ষুদ্র সংখ্যা—মাত্র তিরাশী হাজার তখন ছিল ইহুদি। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর্থার বেলফার (Arthur Balfour) ইহুদিদের সপক্ষে টানিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন এবং ইহুদি ভিন্ন অপরাপর সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হইবে না, একথাও ঘোষণা করা হইয়াছিল। অপর দিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের সহায়তা লাভের জন্য ম্যাকম্যাহন (MacMahon) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আরব-নেতা হেজ্জাজের হুসেনকে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ইহুদিগণের প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান ও তাহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি আরবদের নিকট স্বভাবতই পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থার দ্বারা আরবদিগকে স্বাধীনতার বদলে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল মাত্র। অবশ্য 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপিত হইলেও অদূর-ভবিষ্যতে আরবদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দানের ফলে এক অতিশয় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিস-সম্মেলন প্যালেস্টাইনকে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করিবার কালে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবার এবং সেখানকার অপরাপর বাসিন্দাদের ধর্মনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তত্ত্বাবধায়ক দেশ (Mandatory Power) হিসাবে প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ইহুদি সেখানে বসবাসের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ

ইহুদি ও আরবদের নিকট ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতিদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন

হাই কমিশনার স্যার হারবার্ট স্যামুয়েল (Herbert Samuel) প্যালেস্টাইনে এক নূতন শাসনব্যবস্থা চালু করিতে চাহিলেন। ইহাতে একজন হাই কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কার্যনির্বাহক সভা (Executive Council) ও ২২ জন প্রতিনিধি ও হাই কমিশনারকে লইয়া গঠিত একটি আইনসভা (Legislative Council) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই ২২ জন প্রতিনিধির ১২ জন সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু এই ১২ জনের মধ্যে ৮ জন মুসলমান, ২ জন আরব খ্রীষ্টান ও ২ জন ইহুদি প্রতিনিধি থাকিবেন। অবশিষ্ট ১০ জন হাই কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। আরবগণ এই সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে স্বীকৃত না হইলে স্যার স্যামুয়েল একটি উপদেষ্টা সমিতির সাহায্যে প্যালেস্টাইনের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

ব্রিটিশ হাই কমিশনার কর্তৃক নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা

অপর দিকে হেজ্জাজের হুসেনের নিকট আরব সহায়তার বিনিময়ে আরব স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দান করিয়াছিলেন, আরব-অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনও স্বভাবতই সেই সকল সুযোগ প্রত্যাশা করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলীতে সন্নিবিষ্ট স্বায়ত্তশাসন অধিকারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই প্যালেস্টাইনের আরবগণ স্বাধীনতার (Self-determination) আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য হুসেনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ম্যাক্‌ম্যাহন (Mac Mahon) যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহাতে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ ছিল না এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন এড়াইয়া চলিলেন।

আরবদের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট

যাহা হউক, ইহুদিদের দলবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইন আগমনের ফলে আরব জাতীয়তা-বোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। আরবগণ নীতির দিক দিয়াই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের দাবি স্বীকার করিত না। ইহা ভিন্ন বিত্তশালী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইহুদিগণকে প্যালেস্টাইনে জমি কিনিবার অধিকার দান করিবার ফলে আরবগণ ক্রমেই প্যালেস্টাইনের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ইহুদিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র আরবদের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইতেছিল। আরবদের কমলালেবুর চাষ

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ

ও অপরাপর ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমেই ইহুদিদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। আরবগণ নিজ দেশেই বিদেশীতে পরিণত হইতে থাকিলে তাহারা ইহুদিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং বিশেষভাবে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদিদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হইল। আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতে অনেক সময়েই সক্ষম হইত না। ফলে, উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা হইত খুব বেশি। এই কারণে প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্যে আরব-ইহুদি হানাহানি বন্ধ করিতে হইত।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের সংঘর্ষে বহু সংখ্যক ইহুদি প্রাণ হারাইল। ব্রিটিশ সরকার দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করিয়া আরবগণকে দমন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও মূল পরিস্থিতির বা মূল সমস্যার কোন পরিবর্তন ঘটিল না, কারণ ইহুদিগণের প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসন আরবগণ নীতির দিক দিয়াই গ্রহণ করে নাই। ফলে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যখন প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল তখন আরবগণ আরও মরিয়া হইয়া উঠিল। প্রায় সেই সময়ে (১৯৩০) World Zionist Organisation ও Jewish Agency for Palestine—এই দুইটি ইহুদি সহায়ক সংস্থার সহিত ব্রিটিশ সরকারের মতবিরোধ দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া স্যার জন হোপ সিম্প্‌সন (Simpson)-এর সভাপতিত্বে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে ইহুদি পুনর্বাসন স্থগিত

এই কমিশনকে প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। এই কমিশনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন-নীতির কতক পরিবর্তন সাধন করিলেন। বিত্তশালী ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ইহুদিদের সহিত প্রতিযোগিতায় আরবগণ যে স্বভাবতই পরাজিত হইতেছে একথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট সুস্পষ্টভাবে এই রিপোর্টে বলা হইল।* অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে আরবগণ উৎখাত হইতেছে তাহারও উল্লেখ এই রিপোর্টে ছিল। ইহুদি ও আরব নেতৃবর্গের সহিত সংযুক্তভাবে ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার আপস-মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেই আরব-ইহুদি সংঘর্ষের অবসান ঘটিতে পারে এই অভিমতও রিপোর্টে ব্যক্ত

সিম্প্‌সন কমিশন ও উহার রিপোর্ট

---

* Vide Langsam, p. 397.

করা হইল। ইহুদিগণ তাহাদের জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করা বা অন্য যে-কোন প্রকারে আরবদিগকে অর্থের বিনিময়ে কাজে খাটাইতে রাজী ছিল না। সুতরাং সিম্প্‌সন কমিশনের রিপোর্টের পরও ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু ইহার ফলে Zionist-দের প্রধান সমর্থক ডক্টর উইজম্যান্ (Dr. Weizmann)-এর নেতৃত্বে যে World Zionist Organisation ও Jewish Agency স্থাপিত হইয়াছিল সেই সংস্থা দুইটির সহিত ব্রিটিশ সরকারের মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিল। ডক্টর উইজম্যান্ এই সংস্থার সভাপতিপদ ত্যাগ করিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্যালেস্টাইন-নীতি ইহুদিদের স্বার্থবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিযোগ করিলেন। ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন একথাও বলা হইল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড (MacDonald) স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, (১) ব্রিটিশ সরকারের নীতি হইল প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বসবাসের সুযোগ দেওয়া—প্যালেস্টাইনকে ইহুদিস্থানে পরিণত করা নহে। (২) ইহা ভিন্ন সংখ্যাগুরু আরবজাতির স্বার্থরক্ষা করাও ব্রিটিশ সরকারের নীতি। (৩) সর্বোপরি, ক্রমে 'ম্যাণ্ডেট্' দেশ প্যালেস্টাইনকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তোলাও ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ২৫০০ ডলার মূলধন খাটাইবার আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিবার অবাধ অধিকার দান করিলেন এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদি শ্রমিক প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে, বিত্তসম্পন্ন ইহুদিদের আগমনে প্যালেস্টাইনে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও শিল্পোন্নয়ন ঘটিল। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে প্যালেস্টাইন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিল। এদিকে জার্মানিতে হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ও ইহুদি বিতাড়ন প্যালেস্টাইনে ইহুদি উদ্‌বাস্তুদের সংখ্যা অসাধারণভাবে বাড়াইয়া দিলে আরব নেতৃবর্গ প্রমাদ গণিলেন। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার তুলনায় প্রায় চতুর্গুণে দাঁড়াইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতীয়তাবাদ, Zionism বা ইহুদি

ব্রিটিশ সরকারের সহিত Zionist সংস্থার মনোমালিন্য

ব্রিটিশ সরকারের প্যালেস্টাইন-নীতির তিনটি মূলসূত্র

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রবেশাধিকারের পুনঃপ্রবর্তন

পুনর্বাসন আন্দোলন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ—এই তিনের দ্বন্দ্ব শুরু হইলে আরবগণ আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিল। আরবগণ ইহুদিদের নিকট জমি বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, আরব অধমর্ণদের ঋণ অনাদায়ে ভূসম্পত্তি হইতে সেই ঋণ আদায় করিবার আইন বাতিলকরণ, ইহুদিদের প্যালেস্টাইন প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ এবং প্যালেস্টাইনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট উপস্থিত করিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই সকল দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে এক ব্যাপক ইহুদি-বিরোধী সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতির চাপে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করিলেন এবং এই কমিশনের উপর আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ও তদনুযায়ী সুপারিশ করিবার ভার দিলেন। আর্ল পীল (Earl Peel) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশন তাঁহাদের সুপারিশে প্যালেস্টাইনকে আরব অঞ্চল, ইহুদি অঞ্চল এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত জেরুজালেম—এই তিন ভাগে ভাগ করিবার পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা ইহুদি বা আরব কোন পক্ষই সমর্থন করিল না। ক্রমেই আরব-ইহুদি বিবাদ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল। ইহুদি স্বার্থ, আরব জাতীয়তা-বোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবর্তে পড়িয়া প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। প্যালেস্টাইনের বিমানঘাঁটি ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য দখলে রাখা প্রয়োজন ছিল, ইহা ভিন্ন মসুলের খনিজ তেলের পাইপ প্যালেস্টাইনে আসিয়া শেষ হইয়াছিল। সেজন্য তেলের বণ্টন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও ব্রিটিশ সরকার মসুলের উপর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইতালীয় সরকার হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া আরবগণ ইহুদি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইল। এমন কি, যে-সকল আরব ইহুদিদের সহিত মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল তাহাদিগকেও আক্রমণ করা হইল। একজন ব্রিটিশ কমিশনার এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারাইলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আরবদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলিল। জেরুজালেমের মুফ্‌তি আমিন এল-হুসেনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি পুনর্বাসন বন্ধ করিবার এবং অপরাপর আরব রাজ্যগুলির সমপর্যায়ে প্যালেস্টাইনকে স্থাপনের দাবি করিলেন।

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ (১৯৩৬)

রয়েল কমিশন: প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ বৃদ্ধি: ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি দ্বিতীয় কমিশন নিয়োগ করিলেন। এই

কমিশনের সুপারিশক্রমে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইল এবং ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিবর্গকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহ্বান করা হইল (১৯৩৯)। কিন্তু আরব ও ইহুদি প্রতিনিধিবর্গ একত্রে বসিতে অসম্মত হইলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তাঁহাদিগকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগ ব্রিটিশ পক্ষকে জানাইতে বলিলেন এবং যদি আপস-মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষে যুগ্ম বৈঠক বসিবে স্থির হইল। কিন্তু এইবারও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল না। তখন ব্রিটিশ সরকার নিজ হইতেই একটি আপস-মীমাংসার পরিকল্পনা কার্যকরী করিলেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য বৎসরে দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই নীতি গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন কঠোর সামরিক প্রহরার দ্বারা শান্তি রক্ষার ব্যবস্থাও করা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি প্রশ্নের কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না।

দ্বিতীয় কমিশন : প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত : লণ্ডন বৈঠক

আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ চেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সমাধানের প্রশ্ন স্থগিত

ইয়েমেন (Yemen) : আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়েমেন রাজ্য অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন মাত্র ৭৪ হাজার বর্গমাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়েমেনবাসীরা তুর্কী আধিপত্য অবসানের জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইতালি ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া সৈয়দ মোহম্মদ-ইবন্-অল্-ইদ্রিস্ তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইতালির সাহায্যে বিদ্রোহ করিয়া ইয়েমেনকে একপ্রকার স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এই স্বাধীনতা দৃঢ়তর হয় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়েমেনের স্বাধীনতা-স্পৃহা : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন রাশিয়ার সহিত, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সহিত, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়েমেন নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে ইতালীয় মেডিকেল মিশনকে ইয়েমেন হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন আরব লীগের এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ (United Nations)-এর সদস্যপদ লাভ করে।

স্বাধীন ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

সিরিয়া ও লেবানন (Syria and Lebanon) : ইরাক, প্যালেস্টাইন ভিন্ন আরব জাতীয়তাবাদের অপর কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপিত হয়। ফরাসী

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি

সরকার সিরিয়ার সংখ্যালঘু জাতি-অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চলকে আরব-প্রধান অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। উপকূল অঞ্চলের লাটাকিয়া (Latakia) এবং জেবেল ড্রুস্ (Jebel Druse) অঞ্চল ফরাসী সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, উত্তরদিকে আলেকজান্দ্রেত্তা (Alexandretta) তুর্কী জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া উহাকে সিরিয়ার অধীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হইল। আলেকজান্দ্রেত্তার অধিকাংশই অবশ্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ফরাসী সরকার কর্তৃক সিরিয়ার বিচ্ছিন্নীকরণ-নীতি আরবদের বিদ্বেষের কারণ হইল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবগণ নিজ দেশের সংহতি-নাশ সহ্য করিল না।

আরবদের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন

তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসীদের আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিদ্রোহ এক দারুণ আকার ধারণ করিলে ফরাসী সরকার কামান ব্যবহার করিয়া দামাস্কাস নগরীতে নিজ আধিপত্য রক্ষায় সমর্থ হইলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া তথায় ফরাসী শাসন প্রবর্তন করিলেন। এই সকল কার্যের ফলে সামরিক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যেটুকু শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ততটুকু হইল, কিন্তু আরবগণের সন্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হইল না। বরঞ্চ আরবগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। লেবাননেও ফরাসী সরকার মারো নাইটস্ (Maro Nites) নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরবদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে লাগিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার আরবদের সহিত মীমাংসার জন্য আলাপ-

ফ্রান্স ও সিরিয়া এবং লেবাননের চুক্তি (১৯৩৬)

আলোচনা চালাইলেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আপস-মীমাংসার আলোচনার ফলে ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির অনুকরণে ফ্রান্স ও সিরিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

হইল এই চুক্তির শর্তানুসারে সিরিয়ার সরকারের হস্তে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করা, আলওয়াই ও দ্রুজ অঞ্চলের সিরিয়ার সহিত সংযুক্তি এবং ফরাসী সরকারের সহিত এক ভিন্ন চুক্তির দ্বারা ফরাসী সৈন্য সিরিয়াতে স্থাপন করা স্থির হইল। লেবাননের সহিতও অনুরূপ এক চুক্তি সম্পাদন করা হইল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুমোদনে ফ্রান্সের বিলম্ব

এই চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হইল। কিন্তু ফরাসী সরকার সিরিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন লাটাকিয়া, দ্রুজ, জেবেল প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী কর্মচারীদের উস্কানির ফলে এক স্ব-স্ব প্রাধান্যের মনোবৃত্তি দেখা দিল। সেই সময়ে (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) আলেকজান্দ্রেতার অধিকাংশ ফরাসী সরকার তুরস্ককে দান করিলেন। এই সকল কারণে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে ফরাসী সরকার পুনরায় সিরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন।

সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃ-স্থাপিত (১৯৩৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী শাসন প্রচলিত রহিল। হিট্‌লারের হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। ঐ বৎসরই (১৯৪১) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি (Lytlleton-de-Gaulle Agreement) দ্বারা সিরিয়া ও লেবাননকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৪১)

মিশর (Egypt) : [আদি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল মিশর দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ফ্যারাওদের অধীনে ছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিশটি ফ্যারাও বংশ মিশরে রাজত্ব করিয়া ৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের অধীন হয়। পারসিক প্রাধান্যের আমলেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজত্ব করিতেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক প্রাধান্যের অবসান ঘটাইয়া গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশর দখল করেন। তিনি মিশর দেশে আলেকজাণ্ড্রিয়া নামে তাঁহার নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের অন্যতম টলেমি মিশরের অধিকারপ্রাপ্ত হন। টলেমির বংশ রাণী

পূর্বকথা

ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (৩০ খ্রীঃ পূঃ) লুপ্ত হয়। ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সময় হইতে মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে রোমান সাম্রাজ্য এবং পরে বাইজান্টাইন বা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মিশর দেশ দীর্ঘকাল থাকে এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতির অধিকারে আসে। আরবদের অধীনে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিবার পর মিশর ঐ বৎসর তুর্কী সুলতান সেলিম কর্তৃক বিজিত হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর আইনত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বলিয়াই বিবেচিত হইত। প্রকৃত শাসনব্যাপারে অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানাপ্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মিশরকে যাইতে হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশর জয় করেন। পিরামিডের যুদ্ধে মিশর জয় করিলেও ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-তুর্কী যুগ্মবাহিনী মিশর হইতে ফরাসী আধিপত্যের অবসান ঘটায়। আলবানিয়াবাসী এক দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা মোহম্মদ আলি ফরাসী অধীনতা হইতে মিশর দেশকে মুক্ত করিতে তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করেন। ইহা ভিন্ন তিনি মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগেও তুর্কী সুলতানের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই তুর্কী সুলতান মিশরের পাশা (Viceroy) পদে নিযুক্ত করেন। মোহম্মদ আলি মামলুক নামক এক শ্রেণীর বিদেশী ক্রীতদাস-সম্ভূত সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার হইতে মিশর দেশকে রক্ষা করেন। মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা আরবের ওহাবি বংশের নিকট হইতে বহুস্থান জয় করেন। ইহা ভিন্ন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুদান জয় করেন এবং ব্লু-নাইল নদীর তীরস্থ সেনার (Sennar) নামক স্থান পর্যন্ত নিজ সৈন্য মোতায়েন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানকে গ্রীক স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনে তিনি সাহায্য দান করেন। কিন্তু ইহার কিছুকালের মধ্যেই মোহম্মদ আলির সহিত তুর্কী সুলতানের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই সূত্রে মিশর-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিয়া কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় মোহম্মদ আলি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আনাটোলিয়া প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সকল স্থান ত্যাগ করিলেও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী

ফরাসী-অধিকৃত মিশর (১৭৯৮-১৮০১)

মোহম্মদ আলি মিশরের পাশা নিযুক্ত

মিশর-তুর্কী দ্বন্দ্ব

সুলতান মোহম্মদ আলিকে বংশপরম্পরায় মিশরের শাসনাধিকার দান করিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহাকে নিউবিয়া, সেনার, দারফুর ও কর্‌ডোফান্ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেরও গবর্ণর নিযুক্ত করা হইল।

মোহম্মদের দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের রাজত্বকালে (১৮০৫—'৪৯), আধুনিক মিশরের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা মোহম্মদ মিশর দেশকে একটি প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করেন। সুদক্ষ সামরিক বাহিনী, মেডিক্যাল স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বন্দর, নৌ-নির্মাণকেন্দ্র প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি মিশর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মিশরে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার (Long-staple cotton) চাষ আরম্ভ হয় এবং সেচকার্যের সুবিধার জন্য কাইরো বাঁধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়।

মোহম্মদ আলির পর যথাক্রমে প্রথম আব্বাস্ (১৮৪৯—'৫৪), সৈয়দ (১৮৫৪—'৬৩) ও ইস্‌মাইল (১৮৬৩—'৭০) মিশরের পাশা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দের শাসনকালেই সুয়েজ খাল খনন শুরু হয় এবং ইস্‌মাইলের আমলে তাহা শেষ হয় (১৮৬৯)। ইস্‌মাইল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে 'খেদিভ্' (Khedive) উপাধি প্রাপ্ত হন।

খেদিভ্ ইস্‌মাইল তাঁহার পিতামহ মোহম্মদ আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের উন্নতিমূলক কার্যাদি শুরু করিলেন। তিনি ডাক-বিভাগ, শুল্ক-ব্যবস্থা, রেলপথ, বন্দর, ইক্ষুচাষ প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতা, রাজ্যবিস্তার-নীতি প্রভৃতির ফলে তিনি দিন দিনই ঋণগ্রস্ত হইতে থাকিলেন। অবশেষে এক আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে ইস্‌মাইল ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই দেশ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করিল। মিশরীয় সরকার ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত প্রভাবাধীন হইল।

মিশরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় : ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপন

পরবর্তী পাশা তাওফিক্-এর আমলে আহ্‌মদ আরবী পাশা নামে একজন দেশ-প্রেমিক দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশসৈন্য কায়রো দখল করে। ঐ সময় হইতেই মিশরে ব্রিটিশ সামরিক

শাসন স্থাপিত হয়। লর্ড ক্রোমার ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট ও কন্সাল-জেনারেল। ঐ সময়ে মাহাদি নামে একজন নেতার অধীনে সুদান মিশরের অকর্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িলে জেনারেল গর্ডনকে বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন খার্টুম-এ প্রবেশ করিলে মাহাদির সেনাবাহিনী তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া খার্টুম দখল করে এবং গর্ডন স্বয়ং ও তাঁহার সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক লোক প্রাণ হারান। কাইরো হইতে গর্ডনকে সামরিক সহায়তা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী তের বৎসর মাহাদি স্বাধীনভাবে সুদানে রাজত্ব করেন। ১৮৯৬-'৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদান পুনরায় মিশরের অধিকারে আসে এবং সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যুগ্ম শাসন স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ফ্যাসোডা নামক স্থানটি দখল করে। এই স্থানটি ব্রিটিশ আওতার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। অবশেষে ফরাসী সৈন্য ফ্যাসোডা হইতে অপসারিত হইলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্সও মিশরের উপর ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া লয় এবং ব্রিটেনও মরক্কোর উপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকার করে। ঐ বৎসর মিশরের উপর হইতে বিদেশী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হয়।

লর্ড ক্রোমারের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

গর্ডনের হত্যা

'ফ্যাসোডা' সংঘর্ষ

লর্ড ক্রোমারের দক্ষতার ফলে মিশরের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দেখা দিল। মুস্তাফা কামিল নামে একজন নেতার নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ক্রোমার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে সার এলডন্ গর্স্ট্ (Eldon Gorst, 1907'-11) এবং তাঁহার পর লর্ড কিচেনার (১৯১১-'১৪)-এর আমলে মিশরীয়গণ শাসনব্যবস্থায় কতক পরিমাণ স্বাধিকার লাভ করে। লর্ড কিচেনার পূর্বেকার দুই-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্টের স্থলে এক-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া ইহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।]

মিশরীয়দের শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ব্রিটেন মিশর

দেশকে ব্রিটিশ 'সংরক্ষিত দেশ' (Protectorate) বলিয়া ঘোষণা করে। প্রধানত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : মিশর ব্রিটিশ সংরক্ষিত দেশ বলিয়া ঘোষিত

সুয়েজ খালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ওয়াফ্‌দ (Wafdists) মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনের সম্মুখে উত্থাপন করিতে চাহিলে বলপূর্বক তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইল। 'ওয়াফ্‌দ' দলের নেতা জগ্‌লুল পাশা কাইরোতে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধি-বর্গের সহিত এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া সরাসরি শান্তি-সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদলসহ উপস্থিত হইবেন স্থির করিলেন। ব্রিটিশ সরকার জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার তিনজন প্রধান অনুচরকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং মাল্টায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ফলে, সমগ্র মিশর দেশে এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন

ওয়াফ্‌দ দলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার দমননীতি অনুসরণ করিয়া এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করিলেন। অল্পকাল পরেই লর্ড এলেন্‌বি মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আসিলে জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার অনুচরদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরগণ প্যারিসে গমন করিলেন, কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার কোন সুযোগ তাঁহারা পাইলেন না। ইহার ফলেও মিশরে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সরকার এইবার বাধ্য হইয়াই মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিল্‌নার (Lord Milner) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

লর্ড মিল্‌নার মিশন আলাপ-আলোচনার পরও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রধানমন্ত্রী আদ্‌লি যগন পাশাকে ব্রিটিশ সরকার আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবারও আলাপ-আলোচনার পর কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। আদ্‌লি মিশরে ফিরিয়া আসিয়া

ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ

প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় মিশরে এক আন্দোলন শুরু হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহকারী পাঁচজন নেতাকে দেশ হইতে অন্যত্র নির্বাসনে প্রেরণ করা হইল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিতে

না পারিয়া এক ঘোষণার দ্বারা মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণ' (Protectorate)-এর অবসান করিলেন। সামরিক আইন উঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সুদান ও মিশরের সামরিক নিরাপত্তা, মিশরস্থ বিদেশীদের স্বার্থ প্রভৃতির রক্ষার ভার ব্রিটিশদের হস্তেই রাখা হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সুলতান ফুয়াদ্ (Sultan Fuad) মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পর বৎসর মিশরে এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (ঐ বৎসরই, ১৯২৩) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। পার্লামেণ্টে জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ্ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। জগ্‌লুল পাশা প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি লণ্ডন হইতে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে মিশরে এক গোলযোগের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে সুদানের ব্রিটিশ গবর্ণর জেনারেল সার লী স্ট্যাক্ (Sir Lee Stack) ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্দারকে কাইরোর রাজপথে হত্যা করা হইল। ফলে, পরবর্তী কয়েক বৎসর মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জগ্‌লুল পাশার মৃত্যু হইলে নাহাস্ পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু রাজা ফুয়াদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং মিশরীয় শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নির্বাচনে নাহাস্ পাশা পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন এবং রাজক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিলেন। রাজা অবশ্য এই আইন অনুমোদন করিলেন না। ফলে, নাহাস্ পাশা পদত্যাগ করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা নিজ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সিদ্‌কি পাশার সাহায্যে শাসন চালাইলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশা পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া পূর্বেকার শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশার আমলে তৃতীয়বার চেষ্টা চলিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কোন ফল হইল না।

মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ সংরক্ষণের অবসান—ফুয়াদ্ মিশরের রাজপদে অধিষ্ঠিত (১৯২২)

জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা : ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপসের ব্যর্থ চেষ্টা

মিশরের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

১৯৩৫-'৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসরই (১৯৩৬) শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে মিশরে ব্রিটিশের সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র সুয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ট্রিও (Mantreux) চুক্তি দ্বারা ব্রিটিশ ও অপরাপর বিদেশীদের বিচারালয়, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মিশর লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ করে।

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৩৬)

মণ্ট্রিও চুক্তি (১৯৩৭)

মিশরের লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্র ফারুক্ মিশরের রাজা হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

ফারুক্-এর সিংহাসন লাভ

পারস্য বা ইরান (Persia or Iran): খনিজ তৈল-সম্পদে সম্পদশালী পারস্যদেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিদেশী স্বার্থপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পারসিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়া যুগ্মভাবে পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। ঐ বৎসর ইঙ্গ-রুশ চুক্তি দ্বারা পারস্যের উত্তর অংশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন (under the sphere of influence) বলিয়া স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য বজায় রাখা ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল।

রাশিয়া ও ইংলণ্ড কর্তৃক শোষণ

ইরানীদের জাতীয় মর্যাদা ইঙ্গ-রুশ-নীতির ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই সূত্রে প্রথমে পারস্যের

শাহ্‌কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনে বাধ্য করা হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রুশ সেনাবাহিনী পারস্যের উত্তরাংশ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। এমন কি পারস্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে রুশগণ বাধা দান করে। তাহাদের চাপে পারস্য সরকার নিজ অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকাবাসী অর্থনীতিক।

ইরানী জাতীয়তাবাদ: রাশিয়া কর্তৃক পারস্যের উত্তরাংশ দখল

এইভাবে বিদেশী স্বার্থপরতার বিষময় ফল যখন ইরানীরা ভোগ করিতেছে তখন শুরু হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রুশ-তুর্কী-ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবমাননা করিয়া পারস্যের সীমার অভ্যন্তরে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। দুর্বল পারস্য সরকার বিদেশীদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পারস্য সরকার ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে পরিণত হইবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পারসিকগণ সরকারের এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজাখান পহ্‌লভি নামক একজন সামরিক নেতা বলপূর্বক অকর্মণ্য সরকারকে পদচ্যুত করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক 'মজলিস্‌' অর্থাৎ পার্লামেণ্ট রেজাখানকে পারস্যের সিংহাসনে স্থাপন করিল। তিনি রেজাশাহ্‌ পহ্‌লভি উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: রেজাখান পহ্‌লভির বলপূর্বক শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ

রেজাখান পারস্যের শাহ্‌পদে অধিষ্ঠিত

রেজাশাহ্‌ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ক্ষমতাশালী সেনানায়ক। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধন করা-ই ছিল তাঁহার শাসনের মূলনীতি। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায়-ই জন-কল্যাণকর কার্যের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতালাভের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

রেজাশাহের শাসনে জনকল্যাণ-সাধন

তিনি প্রথমে পারস্য রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। তারপর বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করিয়া তিনি এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। বিদেশী প্রভাবমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশীয়দের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা

তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি বিদেশী অর্থ-নীতিকদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানিকে তিনি নূতন শর্তে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিলেন। পরিবহণের সুবিধা-বৃদ্ধির জন্য রাস্তা ও রেলপথ তিনি প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশরক্ষার্থে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। একটি নৌবাহিনীও তিনি গঠন করিলেন। সমাজে নারীজাতির মর্যাদাবৃদ্ধি, রাজনৈতিকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু সাধন করিয়া তিনি দেশে এক নবযুগের সূচনা করিলেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পারস্য' নামের পরিবর্তে ইরানী জাতির নামের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের নামকরণ করা হইল 'ইরান'।

রেজাশাহের কার্যাদি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেজাশাহ্ জার্মান-প্রীতি প্রদর্শন করিলে ইঙ্গ-রুশ সৈন্য ইরানে প্রবেশ করিয়া খনিজ তৈলের উৎপাদনকেন্দ্রগুলি দখল করিল। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে রেজাশাহ্ নিজ পুত্র মোহম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : রেজাশাহের পদত্যাগ (১৯৪১)

একাদশ অধ্যায়

সুদূর প্রাচ্য

(The Far East)

জাপানের অভ্যুত্থান (Rise of Japan): ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের জাতীয়-বিপ্লবের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে জাপান আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে উন্নত ও অগ্রগতিশীল এবং আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপানের যুদ্ধে চীনের ন্যায় বিশাল দেশের উপর জাপানের জয়লাভ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের মিত্রতালাভ এবং ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য জাপানকে সুদূর প্রাচ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিল। পৃথিবীর রাষ্ট্র-পরিবারেও জাপান নিজ আসন মর্যাদার সহিত গ্রহণে সমর্থ হইল। এই দ্রুত অগ্রগতি এবং উত্তরোত্তর সাফল্য জাপানবাসীদের মনে যেমন এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করিল তেমনি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিল। চীনদেশের বিরুদ্ধে জাপান এক অন্যায়মূলক প্রসার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানের আত্মপ্রত্যয় ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ (Japanese Imperialism): প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিল। জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যোগদান করিয়া চীনদেশে অবস্থিত জার্মানি অধিকৃত অঞ্চল সান্টুং, কিয়াও-চাও প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। এইভাবে সাম্রাজ্য-গ্রাসলিপ্সা আরও বৃদ্ধি পাইলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)-সম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই সকল দাবি মানিয়া লওয়া হইবে কিনা সেবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য চীনদেশকে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার সময় দেওয়া হইল।

চীনদেশের বিরুদ্ধে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

এই 'একুশ দাবি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল সান্টুং অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপন-সংক্রান্ত দাবি, দ্বিতীয় ভাগে ছিল বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া-

সংক্রান্ত দাবি, তৃতীয় ভাগে ছিল চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহশিল্প-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার দাবি, চতুর্থ ভাগে চীনদেশে নিজ বন্দর, উপকূল বা প্রণালী কোন বিদেশী (ইওরোপীয়) শক্তির নিকট ত্যাগ করিবে না এই দাবি করা হইয়াছিল, এবং পঞ্চম ভাগে ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য পরিচালনায় জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান প্রভৃতি দাবি করা হইয়াছিল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'একুশ দাবি' তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানকে দৃঢ়ভাবে বাধাদান করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। দুর্বল চীন সরকার বাধ্য হইয়াই 'একুশ দাবির' অধিকাংশ-ই (ষোলটি) স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল শর্ত স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা হইল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল। ইহা ছাড়া রেলপথ প্রস্তুত করিবার, চীনদেশকে ঋণ দিবার নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগও লাভ করিল। দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া এবং কিরিণ-চ্যাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ৯৯ বৎসর পর্যন্ত দখলে রাখিবার অধিকারও জাপান লাভ করিল।

চীন কর্তৃক একুশ দাবির অধিকাংশ স্বীকৃত

'একুশ দাবি' সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সন্দেহ নাই। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থপর বিস্তার-নীতি নৈতিকতাবর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'একুশ দাবি'র চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগের শর্তগুলিকে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থনৈতিক সুযোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই নীতিও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে 'একুশ দাবি'কে 'এশিয়ার মনরো-নীতি' (Asiatic Monroe Doctrine) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'একুশ দাবি'— 'এশিয়ার মনরো-নীতি'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংকটজনক মুহূর্তে যখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট জাপানী সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমেরিকা ও ইওরোপীয়

শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরাপত্তা-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি' সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। যুদ্ধশেষে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে সকল স্থান ছিল তাহা চীনদেশ প্রত্যর্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিল না। ফলে, চীনা প্রতিনিধি শূন্যহস্তে প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে চীনের আশা ভঙ্গ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ দেশগুলির নৌ-শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিবর্গের পরস্পর স্বার্থ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌ-বলের ৬০ শতাংশ নৌবহর রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। জাপানের পক্ষে ইহা অতিশয় সুবিধাজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোন দেশই আর কোন রকম নূতন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে না স্থির হওয়ায় এই অঞ্চলে জাপান-ই সর্বাধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইল। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জাপানী শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলে মার্কিন-জাপানী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে জাপান ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলে আমেরিকায় জাপানী শক্তিবৃদ্ধিতে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার অনুরোধে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে (১৯২১), উহা আর পুনঃস্বাক্ষরিত হইল না, ফলে, ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির অবসান ঘটিল। ইহার পরিবর্তে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে এক চতুঃশক্তি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিবে না এবং এই সকল স্থান-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ যুগ্ম কন্‌ফারেন্সে মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। চীন সম্পর্কে উন্মুক্ত-দ্বার নীতিই স্বীকৃত হয়। চীন-জাপানের মধ্যে শাণ্টুং অঞ্চল লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল উহা চীনের সপক্ষে মীমাংসিত হয়। জাপান কিয়াও-চাও এবং শাণ্টুং-এর অপরাপর জার্মান অধিকৃত অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইয়াপ (Yap) দ্বীপ লইয়া আমেরিকার সহিত জাপানের বিরোধের মীমাংসাও ঐ সময়ে করা হয়।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (১৯২১-২২): নৌ-শক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যার সমাধান

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপানকে শাণ্টুং অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল এবং চীনদেশের অখণ্ডতা (Integrity of China) নীতি মানিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ইত্যাদি কেহই বৃদ্ধি করিবে না এই স্বীকৃতির ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে জাপান এই প্রাধান্য নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়াছিল।

জাপানের প্রাধান্য

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছিল উহার ফলে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করিয়া তথাকার প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে মনস্থ করিল। বস্তুত, জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসমাজের প্রসারের একমাত্র স্থান ছিল চীন। কারণ, ইতিপূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন সিঙ্গাপুরে এক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে জাপানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। স্বভাবতই মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের দৃষ্টি পড়িল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিলে জাপান 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি তখনও চীনদেশ হইতে আদায় করা হয় নাই সেগুলির দাবি পুনরায় উত্থাপন করিল এবং সেই সূত্রে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক তাঁবেদার রাজ্য গঠন করিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার লীগ চুক্তিপত্রের শর্ত-বিরোধী ছিল বলা বাহুল্য। লীগের সদস্য হিসাবে এইরূপ আক্রমণ হইতে বিরত থাকা জাপানের নৈতিক কর্তব্য ছিল। ইহা ভিন্ন ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপান চীনের অখণ্ডতার নীতি মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন জাপান নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট আবেদন এবং একাধিক কমিটির সুপারিশের অপেক্ষা করিয়াও শেষ পর্যন্ত চীনদেশ এই আন্তর্জাতিক সংঘ হইতে কোন সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১) : মাঞ্চুকুয়ো তাঁবেদার রাজ্য গঠন

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—লীগ চুক্তি-পত্র ও ওয়াশিংটন প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন

বাধ্য হইয়াই চীনদেশ জাপানের সহিত টাংকু (Tangku) নামক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তরদিকে অপসরণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং চীন ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিতে স্বীকার করিল।

টাংকু-এর শান্তি-চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিল। সমগ্র সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান করিয়া জাপান এশিয়ার অভিভাবকত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইল। চীনদেশকে ইওরোপীয় শোষণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপান চীনদেশের দ্বার পুনরায় ইওরোপীয়দের নিকট রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। এই কারণে জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং-কাই-শেকের অপসারণ অপরিহার্য ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে যে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিনাশ করা প্রয়োজন ছিল। এইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে জাপান তথাকথিত 'নূতন পরিকল্পনা' (New Order) প্রস্তুত করিল। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারই ছিল জাপানের 'নূতন পরিকল্পনা'র মূল উদ্দেশ্য।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত

'নূতন পরিকল্পনা'— জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষা এবং দেশকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের আশঙ্কার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

জাপান-জার্মান চুক্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পিপিং-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে 'মার্কোপোলো পুল' (Marco Polo Bridge)-এর নিকটে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ ঘটিলে সেই অজুহাতে জাপান চীনদেশ আক্রমণ করিল।

জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চীনের কমিউনিস্ট্ দল চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিং-তাং সরকারের সহিত সহযোগিতা শুরু করিল। কিন্তু জাপানকে চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল অধিকারে বাধা দান করা সম্ভব হইল না। চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অবশ্য তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিল। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চীনা কমিউনিস্ট্গণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে কমিউনিস্ট্-কুয়োমিং-তাং ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। চীনের যে অংশ তখনও স্বাধীন ছিল উহা কমিউনিস্ট্ অধিকৃত অঞ্চল এবং কুয়োমিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট্-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান এবং কুয়োমিং-তাং-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল চুং-কিং। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের রাষ্ট্রজোটে অংশ গ্রহণ করিল।

জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭)

কমিউনিস্ট্ ও কুয়োমিং-তাং অনৈক্য—ইনান ও চুং-কিং-এ পৃথক সরকার স্থাপন

চীন (China) : উনবিংশ শতাব্দীতে সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা ছিল প্রধানত তিনটি : (১) চীন ও জাপানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্য স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীন সাম্রাজ্য-গ্রাসের প্রতিযোগিতা এবং চীন সাম্রাজ্যের অধীনে বহুস্থান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক চীন ও জাপান হইতে অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার (Extra territorial rights) ভোগ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামরিক জ্ঞান জাপান পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায়ই এক সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন নিজ নিজ সুবিধামত চীনদেশকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিতেছিল, তখন জাপান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণনীতি গ্রহণ করে। চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) জাপানের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কর্তৃক জাপানের সহিত মিত্রতা স্থাপন জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগস্থল ছিল চীন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ ভিন্ন রাশিয়াও চীনদেশ গ্রাস করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজ স্বার্থ বজায়

রাখিবার উদ্দেশ্যে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা এবং চীনের দ্বার সকল দেশের নিকট উন্মুক্ত রাখিবার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। এদিকে চীনবাসীদের চরম দুর্বলতা ও বিদেশীয়গণ কর্তৃক চীনের শোষণের প্রতিকার হিসাবে উদারপন্থী জননেতা সান-ইয়াৎ-সেন সমগ্র চীনে এক তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালাইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া চীনকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত করিল (১৯১২)। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল প্রথম সাফল্যলাভ করিলে তাহারা সান-ইয়াৎ-সেনকে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীন প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইলে সান-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন এবং জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন। য়ুয়ান্-শি-কাই ছিলেন এক অতি শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশলী। সান-ইয়াৎ-সেন মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা

কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেনের সেই আশা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া য়ুয়ান্-শি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। বিদেশী বণিকদের নানাপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দান করিয়া তিনি তাহাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজে সম্রাট-সুলভ ক্ষমতা অর্জন করিয়া একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করিবেন। সেইজন্য য়ুয়ান্ চীনদেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিস্তৃতি সহজ হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বাহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia) চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা বাহুল্য।

রাশিয়া ও জাপানের চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের সুযোগ

ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলি চীন-দেশকে ঋণ দান করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে চাহিল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া সহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ লিপ্ত হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য

দান করিয়া শক্তিশালী করিবার নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই জাপানের পক্ষে চীন গ্রাসের সুযোগ উপস্থিত হইল।

জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীন সাম্রাজ্যে জার্মান অধিকৃত শাণ্টুং অঞ্চল দখল করিল এবং জার্মানির অপরাপর অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধাও আত্মসাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন স্থান দখল করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানাপ্রকার বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা, জাপান হইতে চীনদেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বীকার করিয়া লইলে চীনদেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইত বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন য়ুয়ান্-শি-কাই। জাপান য়ুয়ান্-শি-কাইকে তাঁহার সম্রাট-পদ লাভে সাহায্য দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন 'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব বিলোপের সম্ভাবনা ছিল সেগুলি ভবিষ্যতে বিচারের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। এইভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই-ও মৃত্যুর সামান্য পূর্বে হাং-সিয়েন (Hung-Shien) নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অল্পকালের মধ্যে (১৯১৬) য়ুয়ানের মৃত্যু ঘটিলে চীনা প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাইল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

আমেরিকা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপান যখন 'একুশ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল তখন কেহ-ই চীনদেশের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। জাপান মিত্রপক্ষকে সাহায্যদানের বিনিময়ে 'একুশ দাবি'র সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের সংহতি রক্ষা নীতির সমর্থক আমেরিকার সহিত জাপানের লান্সিং ইশাই (Lansing Ishii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে মার্কিন সরকারের চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি যে কেবল মুখের কথা তাহা প্রমাণিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা

ইওরোপীয় শক্তি ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দাবি সমর্থন

আমেরিকা শাণ্টুং-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে এই ভয় চীনা সরকারের প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপানের সুযোগ নাশ করিবার ইচ্ছায়-ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাধাদানে এবং মিত্রপক্ষও চীনদেশের যুদ্ধে যোগদানে তাহাদের হস্ত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব তেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' দ্বারা শাণ্টুং অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করিবার পর চীনদেশও জার্মানির শত্রুদেশে পরিণত হউক ইহাই চাহিল। কারণ, চীন ও জার্মানির সদ্ভাব জাপানের শাণ্টুং দখল করিয়া রাখিবার পরিপন্থী হইতে পারে এই ভয় জাপানের ছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ই আগস্ট) চীনদেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্রপক্ষ চীনদেশের এই সহায়তার জন্য তাহাকে কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল না। তবে বক্সার-বিদ্রোহের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চীনদেশের দেওয়ার কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণের বাকী অংশ চীনকে দিতে হইবে না ও যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকগণ কত শুল্ক দিবে সেই প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা হইবে এইটুকুমাত্র আশা চীনকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) ও স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল তাহাতে চীনবাসীর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি শাণ্টুং চীনদেশকে ফিরাইয়া দেওয়া, বিদেশী প্রাধান্যের অবসান, বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীনা সরকারের চরম অধিকার, বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার' (Extra-territorial Rights)-এর অবসান দাবি করিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের স্বার্থ অবহেলিত

সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া হুম্‌কি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত শাণ্টুং-এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাহ্য করা হইল। ফলে, চীনা প্রতিনিধি প্রায় শূন্য-হস্তেই প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক মিত্রতা নীতি বর্জন করিল।

চীনে ইওরোপীয় ও জাপান-বিরোধী আন্দোলন

প্যারিস সম্মেলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরূপ অবহেলা প্রদর্শনের ফলস্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল, জাপানী সামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হইল। এমতাবস্থায় জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপান চীনদেশের সহিত বিবাদ মিটাইয়া লইতে চাহিল। কিন্তু চীন সরকার জাপানের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসার পূর্বে শাণ্টুং ফেরত চাহিলেন। এইভাবে উভয় সরকারের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, সুদূরপ্রাচ্যের সমস্যা এবং নৌ-শক্তি হ্রাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য এক সম্মেলন Washington Conference) আহ্বান করিলেন।

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

চীনের লাভ

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনদেশের 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনরায় স্বীকার করা হইল। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশের বিভিন্ন অংশকে 'প্রভাবিত অঞ্চল' (Sphere of Influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিষিদ্ধ হইল এবং যুদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিবেচনা করিবাব নীতি গৃহীত হইল। জাপান একটি ভিন্ন চুক্তি দ্বারা কিয়াও-চাও এবং শাণ্টুং-এ জার্মানির সর্বপ্রকার অধিকার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। শুল্ক-নির্ধারণ-নীতি প্রভৃতি আরও কয়েকটি অধিকার চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইল। ঐ সময় হইতেই চীনদেশে বিদেশী প্রাধান্য অবসানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইল।

চীনদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত : চীনের স্বাধীনতা-ইতিহাসের সূচনা

সান্‌-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক দল তিনটি বিশেষ আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া চীনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এই তিনটি আদর্শের বিশ্লেষণ সান্‌-

ইয়াৎ-সেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মুক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আমরা চাই শান্তি, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নহে।" তিনি দক্ষিণ-চীনের সামরিক নেতৃবর্গের সাহায্যে তাঁহার জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। রাশিয়া সান্-ইয়াৎ-সেনকে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্য দান করিল। সান-ইয়াৎ-সেন ইওরোপীয় দেশগুলি চীন হইতে যে সকল অ-ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা, অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার (Extra-territorial Rights) আদায় করিয়াছিল সেগুলি নাকচ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত তিনি সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তিনি গণতন্ত্রকার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দান করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দলের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। ইহাতে কুয়োমিং-তাং-এর সভ্যপদ চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং-নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহারই শিষ্য চিয়াং-কাই-শেক-এর উপর। চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নান্-কিন্, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

সান্-ইয়াৎ-সেনের নীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি

জাতীয়তাবাদী চীনের রুশ সাহায্য লাভ

চীনদেশের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সান্-ইয়াৎ-সেনের অমর দান রহিয়াছে। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণ্য মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত তাঁহার কর্মপন্থা চীনবাসীর মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি চীনের জাতীয়তার উৎসস্বরূপ।

সান্-ইয়াৎ-সেনের দান

সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পূর্বেই কুয়োমিং-তাং-দলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। বামপন্থীদল কমিউনিস্ট্ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, অপর দিকে দক্ষিণপন্থী দল কমিউনিস্ট-

নীতিবিরোধী ছিল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী অবসানের পক্ষপাতী ছিল। সান্-ইয়াৎ-সেনের জীবদ্দশায় দুই দলের বিভেদ প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া কুয়োমিং-তাং-এর কমিউনিস্ট্ সদস্যদের প্রতি বৈষম্য-মূলক ব্যবহার শুরু করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য চিয়াং-কাই-শেক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রায় সমগ্র চীনদেশ কুয়োমিং-তাং-শাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২৭) তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে বল্‌শেভিক প্রচারকগণ কর্তৃক চীনদেশে কমিউনিস্ট্ মতবাদ প্রচার লইয়া চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

চীন ও রাশিয়ার মনোমালিন্য

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রেও কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে চীনের ঐক্য বিধানের জন্য জাতীয়তাবাদী দল (কুয়োমিং-তাং) নান্‌কিং দখল করিলে কমিউনিস্ট্‌গণ বিদেশী দূতাবাস ও বিদেশীয়দের সম্পত্তি আক্রমণ ও লুঠ করিল। এই বিষয় লইয়া বিদেশী সরকারগুলির সহিত চীন সরকারের গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা চীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিল। জাপান নিজ স্বার্থরক্ষার্থ চীনের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার সৈন্য প্রেরণ করিল। এমতাবস্থায় বিদেশীয় বণিকদের সহায়তায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্‌দের দমনে কতকটা কৃতকার্য হইলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং দখল করিয়া উত্তরাঞ্চলের পৃথক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিলেন। নান্‌কিং ঐক্যবদ্ধ চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের রাজধানী হইল। ঐ বৎসরই কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি (Kuoming-tang Executive Committee) আইন প্রণয়ন করিয়া এক জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি-ই চীনের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সমিতির নির্দেশাধীনে দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার দেওয়া হইল স্টেট্ কাউন্সিল (State Council)-এর উপর। চিয়াং-কাই-শেক এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন। চেয়ারম্যানই চীনের প্রেসিডেন্ট নামে সর্বসাধারণ্যে

কমিউনিস্ট্-কুয়োমিং-তাং দ্বন্দ্ব

সমগ্র চীনে জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন : চিয়াং-কাই-শেক চেয়ারম্যান নির্বাচিত

পরিচয় লাভ করিলেন। এই বৎসরই (১৯২৮) চিয়াং-কাই-শেক নান্‌কিং ঘটনায় (Nanking Affairs) ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশী সরকারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও জাপান চিয়াং-কাই-শেকের শাসনব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল।

চিয়াং-কাই-শেক চীনের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকার্যে মার্কিন ও জার্মান সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে তখনও বামপন্থীদের আন্দোলনের অবসান না হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়ই যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইল। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে চিয়াং-কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌দের প্রচারকার্য সহজ হইল। তাহারা চিয়াং-এর জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসন স্থাপন করিতে চাহিল। কমিউনিস্ট্‌পন্থিগণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণাংশে সোভিয়েট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইলে চিয়াং-কাই-শেক তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অপর দিকে এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া চীনের কোন কোন সামরিক নেতাও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে (১৯২৯) রাশিয়ার সহিত চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের এক তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। অবশেষে খাবারোভ্‌স্ক প্রোটোকোল (Khabarovsk Protocol) দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা স্থির হইল। এই বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা: কমিউনিস্ট্‌ আন্দোলনের প্রসার

দক্ষিণ-ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকায় কমিউনিস্ট্‌ প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদী চীন ও রাশিয়ার বিরোধ

মাঞ্চুরিয়া চীনদেশের একটি অতিশয় বর্ধিষ্ণু ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে উন্নত অঞ্চল ছিল। চীনদেশের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া হইতেই প্রেরণ করা হইত। ইহা ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সরকার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে চীনদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ঐ স্থানের মোট বাসিন্দার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল চীনা জাতির লোক। অপরদিকে মাঞ্চুরিয়ায় বিদেশী সরকারগুলির, বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়া-ভ্লাডিভস্টক রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা

মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব

ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম-বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ ছিল জাপানের অধীনে। মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ রপ্তানি দ্রব্যাদি জাপানী-অধিকৃত দাইরেন (Dairen) বন্দর দিয়া প্রেরণ করা হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরে জাপানের এক আশাতীত অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এক অর্থ নৈতিক অবনতি দেখা দিলে জাপানের অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনও বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেই স্থলে দেখা দিল বেকারত্ব ও আর্থিক দুর্দশা। এমতাবস্থায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া এই অর্থ-নৈতিক দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি অপূর্ণ রহিয়াছিল সেইগুলি জাপান এখন (১৯৩১) দাবি করিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ার অর্থ-নৈতিক শোষণ

এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জাতীয়তাবাদী সরকার ও কমিউনিস্ট্‌দের পরস্পর-বিরোধে তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তখন অনাহারে, অর্ধাহারে দিনযাপন করিতেছে। স্বভাবতই জাপান এইরূপ অবস্থায় চীনের বিরুদ্ধে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের অজুহাতও পাওয়া গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় (Inner Mongolia) একজন জাপানী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানী সম্পত্তি সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের একাংশ বিস্ফোরক দ্বারা বিনষ্ট হইলে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। চীনদেশ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ও মার্কিন সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে করিতেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী ব্যবসায়ের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া লইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী প্রাধান্যাধীনে মাঞ্চুরিয়াকে 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইল। এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইল সিং কিং (Hsing King)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা মারিয়ার, মুক্‌ডেন ও অপরাপর শহর দখল করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশে এক জাপান-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। চীনবাসীরা জাপানী দ্রব্যাদি বর্জন করিল। জাপানী সামগ্রীর দ্বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা-দেশ ছিল চীন। সুতরাং চীনদেশের জাপানী সামগ্রী বর্জনের ফলে জাপানী

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল

বাণিজ্যস্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাংহাই-এ অবস্থিত জাপানী বণিকগণ জাপান সরকারকে নৌ-বলের সাহায্যে সাংহাইয়ের চীনাদের জাপান-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। জাপান সাগ্রহে একটি নৌবাহিনী সাংহাই বন্দরে প্রেরণ করিলে চীনবাসীরা সেই নৌবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করিল। জাপান ইহাকে চীনদেশের আক্রমণাত্মক আচরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ চীন-জাপানী বিরোধের মীমাংসাকল্পে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করিল। লিটন্ কমিশন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রাধান্যাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য স্থাপনের সুপারিশ করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ লিটন্ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ যখন কমিশনের পর কমিশন নিয়োগ করিয়া চীন-জাপানী বিবাদের মীমাংসার উপায় নির্ধারণে কালক্ষেপ করিতেছিল তখন জাপান উত্তর-চীনের বহু স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। ঐবৎসর জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সেবিষয়ে প্রতিরোধমূলক কোন কিছু করিবার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়াছিল। লিটন্ কমিশনের রিপোর্ট আলোচনাকালে জাপানের কার্যের নিন্দাবাদ করা হইলে জাপান উহার প্রতিবাদ করে এবং লীগ-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। ইহার ফলে একদিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর দুর্বলতা যেমন প্রমাণিত হইয়াছিল, অপর দিকে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় লীগের কার্যকারিতা সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর অক্ষমতা এই ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন জাপানের লীগ ত্যাগ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস করিয়াছিল। সুতরাং মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং সেই সূত্রে জাপানের লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর পতনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। এদিকে চীন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ হইতে কোনপ্রকার সাহায্য না পাইয়া একপ্রকার হতাশ হইয়াই জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী

লর্ড লিটন্ কমিশন

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর বিফলতা

টাংকু-এর সন্ধি

জাপানী সৈন্য চীনের প্রাচীরের উত্তরে অপসরণ করিতে রাজী হইল। জাপান অধিকৃত স্থানসমূহ ও চীনের অধীন অঞ্চলের সীমার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলকে নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনকার্য চীন কর্মচারীদের হস্তেই থাকিবে বটে, কিন্তু শাসনকার্যে জাপানের ক্ষতিকারক কোন কিছু করা হইবে না সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

এই সন্ধির পরও জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতি পূর্ণোদ্যমেই চালাইল। চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার চীনের কমিউনিস্ট্ দমনে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার তেমন চেষ্টা করিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে চীনা কমিউনিস্ট্ নেতা মাও-সে-তুং ও অপরাপর নেতৃবর্গ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইলেন এবং নিজেরাও জাপানী শক্তি প্রতিহত করিবার কার্যে সরকারকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। চিয়াং-কাই-শেক জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা অপেক্ষা কমিউনিস্ট্দের দমন করিবার কার্যেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। এমন সময় চিয়াং-কাই-শেকের নিজ অধীন কর্মচারিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুই সপ্তাহকাল এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই আকস্মিক ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং-কাই-শেককে দেশরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট্ দলের সহিত বিরোধ মিটাইতে বাধ্য করা। দুই সপ্তাহ পর বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্দের সহিত অন্তর্যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন।

চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট্-দমন-নীতি

কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ মৈত্রী

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ যুগ্মশক্তি জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কার্যে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কুয়োমিং-তাং দল কমিউনিস্ট্দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এই সন্দেহ হইতেই ক্রমে দুই দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াসিং ও ফুকিন অঞ্চলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ সৃষ্টি হইলে চিয়াং-কাই-শেকের মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে এই অন্তর্যুদ্ধের অবসান হইল। ঐ বৎসর পার্ল হারবার (Pearl Harbour) জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ই চীনের কমিউনিস্ট্গণ কুয়োমিং-তাং পক্ষকে পরাজিত করিয়া চীনের বিপ্লব সংঘটিত করে, ফলে নূতন চীনের উত্থান ঘটে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ ঐক্য: চীনের বিপ্লব

দ্বাদশ অধ্যায়

তোষণ-নীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

(Policy of Appeasement : Second World War)

জাপান-ইতালি-জার্মানি তোষণ (Appeasing Japan, Italy and Germany): আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার যে চেষ্টা লীগ-অব-ন্যাশনস্ করিতেছিল উহার প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রথমে জাপান শুরু করে। ক্রমে ইতালি ও জার্মানি একই পন্থা অনুসরণ করিয়া লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর নৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর ক্ষমতা এইভাবে বিলুপ্ত হইলে উহার স্থলে আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া জাপান, ইতালি ও জার্মানির ক্রমবর্ধমান রাজ্যগ্রাসনীতি প্রতিহত করিবার চেষ্টাও তখন করা হয় নাই। ফলে, শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া উহাকে তোষণ করিবার মনোবৃত্তি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে যখন তোষণ-নীতিও জাপান, ইতালি ও জার্মানিকে আর তুষ্ট করিতে পারিল না তখন বাধ্য হইয়াই এই সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। এইভাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিরাপত্তা রক্ষার নীতির ব্যর্থতা

জাপান-ইতালি-জার্মানি তোষণ

জাপান ১৯৩১-১৯৪৫ (Japan 1931-1945) : জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (Occupation of Manchuria by Japan): ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান লীগ-চুক্তিপত্র (League Covenant) এবং ১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া সেখানে একটি তাঁবেদার সরকার স্থাপনে জাপানের বিলম্ব ঘটিল না। মাঞ্চুরিয়ার নূতন নামকরণ হইল মাঞ্চুকুয়ো। মাঞ্চুরিয়া দখল ছিল জাপানের সমগ্র চীন তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়া গ্রাস করিবার প্রথম পদক্ষেপ ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়ারও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং চীন ও রাশিয়ার সহিত মাঞ্চুরিয়া লইয়া জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিত ছিল।

জাপান তোষণ-নীতি

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১)

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান উহা গ্রাস করিয়া জাপানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করিতে চাহিল। বস্তুত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রিটিশ সরকার সিঙ্গাপুরে একটি শক্তিশালী সামরিক ও নৌ-ঘাঁটি গঠন করিলে জাপানের পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তারনীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। জাপানের বিস্তারের একমাত্র স্থল ছিল এশীয় মহাদেশ। মাঞ্চুরিয়ার কৃষি ও খনিজ সম্পদ জাপানের শিল্পোৎপাদনের সহায়ক হইবে, উপরন্তু উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে মাঞ্চুরিয়া জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইবে—এই সকল কারণও জাপানকে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কমিউনিস্ট্-বিরোধী জাপান চীনদেশে কমিউনিস্ট্ প্রভাব বিস্তৃতি এবং চীনবাসীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—উভয়ই ভীতির চক্ষে দেখিত। জাপানের পদাতিক ও নৌবাহিনীর দক্ষতা এবং 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে উৎসাহিত করিয়াছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাপানের সরকার ও জাপানী জনসাধারণকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বে-সামরিক বিভাগ অপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল কারণ জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ায় চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই দলের মধ্যে মারামারি শুরু হইলে জাপানীরা তাহা দমন করে। চীন ও কোরিয়ার লোকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে জাপান স্বভাবতই কোরিয়া-বাসীদের পক্ষ গ্রহণ করিত বলা বাহুল্য। এইভাবে মাঞ্চুরিয়া চীন ও জাপানের এক দ্বন্দ্বস্থলে পরিণত হইলে কতিপয় চীনা সৈন্য জনৈক জাপানী সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই মুকডেন অঞ্চলে সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথের সামান্য একাংশ চীনাগণ বিস্ফোরক দ্বারা উড়াইয়া দিলে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। গ্যাথোর্ন হার্ডি প্রমুখ লেখকগণ সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথ উড়াইয়া দিবার কাহিনীকে অলীক বলিয়া মনে করেন। নিছক অজুহাত হিসাবেই এই মিথ্যা রটনা করা হইয়াছিল। বস্তুত, যে স্থানে রেলপথ ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই পথ দিয়া ঐ দিন রেল-গাড়ী নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি চলাচল করিয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়া দখলে জাপানের স্বার্থ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের মিথ্যা অজুহাত

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে চীন লীগ কাউন্সিলের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। লীগ কাউন্সিল উভয়পক্ষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে অর্থাৎ সশস্ত্র দ্বন্দ্ব হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলে জাপান মুখে সেই অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল বটে, কিন্তু লীগ কর্তৃক জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় মাঞ্চুরিয়া দখলের কাজ পূর্ণোদ্যমেই চালাইতে লাগিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার জাপান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তির শর্ত-বিরোধী ছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—লীগ-এর কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি

প্রথমত, ইহা ছিল লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী এবং মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ লীগ কর্তৃক শাস্তি পাইবার যোগ্য ছিল।

মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ লীগ-চুক্তিপত্রের বিরোধী

দ্বিতীয়ত, জাপান ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি পরিত্যাগের এবং চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সেই প্রতিশ্রুতি-সম্বলিত চুক্তির বিরোধী ছিল।

ওয়াশিংটন চুক্তির বিরোধী

তৃতীয়ত, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত কেলগ্‌-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে বা সমস্যা ও বিবাদ-বিসংবাদের সমাধানে শান্তিপূর্ণ পন্থা অনুসরণে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হইয়াছিল। জাপান এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া জাপান এই চুক্তির শর্তাদিও লঙ্ঘন করিয়াছিল।

কেলগ্‌-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি-বিরোধী

এইভাবে জাপান লীগের চুক্তিপত্র এবং লীগের বাহিরে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলেও যখন লীগ কাউন্সিল বা ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কোন দেশই জাপানকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধের অধিক কিছু করিতে অগ্রসর হইল না, তখন জাপানও উৎসাহিত বোধ করিল। লীগের প্রকৃত দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া লীগ কাউন্সিলে প্রস্তাব করা হইল যে, মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হউক। লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে জাপানে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্বেই

লীগ কাউন্সিলের দুর্বলতা

জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সেখানে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করিয়া আইনের চক্ষে ধূলা দিতে সমর্থ হইল। মাঞ্চুরিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। লিটন্ কমিশনের রিপোর্টে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইলেও লীগ কাউন্সিল জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল না। লিটন্ কমিশন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার জাপানের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় এই যুক্তি অস্বীকার করিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি-প্রসূত কার্য একথা স্পষ্টভাবেই বলিলেন। মাঞ্চুকুয়ো সরকার জাপান কর্তৃক স্থাপিত তাঁবেদার সরকার—মাঞ্চুরিয়াবাসী কর্তৃক স্বেচ্ছায় স্থাপিত নহে একথাও লিটন্ কমিশনের রিপোর্টে বলা হইল। মাঞ্চুরিয়াকে চীনের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা উচিত হইবে এই সুপারিশও লিটন্ কমিশনে করা হইল। কিন্তু জাপান আক্রমণকারী দেশ এবং উহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সুপারিশ না থাকায় জাপান মাঞ্চুরিয়া নিজ অধিকারে রাখিতে পারিবে সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়া মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্রগঠন আইনত স্বীকার করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের সাহায্য চাহিল। কিন্তু ব্রিটেন সুদূর প্রাচ্যে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে জাপানের সহিত শত্রুতার পথ যথাসম্ভব এড়াইয়া চলা-ই উচিত ভাবিয়া জাপানকে অনুরোধ-উপরোধের অধিক কিছু করিতে চাহিল না। ফলে, জাপানের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার সামরিক বা অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। জাপানও আক্রমণ-নীতি অপ্রতিহতভাবে চালাইবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিল। জাপানী সেনাবাহিনী চীনের প্রাচীর ছাড়াইয়া 'জেহল্' (Jehol) নামক খনিজ তৈলে সমৃদ্ধ স্থানটি অধিকার করিয়া পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইলে চীন সরকার জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তর দিকে অপসরণ করিল এবং ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন দক্ষিণস্থ একখণ্ড ভূমি চীন নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুকুয়ো তাঁবেদার সরকার গঠন

লিটন্ কমিশন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার চেষ্টার ব্যর্থতা

ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপরতা

জাপান কর্তৃক জেহল্ অধিকার

স্বীকার করিতে বাধ্য হইল (১৯৩৩)। লীগ কাউন্সিল জাপানকে চীনের সহিত বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইল এবং এই বিবাদ সম্পর্কে লীগের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিশন নিযুক্ত করিল। এই সময়ে লীগ কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে লিটন্ কমিশন রিপোর্ট গ্রহণ করিলে জাপান লীগ পরিত্যাগের ইচ্ছা লীগ কাউন্সিলকে জানাইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কোন প্রকৃত চেষ্টার অভাব জাপানকে চীন গ্রাসে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশ্য শত্রু জাপানকে দমন করা বা সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলে বাণিজ্য-স্বার্থ কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল না। স্বভাবতই চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি মুখের কথায় পর্যবসিত হইয়াছিল। আর ব্রিটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্স জাপানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে এবং জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইবে একথা হয়ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ততটা বুঝিতে পারে নাই।

টাংকু-এর সন্ধি

জাপান কর্তৃক লীগ ত্যাগ

ইওরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদূরদর্শিতা

মাঞ্চুরিয়া দখল ব্যাপারে সাফল্যলাভ এবং টাংকু-এর সন্ধি দ্বারা চীনের আরও একাংশ অধিকার জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি করিল। ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পদ্ধতি (New Order) অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করা। এজন্য চীনের সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় রাষ্ট্রগুলি যে 'উন্মুক্ত দ্বার-নীতি' (Open Door Policy) অনুসরণ করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা প্রয়োজন হইল। একই কারণে চীনের জাতীয়তাবাদী দল ও উহার নেতা চিয়াং-কাই-শেক-এর পতন ঘটান প্রয়োজন ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে রুশ প্রাধান্যনাশও এজন্য অপরিহার্য ছিল। এই নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ছিল এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের স্থলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ইচ্ছাপ্রসূত।

জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবাদ (New Order)

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষার এবং দেশবাসীকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে বিরোধিতা তখন চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইলেও বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে কুয়োমিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ (কমিউনিস্ট্) দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে এবং রাশিয়াও চীনরক্ষার জন্য সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইবে বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী (Anti-Comintern) এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান সমগ্র চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পিপিং* (Peiping)-এর অনতিদূরে লুকোচিয়াও বা 'মার্কো পোলো পুল' (Lukouchiao or Marco Polo Bridge) নামক স্থানে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের কয়েকজনের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটিলে জাপান সেই অজুহাতে চীন আক্রমণ করিল। জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ (১৯৩৭) চীনের কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলকে দেশরক্ষার কার্যে ঐক্যবদ্ধ করিল। নানকিং, হ্যাংকাও, ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থান জাপান অধিকার করিয়া লইল বটে, কিন্তু চীন জয় করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হইল না। জাপান চীনদেশে অধিকৃত অঞ্চল লইয়া নানকিং-এ একটি জাপান-নিয়ন্ত্রিত 'চীন প্রজাতন্ত্র' স্থাপন করিল। কিন্তু চীনাবাসী জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়া চলিল। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ মুখে চীনদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কোন ত্রুটি করিল না, কিন্তু প্রকৃত সাহায্যদানে কেহই অগ্রসর হইল না। রাশিয়ার নিকট হইতে ইন্দো-চীনের মাধ্যমে সামান্য যুদ্ধ-সামগ্রী চীনদেশে অবশ্য আসিল। জাপান ব্রিটিশ বা মার্কিন সম্পত্তি নাশ ও সেই সকল দেশের নাগরিককে আক্রমণ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইল না। জাপানী বোমারু বিমান 'প্যানে' নামক মার্কিন কামানবাহী জাহাজ (Gunboat) ও একটি তৈলবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিলে ঐ সঙ্গে কয়েকজন মার্কিন নাগরিকও প্রাণ হারাইল।† মার্কিন সরকার ইহার

জাপান-জার্মান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি

লুকোচিয়াও বা 'মার্কো পোলো পুল'-এর ঘটনা—জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

জাপান কর্তৃক ব্রিটিশ ও মার্কিন সম্পত্তি আক্রমণ

---

* **Langsam, p. 434.**

†**Ibid p. 435.**

প্রতিবাদ জানাইলে জাপান এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিল এবং উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে প্রতিশ্রুত হইল। ব্যাপারটি এইভাবেই মিটমাট হইয়া গেলে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতার ভয় হইতে মুক্ত হইল। এমতাবস্থায়ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িকগণ জাপানকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিয়া অর্থলাভ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি জাপানের নিকট এই ধরনের সামগ্রী বিক্রয় করিতে লাগিল। মুখে এই দুই দেশ চীন দেশের অখণ্ডতার কথা আওড়াইলেও ব্রিটিশ ও মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। জাপান-তোষণের কুফল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দেই স্পষ্ট হইয়া উঠিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশকে আর্থিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জার্মানির আক্রমণে দুর্বলীকৃত ফরাসী সরকারের নিকট হইতে জাপান ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুতের অধিকার আদায় করিল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনদেশকে অর্থ সাহায্য দিতে লাগিল। অপর দিকে জাপানী সেনাবাহিনী হংকং-এর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে ব্রিটেনও চীনকে অধিক পরিমাণ ঋণদান করিতে লাগিল এবং জাপানকে উহার অগ্রসর-নীতি হইতে বিরত হইবার জন্য জানাইল। জাপান ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনপ্রকার অনুরোধ-উপরোধ বা সতর্ক-বাণীতে কর্ণপাত করিল না। উপরন্তু বিমান আক্রমণ দ্বারা মার্কিন সম্পত্তি বিনাশ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত যে 'সৌহার্দ্য ও বাণিজ্যের চুক্তি' (Treaty of Amity and Commerce) ছিল তাহা নাকচ করিবার ইচ্ছা জাপানকে জানাইয়া দিল। ইহা ভিন্ন জাপানকে খনিজ তৈল সরবরাহ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী সামগ্রী আমদানির উপরও নানা-প্রকার বাধা-নিষেধ প্রয়োগ করা হইল। এই ব্যাপার লইয়া জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খনিজ তৈল আমদানির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের শর্তে ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে জাপানী সৈন্য অপসারণে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করিতে এবং নিজ ইচ্ছামত শান্তি-চুক্তির শর্তাদি স্থির করিয়া চীনের সহিত যুদ্ধ মিটাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জাপান তোষণ-নীতি

জাপান কর্তৃক ইন্দোচীন দখল

জাপানের প্রতি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ-উপরোধ নীতি অনুসরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ত্যাগ

এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। মার্কিন সরকার হইতে পাল্টা প্রস্তাব করা হইল যে, জাপান চীন ও ইন্দোচীন হইতে পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী অপসারণ করিলে এবং চীনের অধিকৃত অঞ্চলে যে জাপান-সরকার-আশ্রিত চীন সরকার গঠন করা হইয়াছে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে স্বীকার করিলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি সকল দেশের সহিত জাপান এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে খনিজ তৈল সরবরাহ করিবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানী বাণিজ্য পুনঃস্থাপনে রাজী হইবে।

জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আপসের আলাপ-আলোচনা।

রুশ-জাপানী অনাক্রমণ-চুক্তি

ইতিপূর্বে জাপান রাশিয়ার সহিত এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া (১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১) জার্মানি-সোভিয়েত যুদ্ধ বাধিলেও যাহাতে জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া অস্ত্রধারণ না করে সেই ব্যবস্থা করিয়াছিল। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা প্রস্তাবের জবাব দিবার পূর্বে জাপান 'পার্ল হারবার' (Pearl Harbour) আক্রমণ করিয়া (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত করিল। এই আক্রমণ শুরু হইবার পরই জাপান মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল।

জাপান কর্তৃক আকস্মিকভাবে পার্ল হারবার (Pearl Harbour) আক্রমণ

এইভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুদূরপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হইল। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের চুক্তির শর্তানুসারে হিট্‌লার ও মুসোলিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফলে, জাপানও ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ন্যাদার-ল্যাণ্ড্‌স-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।*

যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপান হংকং, গুয়াম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, ডাচ্‌ ইণ্ডিজ (Dutch Indies) প্রভৃতি জয় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে জাপানের পরাজয়ের সূচনা হইল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুইটি শহরকে মার্কিন

জাপানের জয় ও পরাজয়

* Vide Schuman : *International Politics*, pp. 372-73.

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহর এ্যাটম বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করিলে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

ইতালি-তোষণ (Appeasement of Italy): ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার (Occupation of Ethiopia by Italy): দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কেবল জাপান ও জার্মানির প্রতিই তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল এমন নহে। ফ্যাসিস্ট্-শাসিত ইতালির প্রতিও সে-সকল দেশ তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়া ইতালিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রসারকার্যে উৎসাহিত করিয়াছিল। নাৎসি-নেতা হিট্‌লারের অভ্যুত্থান ইতালির ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে, ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড স্ট্রেসা কন্‌ফারেন্স-এ (১৯৩৫) সম্মিলিত হইয়া নাৎসি-নীতির নিন্দাবাদ করিয়াছিল। কিন্তু জাপান ও জার্মানির লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার, হিট্‌লার কর্তৃক ভার্সাই-এর চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া জার্মান জাতিকে সমরসজ্জায় সজ্জিতকরণ প্রভৃতি লীগের দুর্বলতা প্রকট করিয়া তুলিলে ইতালি রাজ্যগ্রাস-নীতির অনুসরণকারী জার্মানির সমর্থকে পরিণত হইল। ইহা ভিন্ন ইতালি নিজেও সাম্রাজ্যবাদী-নীতি অনুসরণ করিতে শুরু করিল। মুসোলিনির সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতি ইতালিবাসীদের আন্তরিক সমর্থন যাহাতে লাভ করিতে পারে সেজন্য মুসোলিনি বৈদেশিক 'যুদ্ধ-নীতির মাধ্যমে ইতালির মর্যাদাবৃদ্ধির একমাত্র পন্থা ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা এই ধারণার সৃষ্টি করিলেন। ইতালির সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নীতি যাহাতে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল না হয় সেজন্য মুসোলিনি আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হইলেন। এদিকে হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসি জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ঔদ্ধত্যের ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ফ্রান্স ইতালির মিত্রতালাভে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

ইতালির সাম্রাজ্যবাদী-নীতি উৎসাহিত

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ওয়াল-ওয়াল (Wal-Wal) নামক স্থানে ইতালি ও ইথিওপিয়ার সৈন্যদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন ইতালীয় সৈন্য প্রাণ হারাইলে ইতালি এক বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতালি-ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ার চুক্তির শর্তানুসারে এই দুই দেশের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটাইবার প্রতিশ্রুতি উভয়

ওয়াল-ওয়াল (Wal-Wal) ঘটনা

দেশই দিয়াছিল। কিন্তু ইতালি সেই চুক্তি অমান্য করিয়া মধ্যস্থতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ইথিওপিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট আবেদন করিল। ইতালীয় প্রতিনিধি ইতালি-ইথিওপিয়ার দ্বন্দ্বটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটান হইবে জানাইলেন। লীগ কাউন্সিল ইতালির মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখিলেন। ইথিওপিয়ার আবেদন সত্ত্বেও কোনপ্রকার কার্যকরী পন্থা অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র ইতালীয় প্রতিনিধির মুখের কথার উপর নির্ভর করা ও লীগের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখা ইতালির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণেরই ফল, বলা বাহুল্য। এদিকে ইতালি বিনা বাধায় ইথিওপিয়ার সীমান্তবর্তী নিজ উপনিবেশগুলিতে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণ করিতে লাগিল। ইথিওপিয়া পুনরায় লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেদন জানাইলে ইতালি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মধ্যস্থতায় কোন ফল হইল না, কারণ যাঁহারা মধ্যস্থতা করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন তাঁহারা ওয়াল-ওয়াল ঘটনার জন্য ইতালি কিংবা ইথিওপিয়া কোন দেশই দায়ী নহে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ইতালির একক অধিনায়ক মুসোলিনি যাহাতে তাঁহার পরিকল্পিত ইথিওপিয়া আক্রমণ হইতে বিরত হন সেজন্য ইথিওপিয়ার নিকট হইতে ওগাডেন (Ogaden) প্রদেশটি ইতালিকে আদায় করিয়া দিবার এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইথিওপিয়াকে জীলা (Zeila) বন্দরটি গ্রেট ব্রিটেন দান করিবার প্রস্তাব করিল। মুসোলিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, উপরন্তু ইতালির প্রতি ব্রিটেনের তোষণ-নীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত হইলেন। যাহা হউক, ইতালি-ইথিওপিয়ার বিবাদের মীমাংসার উপায় হিসাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিবর্গ প্যারিসে সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন যে, ইথিওপিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনা করিবে এবং সেই সূত্রে লীগ ইথিওপিয়া রাজ্যের ইতালিকে কতক বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিবে। ইতালি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিল।

ইথিওপিয়া কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট আবেদন

লীগ-অব-নাশন্‌স্‌-এর ঔদাসীন্য

ব্রিটেনের ইতালি-তোষণ-নীতি

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্তাব—মুসোলিনি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

এমতাবস্থায় ব্রিটেন লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে ইতালি-ইথিওপিয়ার বিবাদের মীমাংসার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত এই ঘোষণা করিল। প্রয়োজনবোধে ইতালির বিরুদ্ধে লীগ-চুক্তিপত্র অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রিটেন পশ্চাৎপদ নহে একথা প্রকাশ করাই ছিল ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসোলিনি এই সব কিছু উপেক্ষা করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপনে ইথিওপিয়ার অধিকাংশ মুসোলিনিকে দান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা (হোর-লাভাল পরিকল্পনা, Hoare-Lavel-Plan) জানাজানি হইয়া গেলে উহার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী স্যামুয়েল হোরকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পরও ইতালির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করিলেও ফ্রান্স জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির মিত্রতালাভের আশায় ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আন্তরিকভাবে কার্যকরী করিতে রাজী হইল না। ব্রিটেন ইতালিকে দমন করিবার জন্য প্রথমে বদ্ধপরিকর ছিল বটে, কিন্তু অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ঔদাসীন্য শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের উৎসাহও হ্রাস করিল। অবশেষে ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ উঠাইয়া লইয়া ইতালি-তোষণ-নীতির নূতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল। লীগ চুক্তিপত্রের অবমাননা, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ঔদাসীন্য ইতালির সাম্রাজ্য-স্পৃহা বর্ধিত করিল। তদুপরি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এই আচরণ ও লীগের দুর্বলতা জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতির উৎসাহ দান করিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মুসোলিনি সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া ইতালির রাজাকে ইথিওপিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের ইতালি-তোষণ-নীতি ও জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিল। ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালি ও জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি স্বভাবতই এই দুই দেশকে পরস্পর মিত্রে পরিণত করিয়াছিল। এই মিত্রতা স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল।

মুসোলিনির ইথিওপিয়া আক্রমণ

হোর-লাভাল পরিকল্পনা

ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা—ইহার অকার্যকারিতা

ইতালি-তোষণ-নীতির প্রত্যক্ষ ফল

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া (Spanish Civil War : Stage-Rehearsal of the Second World War) : লীগ কাউন্সিল কর্তৃক ইতালির অর্থনৈতিক অবরোধের ঘোষণা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে ফ্রান্স, কার্যকরী করিতে প্রস্তুত না হইলে শেষ পর্যন্ত লীগ সেই অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইলে (১৭ই জুলাই, ১৯৩৬) সঙ্গে সঙ্গে (১৯শে জুলাই) স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-সমূহের অন্যতম ছিল স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ।

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের সূচনা

ইতালি ও জার্মানি তোষণের যে নীতি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় অনুসরণ করিতেছিল তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে পরিলক্ষিত হইল। ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখলের ব্যাপারে লীগ কাউন্সিলের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে স্পেনের অন্যতম সমরনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কিংবা মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তির আধিপত্য নাশ করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন—কোন কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। ফলে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার যেমন দুর্বল তেমনি অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছিল। যাহা কিছু উন্নয়নমূলক কাজে প্রজা-তান্ত্রিক সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তাহারা সরকারের বিরোধিতা শুরু করিল। পক্ষান্তরে উগ্র সংস্কারপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সুস্থ, সুসংগঠিত এবং সকলের সমমর্যাদার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে অযথা কালক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ্যে, একথা-ই রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, কমিউনিস্ট্‌গণ ও রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমন সময়ে এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। সংস্কারপন্থীদের কার্যক্রমে বিশ্বাসী জনৈক পুলিশ কর্মচারীকে রাজতন্ত্রের জনৈক সমর্থক হত্যা করিলে তাহারা রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া প্রতি-

অন্তর্যুদ্ধের পটভূমিকা

অন্তর্যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

শোধ গ্রহণ করিল। সরকার এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে প্রজাতন্ত্রের বিরোধীদল সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে স্পেনে অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রজাতন্ত্রের বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি স্পেনীয় মরক্কোস্থিত তাঁহার অধীন সেনাবাহিনীকে নিজপক্ষে টানিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া (১৭ই জুলাই, ১৯৩৬) স্পেন আক্রমণ করিলেন। স্পেনের একাংশ তিনি সহজেই জয় করিতে সমর্থ হইলেন। জার্মানি ও ইতালি ফ্রাঙ্কোকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে হিট্‌লার ও মুসোলিনির অংশ গ্রহণের পশ্চাতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এবং বিশেষভাবে, জার্মানির যুদ্ধ-প্রস্তুতির মহড়ার উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। হিট্‌লার, মুসোলিনির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অধীন স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে, এই উদ্দেশ্যও হিট্‌লার ও মুসোলিনির ছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যেমন হিট্‌লার ও মুসোলিনির সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারও তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইওরোপ ও আমেরিকাস্থ কমিউনিস্ট্‌দের সাহায্য-সহায়তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো হিট্‌লার ও মুসোলিনির নিকট হইতে যে পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার তুলনায় কমিউনিস্ট্‌দের নিকট হইতে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। কমিউনিস্ট্‌ রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট্‌গণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্যদানের ফলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী দেশগুলির নৈতিক সমর্থন লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি কমিউনিস্ট্‌দের গ্রাস হইতে স্পেনকে রক্ষা করিতেছেন একথা প্রচার করিয়া কমিউনিস্ট্‌-বিরোধীদের এমন কি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরোক্ষ সমর্থনলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইলে ইতালি ও জার্মানির সহিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে একথা ভাবিয়াও ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার একক বা যুগ্মভাবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। ফলে, হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার নীতির পরিপূরক হিসাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জেনারেল ফ্রাঙ্কো বা প্রজাতান্ত্রিক সরকার কাহাকেও কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ

হিট্‌লার ও মুসোলিনির বিদ্রোহীদের সাহায্য দান

রাশিয়া ও ব্রিটিশ-ফরাসী-মার্কিন সাম্যবাদীদের স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য দান

ইঙ্গ ফরাসী মনোভাব

করিতে রাজী হইল না। এইভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এবং স্পেনের বৈধ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে লীগ স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ব্রিটেনও স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব সমর্থন করিল এবং বিদেশী সৈন্যের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর যাবতীয় অধিকার (Status of Belligerents) দানে স্বীকৃত হইল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ যখন সুনিশ্চিত তখন ইতালি ও জার্মানি স্পেন হইতে তাহাদের সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) ব্রিটেন ও ফ্রান্স জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো অল্পকালের মধ্যেই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ দখল করিলে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক ফ্রাঙ্কো-প্রতিষ্ঠিত সরকার স্বীকৃত

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের গুরুত্ব স্পেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

(১) হিট্‌লার-মুসোলিনির শক্তিবৃদ্ধি

প্রথমত, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান ও জয়লাভ হিট্‌লার ও মুসোলিনির অধীনে যে একক অধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(২) উদার-নীতির বিরুদ্ধে একক অধিনায়কত্বের জয়লাভ

দ্বিতীয়ত, স্পেনে একক অধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা একক অধিনায়কত্ব ও উদার-নীতির আদর্শগত দ্বন্দ্বে উদার-নীতির পরাজয় ও প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ সূচিত করিয়াছিল। হিট্‌লার-মুসোলিনির পক্ষে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ তাঁহাদের অনুসৃত নীতির-ই জয়ের সামিল ছিল।

(৩) ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেন ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকারে হিট্‌লার ও মুসোলিনির সামরিক সুযোগ বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, হিট্‌লার-মুসোলিনির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেন ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার লাভের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত হিট্‌লার-মুসোলিনির সম্ভাব্য যুদ্ধে আফ্রিকা ও এশিয়াস্থ ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশসমূহের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পথ সহজতর হইয়া রহিল।

চতুর্থত, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ কর্তৃক ইতালি-ইথিওপিয়ার যুদ্ধে কোনপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা এক দিকে যেমন হিট্‌লারকে আগ্রাসী-নীতি অনুসরণে পরোক্ষ উৎসাহ দান করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি মুসোলিনিকেও অনুরূপ আগ্রাসী-নীতি অনুসরণে উৎসাহিত করিয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ষ্ট্রেসা সম্মেলনে মুসোলিনি হিট্‌লারের আগ্রাসী-নীতির বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয়ের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় বা লীগ হিট্‌লারকে নিরস্ত করিবার নীতি তেমন আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া মুসোলিনি হিট্‌লারের সহিত হাত মিলাইয়া চলিতে মনস্থ করিলেন।

(৪) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য

পঞ্চমত, স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী নিষ্ক্রিয়তা এবং না-হস্তক্ষেপ নীতির অনুসরণ একদিকে যেমন এই দুই দেশের সরকারের হিট্‌লার-মুসোলিনি তোষণ-নীতি প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অপর দিকে তাহাদের রুশ-ভীতিও সুস্পষ্ট করিয়াছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী যে-কোন শক্তিকেই নৈতিক সমর্থন দানে প্রস্তুত, একথা স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছিল।

(৫) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হিট্‌লার-মুসোলিনি-তোষণ ও রুশ-ভীতি

ষষ্ঠত, হিট্‌লার-মুসোলিনির, বিশেষভাবে হিট্‌লারের পক্ষে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়ার কাজ করিয়াছিল। জার্মানির বিমানবাহিনীর দক্ষতা ও মারণাস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এবং ইতালি-জার্মানির যুদ্ধ-নীতি ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ কিভাবে গ্রহণ করে তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষে স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ এক স্বর্ণ সুযোগ দান করিয়াছিল।

(৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া

জার্মানি-তোষণ (Appeasement of Germany): নাৎসি-নেতা বা ফুহ্‌রার হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের সময় হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি তোষণ-নীতি হিট্‌লারের ঔদ্ধত্য ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছিল। হিট্‌লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল, চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে সুদেতেনল্যাণ্ড দাবি এবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর, চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ দখল এবং শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের নিকট ডান্‌জিগ নামক শহরটি ও পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাংশের মধ্যে সংযোগপথ (Corridor) দাবি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হিট্‌লার তোষণ-নীতিরই পরিণতি বলা বাহুল্য। ডান্‌জিগ ও পোল্যাণ্ডের নিকট

জার্মানির রাজ্য গ্রাস-নীতি: ইঙ্গ-ফরাসী-জার্মানি-তোষণ নীতি

হইতে সংযোগপথ (Polish Corridor) দাবির প্রশ্ন হইতেই শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। [এবিষয়ে বিশদ আলোচনা ১৭৪—১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

রুশ জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি (Russo-German Non-Aggression Pact) : ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালি-জার্মান তোষণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ক্রমেই সোভিয়েত সরকারের অস্বস্তিকর কারণ হইয়া উঠিল। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া এবং ক্রমে সুদেতেনল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া দখল রাশিয়ার নিরাপত্তা অচিরেই ক্ষুণ্ণ করিবে এই আশঙ্কা সোভিয়েত সরকারের মনে স্বভাবতই জাগিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নির্দেশাধীনে লিথুয়ানিয়া কর্তৃক শাসিত মেমেল বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং ডান্‌জিগ শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' (Polish Corridor) দাবি করিয়া বসিলেন। হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস-নীতি এইবার ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনও জার্মানি-তোষণ-নীতির শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন একথা উপলব্ধি করিলেন। সামরিক দিক দিয়া ব্রিটেন তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, একথা বলা যায় না। কিন্তু হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস-নীতি ক্রমেই প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া ব্রিটেন জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য দানে কৃতসংকল্প হইল। ফ্রান্স জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে সর্বদাই ভীত ছিল, জার্মানির এই সীমাহীন শক্তি সঞ্চয় ও ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য স্বভাবতই ফ্রান্সের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেজন্য ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সও হিট্‌লারের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল। ডান্‌জিগ ও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সংযোগ ভূমি (Polish Corridor) দখল করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ফলে, পোলাণ্ডের সহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের একটি পরস্পর নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সাহায্য-সহায়তা দানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার ব্যাপারে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের আগ্রহ স্বভাবতই জার্মানির অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইল। হিট্‌লার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি-পোলাণ্ডের মধ্যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত

জার্মানির রাজ্যগ্রাস-নীতি—রাশিয়ার ভীতির কারণ

ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যাণ্ডের সহিত পরস্পর নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর

হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি (১৯৩৫) নাকচ করিয়া ব্রিটেনের প্রতি তাঁহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। হিট্‌লার তখন ডান্‌জিগ্‌ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দখল করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার প্রধান মিত্র মুসোলিনিও রাজ্যগ্রাস-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন। তিনি আল্‌বানিয়া দখল করিয়া লইলে গ্রীস, রুমানিয়া প্রভৃতির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কা করিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই দুই দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়াকেও জার্মানির বিরুদ্ধে দলে টানিবার উদ্দেশ্যে এক নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব করা হইল। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির ক্রম-বিস্তার নীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের জার্মানি-তোষণ-নীতির ফলে রাশিয়ার দিকে জার্মানির ক্রম-বিস্তার রাশিয়ার ভীতি আরও বাড়াইয়াছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তথা ইওরোপীয় অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে যে উদাসীন তাহা জার্মানি-ইতালি তোষণ-নীতিতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত এক ত্রি-শক্তি চুক্তির প্রস্তাব করিল। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যে-কোন অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা। ফ্রান্স ও ব্রিটেন উহাতে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করিল না। এমতাবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে জার্মানির সহিতই অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করা একমাত্র পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইল। তথাপি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তর যদি দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত সোভিয়েত রাশিয়াকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে টানিতে পারা যাইত। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্যবাদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও দূর হইল না। তাহারা রাশিয়ার নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপন করিল তাহাতে পরস্পর নিরাপত্তার (mutual security) কোন শর্ত ছিল না। কেবলমাত্র পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস প্রভৃতির নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় করাই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য। অথচ ফ্রান্স ও ব্রিটেন পোল্যাণ্ড-এর সহিত পরস্পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিসম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। *পোল্যাণ্ড, গ্রীস বা রুমানিয়ার স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তার* জন্য রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে অথচ রাশিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড-জার্মানি অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৪) ও ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি (১৯৩৫) নাকচ

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি-তোষণ-নীতি রাশিয়ার ভীতির কারণ

ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরের অদূরদর্শিতা

চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি রাশিয়াকে সাহায্য দানে বাধ্য থাকিবে না, এইরূপ প্রস্তাব স্বভাবতই রাশিয়ার নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। এদিকে পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সহিতও যুদ্ধ শুরু হউক ইহা হিট্‌লারের অভিপ্রেত ছিল না।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯)

রাশিয়াও জার্মানির আক্রমণ অন্তত কিছুকালের জন্য এড়াইবার জন্য সচেষ্ট ছিল। ফলে, ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যখন রাশিয়ার সহিত মিত্রতাচুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন তখন (২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯) সকলকে বিস্মিত করিয়া দশ বৎসরের জন্য রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির এক গোপন শর্তে সমগ্র পূর্ব-ইওরোপকে জার্মানির প্রভাবাধীন ও রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করা হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির রাজনৈতিক তথা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যেমন ছিল সুদূরপ্রসারী তেমনি চমকপ্রদ। প্রথমত, এই চুক্তি ছিল হিট্‌লারের কূটনীতির সাফল্যের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবাস্তব ও অদূরদর্শী নীতির তুলনায় হিট্‌লারের সাফল্য তাঁহাকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

হিট্‌লারের কূটনীতির সাফল্য

দ্বিতীয়ত, সামরিক দিক দিয়া বিচার করিলেও হিট্‌লারের সাফল্য তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। ডান্‌জিগ' শহর ও 'পোলিশ কোরিডোর' বলপূর্বক দখল করিতে গেলে এক ব্যাপক যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে অন্তত নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে ইঙ্গ-ফরাসী সাহায্যপুষ্ট পোল্যাণ্ড জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, একথা হিট্‌লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার তেমন আগ্রহ না থাকিলেও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি রাশিয়ার সাহায্য লাভ করিতে পারিলে হিট্‌লারের সামরিক সাফল্য অসম্ভব না হইলেও বিলম্বিত হইবে, তাহা হিট্‌লার উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির ফলে হিট্‌লারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের সুবিধা ও সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

হিট্‌লারের সামরিক দূরদর্শিতা

তৃতীয়ত, রাশিয়ার দিক হইতে বিচার করিলে রুশ-জার্মান চুক্তির প্রধান যুক্তি

ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের সাম্যবাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা। জার্মানি ও ইতালির কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। জার্মানি-তোষণ বা ইতালি-তোষণের পশ্চাতে সাম্যবাদী রাশিয়ার অনমনীয় শত্রুকে কতকটা বরদাস্ত করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটেন বা ফ্রান্সের প্রতি সন্দিহান ছিল। হিট্লারের প্রতি যে মনোভাব সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল প্রায় অনুরূপ মনোভাবই ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতি ছিল বলা যাইতে পারে। কিন্তু জার্মানির রাজ্যগ্রাস-নীতির কোন বিরোধিতা না করিয়া উপরন্তু মিউনিক চুক্তিতে তাহার সমর্থন প্রভৃতি কার্যকলাপ ক্রমেই রাশিয়ার ভীতির কারণ হইয়া উঠিলে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাশিয়া জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার বিপদে রাশিয়াকে সাহায্য দানের কোন পাল্টা শর্ত উহাতে ছিল না। রাশিয়া এইরূপ শর্ত চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হউক এই দাবি করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন উহাতে স্বীকৃত হন নাই। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারও রাশিয়াকে জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতালি ও জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে পর্যায়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রোম ও বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই পর্যায়ের কোন ব্যক্তিকে রাশিয়ার সহিত চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় নাই। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির ইহাও একটি অমার্জনীয় ত্রুটি হিসাবে বিবেচ্য। এমতাবস্থায় রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সপক্ষে একটি কথাই বলিবার আছে। ইহা হইল এই যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দীর্ঘকাল রুশ শাসনাধীনে থাকিবার ফলে পোল্যাণ্ড-বাসীদের মনে যে রুশ-বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল উহার ফলে রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের কোন মৈত্রীচুক্তি তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু শুধু ইহার ফলেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে নাই, একথা বলা চলে না।

রাশিয়ার ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের প্রতি ক্রম-বর্ধমান সন্দেহ

রাশিয়ার প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বৈষম্যমূলক ব্যবহার

রাশিয়ার সহিত মিত্রতায় পোল্যাণ্ডের আপত্তি

পোল্যাণ্ডবাসীদের রাশিয়া-বিদ্বেষ ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের রুশ-নীতি সামান্য পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল এইটুকুই মাত্র বলা যাইতে পারে।

রুশ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নীতি

চতুর্থত, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির একটি গোপন শর্তে পূর্ব-ইওরোপকে সোভিয়েত প্রভাবাধীন অঞ্চল ও জার্মানির প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দিক দিয়া জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া একই পর্যায়ভুক্ত ছিল তাহা বলা যাইতে পারে।

হিট্‌লারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের বাধা দূরীভূত

পঞ্চমত, রুশ-জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি হিট্‌লারের যুদ্ধ-নীতি অনুসরণের পথে যে বিরাট বাধা ছিল তাহা দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে পোল্যাণ্ড আক্রমণে উৎসাহিত করিল। রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর সংবাদে সমগ্র পৃথিবীতে আসন্ন যুদ্ধের সূচনা ঘোষিত হইল। কয়েক দিন পর (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) জার্মান সৈন্য পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

উপসংহার

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত না হইলে, কিংবা রাশিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিলেও হিট্‌লারের উদ্ধত রাজ্যগ্রাস-নীতি বাধাপ্রাপ্ত হইত না, কিন্তু তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম-ইওরোপ উভয় দিক দিয়াই শক্তিশালী শত্রুর সহিত হিট্‌লারকে একই সঙ্গে যুঝিতে হইত। অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে হিট্‌লারের প্রাথমিক সাফল্যের পথ সহজতর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই চুক্তি রাশিয়াকে ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সামরিক প্রস্তুতির সুযোগ দান করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল (Causes and Effects of the Second World War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানির ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট দলের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই শান্তি-চুক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জার্মান ভাবাভাষী লোক-অধ্যুষিত স্থান জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা, ইওরোপের উপর একক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ইওরোপকে এবং ক্রমে সমগ্র পৃথিবীকে

ইওরোপ ১৯৩৯
জার্মানি ও জার্মান মিত্রশক্তিবর্গ
মিত্রশক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি)
মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক সংরক্ষিত অঞ্চল
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
রাশিয়া
গ্রেট ব্রিটেন
ডেনমার্ক
জার্মানি
পোল্যাণ্ড
চেকোস্লোভাকিয়া
হাঙ্গেরী
ফ্রান্স
সুইজারল্যাণ্ড
ইতালি
রুমানিয়া
যুগোস্লাভিয়া
কৃষ্ণ সাগর
বুলগেরিয়া
পোর্তুগাল
স্পেন
গ্রীস
তুরস্ক
মরোক্কো
আলজিরিয়া
টিউনিসিয়া
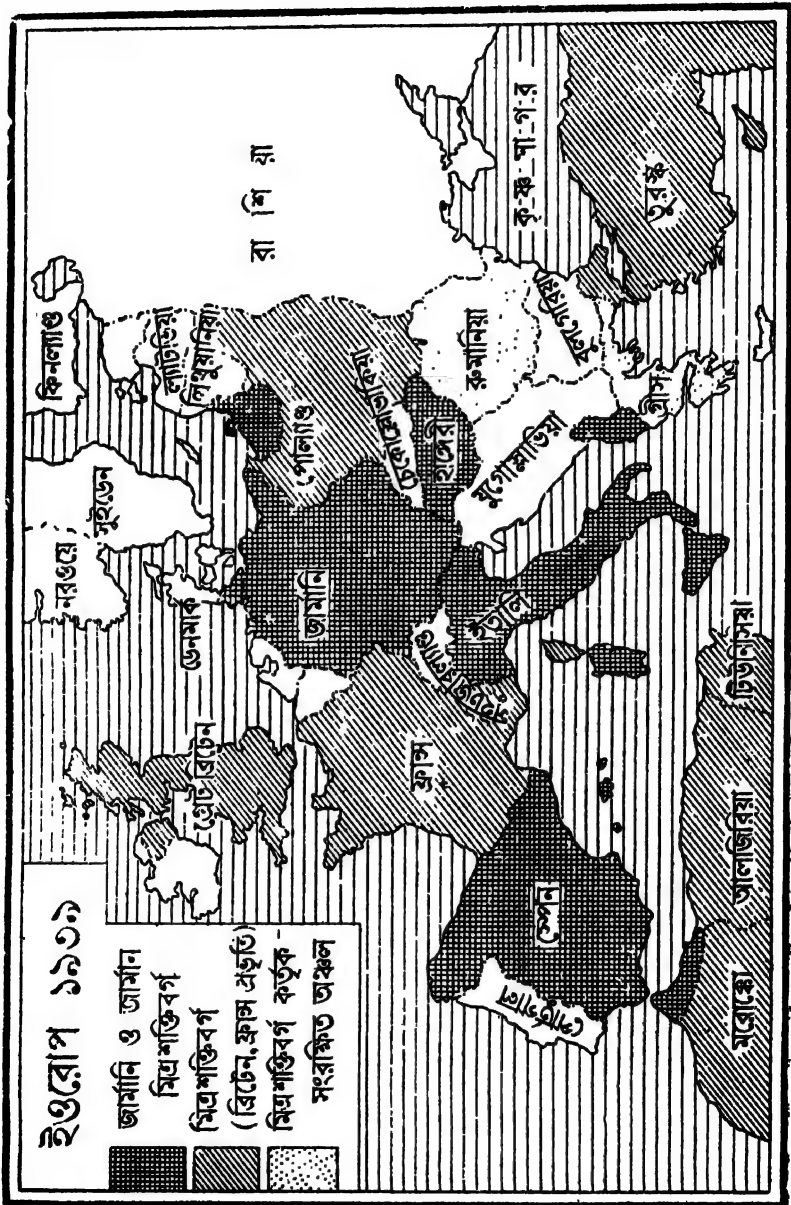
জার্মানির এক বিশাল উপনিবেশে পরিণত করা* এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করা ছিল ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট তথা নাৎসি সরকারের উদ্দেশ্য। ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানিকে চিরকালের মত হৃতমর্যাদা ও দুর্বল করিয়া রাখিবার ইচ্ছা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর অংশের সংযোগ নাশ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্মানি কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের নীতির বিরোধিতা করিয়া জার্মানির ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তদুপরি ষোড়শ শতাব্দী হইতে সামরিক শক্তি হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান রাষ্ট্রের নৌ-বল ও সৈন্যবল অত্যধিকভাবে হ্রাস করিয়া জার্মানির জাতীয় মর্যাদায় যে আঘাত হানা হইয়াছিল তাহা জার্মান জাতির পক্ষে দীর্ঘকাল মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। পদানত, পরাজিত জার্মানির উপর মিত্রশক্তিবর্গ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতে এই শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি জার্মান জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধোত্তর কালে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক মোতায়েন সৈন্য দ্বারা জার্মান জনসাধারণের প্রতি রূঢ় আচরণ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানিতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল উহার প্রতি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহানুভূতির অভাব জার্মানির গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার কোন সুযোগ দান করে নাই। ফলে জার্মানিতে একক প্রাধান্যের উদ্ভব ঘটিয়া জার্মান জাতি ক্রমেই এক অনমনীয়, উদ্ধত এবং সর্বাত্মক প্রাধান্যের নীতি অনুসরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

জার্মানির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতার সুযোগে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ও সর্বাত্মক প্রাধান্য নীতির অনুসরণ

দ্বিতীয়ত, জার্মানি যখন নাৎসি দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিতে শুরু করিয়াছিল সেই সময়ে ইঙ্গ-

---

*"......He planned to turn the world into a German Colony", *Hitler's Second Book* (Vide a news item from Munich published in tb A. B. Patrika, June 18, 1961).

ফরাসী সরকারদ্বয়ের দুর্বলতা প্রদর্শন নাৎসি-নেতার সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। জার্মানির সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স কতকটা প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিল, ইহাও জার্মানির প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের তোষণ-মূলক নীতি অনুসরণের অন্যতম যুক্তি হিসাবে বিবেচ্য। জার্মানি কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল, মিউনিক চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক দখলের স্বীকৃতি, জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার, মেমেল বন্দর দখল প্রভৃতির স্বীকৃতি জার্মানির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণেরই ফলস্বরূপ। জার্মানি ভিন্ন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) জয় প্রভৃতিও ঐ একই নীতির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর দুর্বলতা লীগের প্রভাবশালী সদস্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি, জাপান ও ইতালি তোষণেরই ফল বলা বাহুল্য। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দণ্ডায়মান না হইবার ফলে হিট্‌লার-মুসোলিনির একক অধিনায়কত্ব-নীতি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। গণতন্ত্রের এই নৈতিক পরাজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গের মৈত্রী একক প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই বাহ্য প্রকাশ, বলা বাহুল্য।

> জার্মানি, ইতালি, জাপান তোষণ : ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতা

> বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গ

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে যখন জার্মানি ডান্‌জিগ্‌ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনমতের চাপে এবং জার্মানির রাজ্যলিপ্সা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধা-দানে কৃতসংকল্প হইল। পক্ষান্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানির অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির যুদ্ধ শুরু করিবার পথে শেষ বাধা দূরীভূত হইল এবং জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল।

> রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি, পোল্যাণ্ড আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্রের পরস্পর আদর্শগত দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর প্রধান শক্তিবর্গ তখন এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানি, ইতালি, জাপান অক্ষ-শক্তিবর্গ একক অধিনায়কত্ব, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের ধারক ছিল আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

আমেরিকা ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অনুরূপ। গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্ব উভয়েই ছিল সাম্যবাদের শত্রু। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যে শত্রু হইতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে উহার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে কিছুকাল যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শেষে একক অধিনায়কত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া গণতন্ত্রের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষেও রুশ সাহায্য তখন প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্বের আদর্শগত দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচ্য। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বই ছিল যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

একক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

চতুর্থত, জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল এবং সেই সূত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ লীগের দুর্বলতা সর্বসমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। অনুরূপ ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল এবং তাহা প্রতিহত করিতে লীগের অকর্মণ্যতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অপরাপর শক্তিবর্গের দুর্বলতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া জার্মান-ইতালি-জাপানের ঔদ্ধত্য এবং আত্মপ্রত্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল দেশের নিজ শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা তাহাদিগকে স্বভাবতই যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপান ও ইতালি কর্তৃক যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা

পঞ্চমত, জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বটে, কিন্তু এই আক্রমণ যদি কেবল পোল্যাণ্ড জয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিত তাহা হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ দেশ। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। পোল্যাণ্ড লীগ-অব ন্যাশন্স্-এর শর্তাদির উপেক্ষা করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তি অমান্য করিয়া চলিয়াছিল। এই সকল কারণে জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অসন্তুষ্টির কারণ হইত না, কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণ হিট্‌লারের অপরিতৃপ্ত রাজ্যগ্রাস-স্পৃহার অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এই রাজ্য-

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইবার কারণ

গ্রাস-নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়াই ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত একযোগে জার্মানিকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসান ও শান্তিচুক্তিসমূহ (End of the war : Peace treaties): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর চালু ছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যাকার্থারের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পূর্বেই (৭ই মে, ১৯৪৫) জার্মানি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল। নাৎসি ফুহ্‌রার হিট্‌লার অবশ্য ইহার কয়েকদিন পূর্বেই (১লা মে, ১৯৪৫) আত্মহত্যা করিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে অপমানিত হইবার আশঙ্কা এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

যুদ্ধাবসান, ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহের জনসাধারণ দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান পবিত্রকার্য বলিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল সেইরূপ কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে বাস্তবতার প্রভাবই ছিল অধিক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যুদ্ধে যোগদানই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তথাপি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদানে বাধ্য হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে পৃথিবীর সকল প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পজাত সামগ্রী এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণের প্রাণ এবং সম্পত্তিনাশের পরিমাণ স্বভাবতই ছিল অভাবনীয়।

দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চাদর্শ অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর প্রভাব

যুদ্ধের পদ্ধতির দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তথা অপরাপর যে-কোন যুদ্ধ অপেক্ষা পৃথক ছিল। উন্নত ধরনের বিমানবহর, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহার ভিন্ন আণবিক বোমার ব্যবহার এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচ্য। প্রচারকার্য এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। রেডিও,

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-পদ্ধতির পার্থক্য

প্রচারপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা এবং শত্রুদেশের জনসাধারণের মনে ভীতির সৃষ্টি করা ছিল এ যুদ্ধকালীন প্রচারকার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনাকীর্ণ শহরাঞ্চলে জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারকারী বোমা (antipersonnel bomb) নিক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে শহরাঞ্চল ত্যাগে বাধ্য করা এবং তাহার ফলে শত্রুদেশের সামরিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও জিনিসপত্রের দ্রুত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করাও ছিল এই যুদ্ধপদ্ধতির অন্যতম নীতি।

প্রচারকার্যের প্রভাব

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে যে-সকল ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরাজিত শক্তিবর্গের সহিত শান্তিচুক্তি রচিত হইয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরে এক জাহাজে সাক্ষাৎকারের পর উভয়ে যে ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন তাহা 'আট্‌লান্টিক চার্টার' (Atlantic Charter) নামে অভিহিত। এই চার্টার বা সনদে ব্রিটেন ও আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পররাষ্ট্রের কোন অংশ গ্রাস করিবে না, পৃথিবীর সকল অংশের লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবে, নাৎসি শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে, পৃথিবীর সকল অংশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য-অধিকার স্বীকার করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি-রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবে—এই সকল শর্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কা নামক স্থানে রুজ্‌ভেল্ট্ ও চার্চিলের মধ্যে পুনরায় যে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাতে সামরিক আলাপ-আলোচনা ভিন্ন ইতালি ও সিসিলি আক্রমণ ও অক্ষ-শক্তিবর্গকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবগণ সম্মিলিত হইয়া শত্রুপক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ইতালিকে ফ্যাসিজমের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে ইতালির শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করেন। মস্কো

'আট্‌লান্টিক চার্টার'

ক্যাসাব্লাঙ্কা কন্‌ফারেন্স (১৯৪৩)

ব্রিটেন-আমেরিকা-সোভিয়েত পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলন

মস্কো ঘোষণা

হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, হিট্‌লার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গ মানিবে না এবং অষ্ট্রিয়াকে জার্মানির অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাইরোতে রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও চিয়াং-কাইশেক্‌ মিলিত হইয়া জাপানকে পরাজিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার নীতি গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রসার হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন বিরত থাকিবে বলিয়া রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও চিয়াং-কাইশেক প্রতিশ্রুত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে সকল স্থান বা দেশ অধিকার করিয়াছে এবং চীন হইতে মাঞ্চুরিয়া, পেস্‌কাডোরিস, ফরমোজা প্রভৃতি যে সকল স্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাপান দখল করিয়া লইয়াছিল সেই সকল স্থান হইতে জাপানকে বিতাড়নের নীতিও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার, ফরমোজা, মাঞ্চুরিয়া ও পেস্‌কাডোরিস প্রভৃতি চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছিল।

কাইরো সম্মেলন (১৯৪৩)

কাইরো সম্মেলনের অল্পকালের মধ্যে রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও স্টালিন্‌ তেহরাণে এক সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলনে এই তিন দেশের সমর অধিনায়কগণও উপস্থিত ছিলেন। সামরিক দিক্‌ দিয়া এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহাতেই জার্মানিকে পরাজিত করিবার সামরিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ইরাণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান, যুগোস্লাভিয়াকে সাহায্য দান এবং নরওয়ের উপকূলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া কর্তৃক নরওয়ে আক্রমণ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়।

তেহরাণ সম্মেলন (১৯৪৩)

উপরি-উক্ত সম্মেলনের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (২১শে জুলাই) ডাম্‌বার্টন ওক্‌স্‌ (Dumbarton Oaks) নামক স্থানে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কন্‌ফারেন্সে মোট পঁচিশটি প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মূল নীতি ছিল এই যে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার কার্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুগ্ম চেষ্টা, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে স্থাপিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। শান্তিরক্ষার

ডাম্‌বার্টন ওক্‌স্‌ কন্‌ফারেন্স (১৯৪৪)

কার্যে যুগ্ম চেষ্টা, মধ্যস্থতা, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সামরিক বলপ্রয়োগ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স. (১৯৪৫)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির পরাজয় যখন প্রায় নিশ্চিত তথন রুজ্‌ভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন ক্রিমিয়ার ইয়াণ্টা নামক স্থানে সমবেত হইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উদ্দেশ্য

ইয়াণ্টা কন্‌ফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল : (১) পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা, (২) জার্মানি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) পোল্যাণ্ড-এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা, (৪) জাপানের পরাজয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, (৫) যুদ্ধ-অপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৬) ইঙ্গ-রুশ-মার্কিন মিত্রবর্গের মৈত্রী বজায় রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

এই কন্‌ফারেন্সে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমত, একটি নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থা—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ অর্গেনাইজেশন (United Nations Organisation) গঠনের উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্কো নামক স্থানে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে স্থির করা হয়। কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে এবং সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি কিভাবে পরিচালিত হইবে সেই সকল বিষয়েও ইয়াণ্টা কন্‌ফারেন্সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ সংস্থার সনন্দ রচনা করা, এই সংস্থার নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)-এর স্থায়ী সদস্য-পদে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনকে গ্রহণ করা এবং অছি-পরিষদের (Trusteeship Council) অধীনে কোন্ কোন্ রাজ্যাংশ স্থাপিত হইবে তাহা ইয়াণ্টা কন্‌ফারেন্সে স্থির করা হয়। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রকে ভিটো (Veto) প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত ইউক্রাইন এবং বাইলোরাশিয়া পৃথক পৃথক ভাবে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য-পদভুক্ত হইবে স্থির হওয়ায় সদস্য সংখ্যার দিক্ দিয়া রাশিয়া অত্যন্ত লাভবান হইল।

পরাজিত জার্মানির উপর হইতে নাৎসি প্রাধান্যের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা

এবং জার্মানিকে চারিটি অধিকৃত অঞ্চলে (Occupation Zones) ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্সের অধীনে স্থাপন করা হইবে। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের আলোচনায় একশত কোটি ডলার নিম্নতম পরিমাণ হিসাবে ধরিতে হইবে, জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর মিত্রশক্তিবর্গের অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইবে, নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সেই সকল দেশের জনসাধারণের ইচ্ছানুক্রমে শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন, জার্মান যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার প্রভৃতি সিদ্ধান্ত ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল জার্মানিকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি, বিদেশে জার্মানির বিনিয়োগ করা (invested) অর্থ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ বা শেয়ার প্রভৃতি দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হইবে স্থির হইল। সোভিয়েত রাজধানী মস্কোতে ক্ষতিপূরণ কমিশনের অধিবেশন বসিবে, এই কমিশন কর্তৃক জার্মানি কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে এবং জার্মানির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে সেজন্য মিত্রপক্ষীয় একটা যুগ্ম সমিতি (Allied Control Council) বার্লিনে স্থাপিত হইবে এই সকল সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়।

জার্মানি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

হিট্‌লার পোল্যাণ্ড অধিকার করিলে তদানীন্তন পোল্যাণ্ড-সরকার লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে স্থির হইল যে, লণ্ডনস্থ পোল্যাণ্ড-সরকার এবং ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে যে সরকার চালু ছিল এই দুইয়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে। এই অস্থায়ী সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যাণ্ডের স্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা পূর্বদিকে 'কার্জন লাইন' (Curzon Line) পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে পোল্যাণ্ডের যে পূর্ব-সীমা ছিল তাহা হইতে কার্জন লাইন কতকটা পশ্চিমে ছিল, ফলে পূর্বদিকে পোল্যাণ্ডকে যে পরিমাণ স্থান হারাইতে হইবে উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে উত্তর ও পশ্চিম দিকে পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা সেই পরিমাণে প্রসারিত করা হইবে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকের রাজ্যসীমার সহিত জার্মানির রাজ্য হইতে কতকাংশ লইয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এজন্য জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পর্যন্ত পোল্যাণ্ডকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

জাপান সম্পর্কে স্থির হয় যে, জার্মানির পতনের অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহার বিনিময়ে জাপান কর্তৃক অধিকৃত শাখালিন ও উহার সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিতে হইবে, পোর্ট আর্থার নৌ-ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য রাশিয়াকে বন্দোবস্ত দিতে হইবে এবং চীনের ইষ্টার্ণ বা পূর্ব-রেলপথ ও সাউথ অর্থাৎ দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের পরিচালনার ভার চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার উপর যুগ্মভাবে ন্যস্ত হইবে। ইহা ভিন্ন দাইরেন বন্দরটি (Port Dairen) আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করা হইবে। কিউরাইল (Kurile) দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে অপরাধীদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে সেবিষয়েও রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রিবর্গ ভবিষ্যতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন, এই সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়। পৃথিবীর নিরাপত্তা, শান্তি ও গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখিবার জন্য রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই উদ্দেশ্যে কিছুকাল অন্তর একত্রে মিলিত হইবার প্রতিশ্রুতিও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে দেওয়া হয়।

জাপান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুতের ব্যবস্থা

রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। প্রথমত, এই কনফারেন্সেই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ অর্গেনাইজেশন গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভিটো প্রদান-সংক্রান্ত মতানৈক্য দূরীভূত হয়। যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সংগঠন এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা বাহুল্য।

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের গুরুত্ব :
(১) ইউ. এন. ও. আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপন

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানি যাহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য জার্মানির ঐক্য বিনাশ করিয়া জার্মানিকে চারিটি বহিঃরাষ্ট্রের প্রাধান্যাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। ফলে জার্মানি ইওরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতা হারাইয়াছিল। পরবর্তী কালে জার্মানির চারি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে সংগঠিত হইলেও জার্মানির পূর্ব ক্ষমতা ও প্রাধান্য নাশপ্রাপ্ত

(২) জার্মানির ক্ষমতা নাশ—
মধ্য ইওরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার

হইল। বার্লিন শহরেও উপরি-উক্ত চারিটি শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। জার্মানির একাংশের উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য স্থাপনের ফলে মধ্য-ইওরোপে রাশিয়া সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে সরাসরি অংশ গ্রহণের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

(৩) সুদূর প্রাচ্যে রুশ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার

তৃতীয়ত, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলে (Far East) রাশিয়াকে নানাপ্রকার সুযোগদানে রাজী হইয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধের পূর্বতন এশীয় মহাদেশে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তাহা ফিরিয়া পাইয়াছিল। রাশিয়া সুদূর প্রাচ্যে বিমান, নৌ ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

পটস্‌ডাম কনফারেন্স (Potsdam Conference)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির পরাজয় ও হিট্‌লারের আত্মহত্যার পর ১৭ই জুলাই বার্লিন কন্‌ফারেন্স বা পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স্ (Potsdam Conference)-এ জোসেফ স্টালিন, ট্রুম্যান ও ক্লীমেণ্ট এট্‌লী সম্মিলিত হন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুতে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্থলে লেবার দলের নেতা ক্লীমেণ্ট এট্‌লী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন।) পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই হইতে ২রা আগস্ট পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই কন্‌ফারেন্সে সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—এই তিন দেশের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে, এই তিন দেশ, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীনের (চিয়াংকাই-শেকের অধীন চীনের) পররাষ্ট্র-মন্ত্রিবর্গ লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হইবে। এই কাউন্সিলের কর্মকেন্দ্র হইবে লণ্ডন। তবে অপরাপর দেশের রাজধানীতে এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসিতে পারিবে।

সিদ্ধান্ত

পররাষ্ট্র-মন্ত্রিবর্গের কাউন্সিল

এই কাউন্সিলের সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত মিত্রপক্ষের শান্তি-চুক্তি-পত্র প্রস্তুত করা। জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে এই কাউন্সিলের সাহায্যে জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষের শান্তি-চুক্তি রচনা করা হইবে একথাও বলা হইয়াছিল।

জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর যে আধিপত্য ভোগ করিবে উহার নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নীতি ও পদ্ধতি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অধিকৃত জার্মানির আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্ম নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত

(১) পরাজিত জার্মানির উপর সোভিয়েত, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। যে অঞ্চল যে সরকারের অধিকারে ছিল সেই অঞ্চলে সেই সরকারের সেনাপতি সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন স্থির হইল। কিন্তু সমগ্র জার্মানির স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়াদি যুগ্মভাবে স্থিরীকৃত হইবে এই নীতি গৃহীত হইল। এই ধরনের কাজের জন্য উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সেনাপতিদের লইয়া একটি 'নিয়ন্ত্রণ সমিতি' (Control Council) গঠন করা হয়। (২) নাৎসি দল বা ন্যাশন্যাল সোশিয়ালিস্ট্ দলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে এবং নাৎসি আমলের আইন-কানুন, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থার অ-কেন্দ্রীকরণ এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প-পরিবহন-সংক্রান্ত বিষয়াদি Control Council বা 'নিয়ন্ত্রণ সমিতির' তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হইল। জার্মানিতে কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকিবে না বটে, কিন্তু অর্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উপরি-উক্ত বিষয়াদির জন্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিভাগ (Central General Administrative Departments) স্থাপিত হইল। এগুলি অবশ্য নিয়ন্ত্রণ সমিতির (Control Council) নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবে স্থির হইল। (৪) নাৎসি যুদ্ধ অপরাধীদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত বিচার করা হইবে। (৫) অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমগ্র জার্মানিকে একটি সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এজন্য শিল্প, খনি, আমদানি, রপ্তানি, বাণিজ্য, মৎস্যচাষ, কৃষি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, ভোগসামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন, মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্মভাবে এই প্রকার নীতি প্রয়োগ করা হইবে। কেবলমাত্র সামরিক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের দিক্ দিয়া জার্মানি রুশ, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর
মিত্রশক্তি অধিকৃত জার্মানি
জার্মানি কর্তৃক হস্তান্তরিত স্থান
উত্তর-সাগর
হ্যামবুর্গ
ব্রিমেন
হল্যাণ্ড
ব্রিটিশ অধিকৃত
বেলজিয়াম
জা র্মা নি
রুশ অধিকৃত
বার্লিন
স্টেটিন
পূর্ব প্রাশিয়া
ওয়ারসো
পোল্যাণ্ড
প্রাগ
চেকোস্লোভাকিয়া
সার
ফরাসী
অধিকৃত
ফ্রান্স
মার্কিন অধিকৃত
মিউনিক
সুইটজারল্যাণ্ড
অস্ট্রিয়া
ভিয়েনা
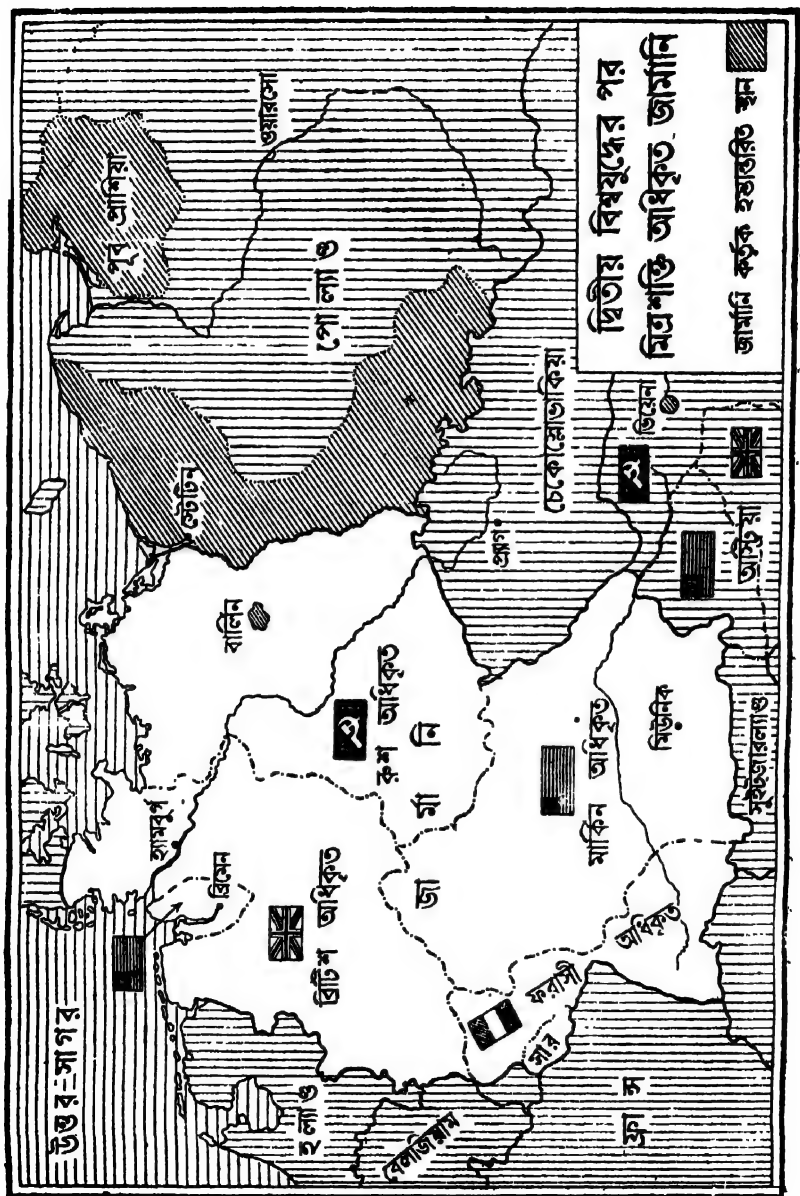
ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপারে পটস্ডাম কন্ফারেন্সে স্থির হইল যে, জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। জার্মান জনসাধারণ যাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া নিজ অধিকৃত জার্মান অঞ্চল হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে, অপরাপর শক্তিবর্গও তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চল হইতে উহা আদায় করিবে, কিন্তু যেহেতু রুহ্র (Ruhr) ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে ছিল এবং জার্মানিতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সেই সময়ে রাশিয়ার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল সেজন্য জার্মানির নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন যন্ত্রপাতির ১৫ শতাংশ রাশিয়াকে সরবরাহ করা হইবে স্থির হইল। অবশ্য এজন্য রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চল হইতে সম-মূল্যের খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি দিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা

জার্মানির ডুবো জাহাজগুলি সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া স্থির হইল, কেবলমাত্র জার্মান ডুবো জাহাজ-নির্মাণ কৌশল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন মোট ত্রিশটি ডুবো জাহাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলিও এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

জার্মান যুদ্ধজাহাজ ও ডুবো জাহাজ রাশিয়া-আমেরিকা-ব্রিটেনের মধ্যে বণ্টন

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ইয়াণ্টা কন্ফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই অনুসারে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন স্থায়ী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া পটস্ডাম কন্ফারেন্সে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকারকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে জানান হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমা প্রসারের প্রশ্নটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হইল।

পোল্যাণ্ড সমস্যা

পটস্ডাম কন্ফারেন্সে-এর অধিবেশন চালু থাকাকালীন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের

অবসান ঘটিল। কিন্তু আণবিক বোমার ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র সম্পর্কে আমেরিকা যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল তাহার ফলে ইওরোপীয় এবং বিশেষভাবে রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ঐ সময় হইতেই পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষ

এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পরাজিত বিভিন্ন শক্তির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের পটভূমিকা রচিত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী : শান্তি-চুক্তিসমূহ

(World After the Second World War : Peace Treaties)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে পৃথিবী (World After the Second World War) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্কের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন ইওরোপীয় মহাদেশের একক প্রাধান্য হ্রাস করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান দান করিয়া আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি বহুগুণে প্রসারিত করিয়াছিল, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপের প্রাধান্য নাশ করিয়া এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি ও ইতালির শক্তি ও গুরুত্ব হ্রাস করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহকেও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বৎসর (১৯৪৫) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ ছিল পরাধীন, কিন্তু বর্তমানে উহা ছয় শতাংশ অপেক্ষা কম হইয়া গিয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ, ঔপনিবেশিকতার দ্রুত অবসান, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবসান, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ প্রভৃতি এক নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে।

নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—ইওরোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস

এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফল হইল পৃথিবীর শক্তিবর্গের দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'ব্লক' বা রাষ্ট্রজোট গঠন। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—এই দুইটি সংগঠনে বিভক্ত।

পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তে। পৃথিবীর এইরূপ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্তি Polarisation of the World নামে অভিহিত। বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সমস্যা এবং স্বরূপই হইল এই Polarisation বা দুই অংশে বিভক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া অভাবনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এস্তোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, বেসারাবিয়া, বুকোভিনার উত্তরাংশ, পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ, টুভা, পেস্টামো, প্রাশিয়ার উত্তরাংশ, কিউরাইল, শাখালিন, রুথেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল। ফলে, মোট আড়াই লক্ষ-বর্গ-মাইলেরও অধিক স্থান রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, আল্‌বেনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় রাশিয়ার মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব সবই অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাশিয়ার সার্থক নেতৃত্ব সাম্যবাদের জয়েরই পরিচায়ক।

পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিম অঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—পৃথিবী পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত (Polarisation of the World)

ইওরোপে জার্মানি ও ইতালির পতন, সুদূর প্রাচ্যে জাপানের পতন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে এই তিনটি দেশ যে শক্তি ও প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কেবল নামেমাত্রই 'বৃহৎ রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হইতেছে, বস্তুত, এই দুই দেশের প্রাধান্যের যুগের অবসান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই ঘটিয়াছে। অনুরূপ সুদূর প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত চীনও কেবল নামে মাত্র বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লবের পূর্বাবধি চীনের অবস্থা এইরূপই ছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের ও শক্তির এইরূপ পরিবর্তন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হইবার ফলেই বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃথিবীর শক্তিবর্গ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইবার ফলে উদ্ভূত বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সাম্রাজ্যবাদী তোষণনীতির পরিবর্তন এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক Good Neighbour-Policy অনুসরণের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা অর্থাৎ দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমতাই কেবল বৃদ্ধি পায় নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তামূলক মিত্রতা ব্রাজিল, গুয়াটেমেলা, এল-স্যালভাডোর প্রভৃতিতে স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্বের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল। পেরু ও ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ এবং একাদিক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ, সামাজিক ও অর্থনেতিক অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ী শক্তির দুর্বলতা এবং জার্মানি, ইতালি প্রভৃতির পরাজয় ও পতনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উপর চরম আঘাত হানিয়া পৃথিবীর রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

গণতন্ত্রের পথে ল্যাটিন আমেরিকার অগ্রগতি

দক্ষিণ-আফ্রিকার জাগরণ

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার পন্থা হিসাবে যুদ্ধ যে মোটেই সহায়ক নহে, এই শিক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যতটুকু সাহায্য করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সংখ্যক নূতন এবং জটিলতর সমস্যা এই যুদ্ধের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি সমস্যা, ঔপনিবেশিক সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা, আণবিক শক্তি এবং অনুরূপ মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সমস্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

শান্তি-চুক্তিসমূহ (Peace Treaties): পট্‌সডাম কন্‌ফারেন্সে ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, জাতীয়তাবাদী চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের লইয়া যে কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers) গঠিত হইয়াছিল উহার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির সহিত ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গের শান্তি-চুক্তি প্রস্তুতের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরি-উক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গ ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড—এই পাঁচটি দেশের সহিত শান্তি-চুক্তি প্রস্তুতের

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে সমবেত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ক্রমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের সংহতি বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্‌ এবং অপরাপর দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য হেতু যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায়। যাহা হউক,

রাশিয়া ও পশ্চিমী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতানৈক্য

ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে শান্তি-চুক্তি প্রস্তুতের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পরবৎসর (১৯৪৬) প্যারিসে পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গের কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। কিন্তু এই অধিবেশনেও ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার রাজ্যসীমা, ট্রিয়েস্ট্‌ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া ও অপরাপর দেশের প্রতিনিধি-বর্গের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিল। অবশেষে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদো (Bidault) ট্রিয়েস্ট্‌ সমস্যা সমাধানের এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনায় ট্রিয়েস্ট্‌ ও উহার সীমান্ত অঞ্চলকে দশ বৎসরের জন্য 'স্বাধীন অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা এবং উহার শাসনব্যবস্থা রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া ও ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করিবার এবং উহার নিরাপত্তার ভার ইউনাইটেড্‌ ন্যাশন্‌স্‌-এর নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) হস্তে দিবার প্রস্তাব করা হইল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারিত হইল। ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন লইয়াও প্রথমে মতানৈক্য দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে ইতালি হইতে অন্তত দশ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে স্থির হইলে এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইল। অনুরূপ ইতালীয় উপনিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসাও সম্ভব হইলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই মোট ২১টি দেশের প্রতিনিধিগণ প্যারিস নগরীতে শান্তি-চুক্তি রচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন।

মস্কো কন্‌ফারেন্স (ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

প্যারিস কন্‌ফারেন্স (এপ্রিল, ১৯৪৬)

ট্রিয়েস্ট সমস্যা, ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও ইতালীয় উপনিবেশ বণ্টনের সমস্যা ও জটিলতা—সমাধান

প্যারিস শান্তি সম্মেলন আহূত

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রথম হইতে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাবের নগ্ন

প্রকাশ শুরু হইল। শান্তি সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি হইতে শুরু করিয়া সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই দীর্ঘ বিতর্ক ও পরস্পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এক দৃঢ় অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার আপত্তি ও দাবির অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইল। ইতালি ভিন্ন অপরাপর চারিটি দেশ—রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও ফিন্‌ল্যাণ্ড রাশিয়ার সন্নিকটস্থ এবং রুশ প্রভাবিত ছিল। এগুলির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্ (Molotov)-এর মতের প্রাধান্য দেওয়া হইল। উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মোট নয়টি কমিটি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল এবং মোট তিনশত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিতর্কের পর মোট ৯৪টি বিষয়ে শান্তি-চুক্তিগুলির খসড়া পরিবর্তিত হইল। অতঃপর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অধিবেশনের কালে নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যখন সমবেত হইলেন তখন সেই সুযোগে শান্তি-চুক্তিগুলির শর্তাদি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের পুনরায় অধিবেশন শুরু হইল। এই সম্মেলনে মোট ২১টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও ইতালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (২৯শে জুলাই, ১৯৪৬)

পাঁচটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)

(১) ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Italy) : ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তি-চুক্তির শর্তানুসারে ইতালীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল। (১) লিবিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও এরিট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে উপরি-উক্ত 'বৃহৎ চারি' (The Big Four) দেশের মধ্যে কোনপ্রকার মতানৈক্য ঘটিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভা উহার মীমাংসা করিবে স্থির হইল। (২) ইতালি মণ্ট্ টেবর, মণ্ট্ সাইন, টেণ্ডা, বিগ্রা, সেণ্ট্ বার্ণার্ড, চেম্বার্টন প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সকে ; জারা, পেলাগোসা, ল্যাগোস্টা ও ডালম্যাশিয়ার উপকূল অঞ্চল যুগোস্লাভিয়াকে ; ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ও রোড্‌স গ্রীসকে এবং সেসানোর দ্বীপ

শর্তাদি

আল্‌বেনিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। (৩) ট্রিয়েস্ট্‌ ইস্ট্রিয়া, ভেনেজিয়ার একাংশ 'স্বাধীন অঞ্চল' (Free Territory) বলিয়া ঘোষিত হইল। (৪) ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার সীমার নিকটবর্তী যাবতীয় ইতালীয় দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইতালি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈনিক, বিমানবাহিনীর জন্য মোট ২৫ হাজার সামরিক কর্মচারী, দুইশত যুদ্ধ-বিমান ও ১৫০টি অপরাপর বিমান, ২টি যুদ্ধ জাহাজ এবং ৪টি ক্রুইজারের বেশি সামরিক শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে না। (৫) ইথিওপিয়া ও আল্‌বানিয়ার স্বাধীনতা ইতালিকে স্বীকার করিতে হইবে এবং সাত বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ১০০ মিলিয়ন ডলার,আল্‌বানিয়াকে ৫ মিলিয়ন ডলার, ইথিওপিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার, গ্রীসকে ১০৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) আফ্রিকাস্থ ইতালীয় উপনিবেশের উপর ইতালিকে অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) রুমানিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Rumania): রুমানিয়া হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ট্রান্সিলভ্যানিয়া ফিরিয়া পাইল, কিন্তু উত্তর বুকোভিনা ও বেসারাবিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে এবং বুলগেরিয়াকে দক্ষিণ দব্‌রুদ্‌জা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া আট বৎসরের মধ্যে ৩০৩ মিলিয়ন ডলার রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইল। রুমানিয়ার সৈন্যসংখ্যা, নৌ-বল, বিমানবাহিনী প্রভৃতির সংখ্যাও হ্রাস করা হইল।

শর্তাদি

(৩) বুলগেরিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Bulgaria): বুলগেরিয়া রুমানিয়ার নিকট হইতে দক্ষিণ দব্‌রুদ্‌জা লাভ করিল। বুলগেরিয়াকে অবশ্য কোন স্থান হারাইতে হইল না। কিন্তু আট বৎসরের মধ্যে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসকে মোট ৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইল। ইহা ভিন্ন বুলগেরিয়াকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী হ্রাস করিতে হইল। গ্রীসের সীমার সন্নিকটে বুলগেরিয়ার কোনপ্রকার সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ রাখা নিষিদ্ধ হইল।

শর্তাদি

(৪) হাঙ্গেরীর সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Hungary) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হাঙ্গেরীর যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু রুমানিয়ার নিকট হইতে হাঙ্গেরী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সিলভ্যানিয়ার যে অংশ

শর্তাদি

জয় করিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আট বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ২০০ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ও চেকোস্লোভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইতে হইতে হইল।

(৫) ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Finland): ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যে সীমারেখা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রাশিয়ার সহিত চুক্তিদ্বারা কেরেলিয়া যোজক, পেস্টামো, স্থালা অঞ্চল এবং পঞ্চাশ বৎসরের জন্য পোরখালার বন্দোবস্ত প্রভৃতি যাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন ফিন্‌ল্যাণ্ডে উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারা আট বৎসরে তিনশত মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ রাশিয়াকে দিতে এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে বাধ্য হইল।

শর্তাদি

উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তি-চুক্তির আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল চুক্তির ফলে রাশিয়াই সর্বাধিক লাভবান হইয়াছিল। রাজ্যসীমা বিস্তৃতি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য প্রভৃতির দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তি-চুক্তি রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন, একথা বলা যাইতে পারে।

রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্য

অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি (.Peace Treaty with Austria): জার্মানির ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ, যথা রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ইতালি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পর অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের কালে রাশিয়া ও অপরাপর শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপ্রসূত মতানৈক্য তীব্র আকারে দেখা দিল। জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অষ্ট্রিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক নাৎসি অধিকার-মুক্ত হয়। ঐ বৎসর রাশিয়া কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল রেনার (Karl Renner) নামক জনৈক অষ্ট্রীয় নেতার নেতৃত্বাধীনে অষ্ট্রিয়ায় একটি সামরিক সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রশিয়া কর্তৃক গঠিত অষ্ট্রিয়ার সাময়িক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে, মিত্রশক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়াকে আর শত্রু দেশ বলিয়া মনে করিত না। সেইজন্য নাৎসি অধিকার হইতে মুক্ত অষ্ট্রিয়ার প্রতি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স

রাশিয়া কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার মুক্তিসাধন ও অস্থায়ী সরকার গঠন

উদারতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়া অষ্ট্রিয়া হইতে যুগোস্লাভিয়ার জন্য এক বিরাট রাজ্যাংশ দাবি করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর যে সকল তৈল খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-স্বার্থ অষ্ট্রিয়াবাসী জার্মানির নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল সেই সকল প্রতিষ্ঠান তথা অষ্ট্রিয়াস্থিত জার্মানির যাবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থও রাশিয়া দাবি করিয়া বসিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে নাৎসি সরকার যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তি আদায় করিয়া লইয়াছিল তাহা অষ্ট্রিয়াকে পুনরায় ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানি অষ্ট্রিয়াস্থ মার্কিন ও ব্রিটিশ তৈল প্রতিষ্ঠানগুলিও অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অষ্ট্রিয়াকে যদি জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থ পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। এজন্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়াকে এই সকল সম্পত্তির মালিকানা ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। ফলে, রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহাতে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হইল না, অষ্ট্রিয়ার রাজ্যসীমায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সৈন্য মোতায়েন করা হইল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তির শর্তাদির ব্যাপারে রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন মতানৈক্য

১৯৪৭—১৯৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শান্তি-চুক্তি প্রস্তুতের চেষ্টার আংশিক সাফল্য

১৯৪৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ (**Foreign Ministers' Council**) অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি খসড়ার মাত্র কয়েকটি শর্ত মানিয়া লইয়াছিল। মস্কো (মার্চ ১৯৪৭), লণ্ডন (ডিসেম্বর ১৯৪৭) ও প্যারিসে (মে-জুন ১৯৪৬) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান সম্ভব হইল। যুগোস্লাভিয়ার জন্য রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার যে একাংশ দাবি করিয়াছিল তাহা রাশিয়া ত্যাগ করিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অষ্ট্রিয়াস্থ জার্মান সম্পত্তি সম্পর্কে রাশিয়ার দাবির অনেকটাই স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে অষ্ট্রিয়ার পশ্চিম অংশে সামরিক সাজসজ্জা বৃদ্ধি, ট্রিয়েস্ট্ সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক উহার শর্তভঙ্গ প্রভৃতি প্রশ্ন রাশিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত হইলে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রহিল।

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গ অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি সম্পাদনের জন্য পুনরায় সচেষ্ট হইলেন। এবিষয়ে তাঁহারা একটি খসড়াও প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না। এইভাবে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্টালিনের মৃত্যু ঘটিলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পুনরায় এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত বার্লিনে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা বসিল। কিন্তু রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্-এর অনমনীয়তার ফলে এইবারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মলটভ্ সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় আইনসভা 'সুপ্রীম সোভিয়েত' (Supreme Soviet)-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে সোভিয়েত-নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে তিনি তিনটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন : (১) অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তি নিষিদ্ধকরণ, (২) অষ্ট্রিয়ার নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্থাপন ও (৩) রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন প্রতিনিধিবর্গের কন্‌ফারেন্সে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ। ইহার পর অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর জুলিয়াস রা-ব (Julius Rabb)-কে মস্কোতে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইল। অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ফিগ্‌ল ও চ্যান্সেলর রা-ব মস্কো নগরীতে মার্শাল বুল্‌গানিন ও মলটভের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ফলে, সোভিয়েত সরকার অষ্ট্রিয়া হইতে সৈন্য অপসারণে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত একযোগে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে এবং দশ মিলিয়ন টন খনিজ তৈল এবং ১৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অষ্ট্রিয়ার শিল্প, বাণিজ্য, তৈলখনি প্রভৃতি অষ্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে অষ্ট্রীয় সরকার কোন শক্তির সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন বা অষ্ট্রিয়ার কোন স্থানে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দান করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে আর কোন বাধা রহিল না। ১৯৫৫

রাশিয়ার অনমনীয় নীতির পরিবর্তন—সুপ্রীম সোভিয়েতে মলটভের বক্তৃতায় রুশ-নীতির ব্যাখ্যা

সোভিয়েত রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মতৈক্য

খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে ভিয়েনায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতগণ অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে (১) অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইল। (২) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে অষ্ট্রিয়ার যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় নির্ধারিত হইল। (৩) জার্মানির সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি (**Auschluss**) নিষিদ্ধ হইল। (৪) কোন কোন বিশেষ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র অষ্ট্রিয়ার পক্ষে রাখা চলিবে না এই শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। (৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ, নাৎসি প্রতিষ্ঠান মাত্রেই নিষিদ্ধকরণ এবং দানিউব নদীতে সকলের অবাধভাবে নৌচালনার অধিকার, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ প্রভৃতি শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। এইভাবে অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত [১৫ই মে, ১৯৫৫]

শর্তাদি

জার্মানির সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সমস্যা (Problem of Peace Treaty with Germany) : জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে মতানৈক্য প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে অদ্যাপি এবিষয়ে কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির পতনের পর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অধিকৃত হয়। এই সকল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে তাহারা পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরও অনুরূপ চারিভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু সমগ্র শহরের শাসনকার্য যাহাতে একইরূপে পরিচালিত হইতে পারে সেজন্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থাৎ রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ (**Inter-Allied Body**) স্থাপিত হয়। ইহা ভিন্ন সমগ্র জার্মানির শাসনকার্যের মধ্যে যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে 'কন্ট্রোল কাউন্সিল' (**Control Council**) নামে একটি পরিষদও স্থাপিত হয়। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর অধিনায়কগণ নিজ নিজ

রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

'কন্ট্রোল কাউন্সিল' স্থাপন

এলাকার শাসনকার্য কণ্ট্রোল কাউন্সিলের পরামর্শ ও সাহায্য-সহায়তা লইয়া সম্পাদন করিবেন এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথম হইতেই উপরি-উক্ত চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ দেখা দিল। রুশ প্রতিনিধি মলটভ্ জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং উহার কি পরিমাণ রাশিয়া পাইবে সেবিষয় স্থির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ অধিকৃত রুহ্‌র অঞ্চলের শাসন তথা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অংশও মলটভ্ দাবি করিলেন। ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য বাড়িয়া চলিল। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়, জার্মানির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐক্য বজায় রাখা, জার্মানির নাৎসিবাদের অবসান, জার্মানির সামরিক নিরস্ত্রীকরণ এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু বিবাদ শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোনপ্রকার মীমাংসা সম্ভব না হইলে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব বার্ণেস (Burnes) পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অধিকৃত জার্মানির অংশসমূহের ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জার্মানির ভয়ে ভীত ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন অংশ দুইটি সংযুক্ত হইল। জার্মানির সর্বাধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল হইল রুহ্‌র। এই অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারে ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন অংশদ্বয়ের সংযুক্তিতে রুহ্‌র অঞ্চলের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের হস্তে থাকিবে এবং রুশ বা ফরাসী সরকার এই ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবে না, এজন্য সোভিয়েত রাশিয়া এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিল। ফ্রান্স অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের সহিত যোগদান করিলে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইল (১৯৪৭)। কেবলমাত্র রাশিয়া ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই তিন সরকারের অধীন অঞ্চলসমূহ 'পশ্চিম-জার্মানি' এবং রুশ সরকার অধিকৃত অঞ্চল 'পূর্ব-জার্মানি' নামে অভিহিত হইল।

রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত জার্মানির (পশ্চিম-জার্মানি) অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপন

পরবৎসর (১৯৪৮ খ্রীঃ) বার্লিন শহরের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে ছিল সেই অংশ ভিন্ন অপরাপর অংশ এবং পশ্চিম-জার্মানির প্রতিনিধি লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন-

ফরাসী সরকার একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠন করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে উইমার সংবিধান সভা যে সংবিধান জার্মানিতে চালু করিয়াছিলেন সেই সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত 'বন সংবিধান' (Bonn Constitution) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হইলে পশ্চিম-জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু হইল। ইতিপূর্বেই পশ্চিম-জার্মানিতে এক নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিয়া এবং নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া পশ্চিম-জার্মানির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। রাশিয়াও নিজ অধিকৃত অঞ্চলে একটি নূতন শাসনব্যবস্থা চালু করিয়া নানাবিধ ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিল। এইভাবে জার্মানি দুইটি পরস্পর-বিরোধী অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানির উপর প্রাধান্য লইয়া যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূল কথা হইল এই যে, উভয় পক্ষই জার্মানিকে নিজের দলে টানিয়া অপর পক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্মানিকে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে, পক্ষান্তরে রাশিয়া পূর্ব-জার্মানিকে ইওরোপীয় মহাদেশের অন্তঃস্থলে সাম্যবাদের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। সুতরাং জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। [জার্মানির বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

পশ্চিম-জার্মানিতে বন্ সংবিধান প্রবর্তন

পূর্ব-জার্মানিতে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন

জার্মানিতে সাম্যবাদ ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি (Peace Treaty with Japan): ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৪ই তারিখে জাপান বিনা শর্তে মার্কিন সমর অধি-নায়ক ড্যগলাস্ ম্যাক্‌আর্থার (Douglas Mac Arthur)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং পরাজিত জাপানের উপর আমেরিকার একপ্রকার একক প্রাধান্য-ই স্থাপিত হইল। ব্রিটেন, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন প্রতিনিধিবর্গ লইয়া মিত্রপক্ষীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইলেও উহার উপদেশ গ্রহণ বা বর্জন ব্যাপারে জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনিই ছিলেন সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলের সর্বোচ্চ সমর অধিনায়ক। এমতাবস্থায় জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি ব্যাপারে কিংবা

জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক অংশ গ্রহণ

জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোরিয়ার যুদ্ধ, চীন বিপ্লব প্রভৃতির ফলে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব ঘটিল। অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হইল। আমেরিকা সহ মোট ৫২টি দেশ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির খসড়ার কয়েকটি শর্তের বিরোধিতা করিলেন। জাপানে বোনিন ও রিউকু (Bonin and Ryuku) দ্বীপ দুইটি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে স্থাপনের এবং জাপানে বিদেশী সৈন্য মোতায়েন রাখিবার শর্তগুলির পরিবর্তনের প্রস্তাব তিনি করিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান উহার কোন গুরুত্ব দান না করিলে ভারত সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল না। অবশিষ্ট ৫১টি দেশ সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া এই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট ৪৮টি রাষ্ট্র ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

চীনের বিপ্লব ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব

সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্স—শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত [৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১]

এই শান্তি-চুক্তির শর্তানুসারে জাপানকে কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইহা ভিন্ন কোয়েলপার্ট দ্বীপ, দাগেলেত ও হ্যামিল্টন বন্দর কোরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ফর্মোজা, কিউরাইল, শাখালিন, পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ, প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং চীনের উপর জাপান সর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিল। জাপান অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটাইতে এবং এবিষয়ে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। জাপানকে নিজ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এককভাবে অপর এক বা একাধিক মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হইল। চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশী সৈন্য জাপান ত্যাগ করিবে, কিন্তু জাপান

স্বেচ্ছায় যে-কোন মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী জাপানে রাখিতে পারিবে। অপর এক শর্ত দ্বারা জাপান শান্তি-চুক্তিতে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। শান্তি-চুক্তি বলবৎ হইবার সময় হইতে মোট চারি বৎসর জাপান শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইল। জাপানের নিকট হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিলে জাপান অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে এই কারণে স্থির হইল যে, মিত্রপক্ষীয় যে দেশ জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই দেশ ইচ্ছা করিলে জাপানের নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-সহায়তা লাভ করিতে পারিবে। যুদ্ধের পূর্বকালীন ঋণের ব্যাপারেও জাপান মহাজন দেশের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা করিবে। এই শান্তি-চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক উহা মীমাংসিত হইবে, স্থির হইল।

শান্তি-চুক্তির শর্তাদি

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করে নাই। স্বভাবতই এই শান্তি-চুক্তিও ভারত স্বাক্ষর করে নাই। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার জাপানের সহিত পৃথক্‌ভাবে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে জাপান ও ভারত পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত জাপানের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুই দেশ পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ অধিকার দানে স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য জাপানের প্রতি ভারত এক উদার, মিত্রতাপূর্ণ নীতি প্রথম হইতেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

ভারত-জাপান শান্তি-চুক্তি [১৯৫২]

জাপানের সহিত মিত্রপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের (সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫১) সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে একটি নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোট ২৯টি শর্তসম্বলিত এই জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির প্রথম শর্তানুসারে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের অভ্যন্তরে এবং সীমান্ত দেশে সামরিক, নৌ ও বিমান-বাহিনী মোতায়েন রাখিবার অধিকার দানে বাধ্য হয়। সুদূর প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শর্তটি জাপানের

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি (Japan-U.S. Security Pact)

উপর চাপাইয়া দিয়া জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংরক্ষিত দেশে পরিণত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।* দ্বিতীয় শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ভিন্ন জাপান অপর কোন রাষ্ট্রকে কোনপ্রকার অধিকার দিতে পারিবে না। তৃতীয় শর্তানুসারে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনাক্রমে জাপানের কোন্ কোন্ স্থানে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে, এই নীতি নির্ধারিত হয়। চতুর্থ শর্তানুসারে স্থির হয় যে, জাপান তথা সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ বা অপর কোন রাষ্ট্রজোটের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব হইবে মনে হইলেই জাপান ও মার্কিন সরকার এই নিরাপত্তা চুক্তির অবসান ঘটাইবে। অপরাপর শর্তের দ্বারা জাপানে প্রবেশকারী মার্কিন জাহাজ, বিমান প্রভৃতির কোন শুল্ক দিতে হইবে না এবং মার্কিন সরকারের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাপানে আনীত কোনপ্রকার সামগ্রীর উপর শুল্ক স্থাপন করা হইবে না, জাপানে অবস্থানকারী মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ মার্কিন সামরিক বিচারালয়ের অধীন থাকিবে। এই ধরনের নানাপ্রকার অতিরাষ্ট্রিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল।

শর্তাদি

---

*Vide Schuman.

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী : ঠাণ্ডা লড়াই
(After the Second World War : Cold War)

রাশিয়া (Russia) : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের সময় হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সম্বন্ধ পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির অন্যতম প্রধান কারণই ছিল এই পরস্পর অনাস্থা ও বিদ্বেষভাব। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে নিছক পরিস্থিতির চাপেই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অর্থাৎ আমেরিকা, বিট্রেন ও ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার এক কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর আন্তরিকতার কোন স্থান ছিল না। সুতরাং সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পরই রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ, অনাস্থা ও বিদ্বেষভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে প্রাধান্য বিস্তার ও রুশ-প্রভাবিত অঞ্চলের সীমাবৃদ্ধি এই বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি করিল।

রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা রুশ সরকারকে নাৎসি জার্মানির ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু অবস্থায়ই রাশিয়া বাল্‌টিক ও বলকান অঞ্চলে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া পূর্ব-ইওরোপকে তথা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহিল। ইহা ভিন্ন, জার্মানির সীমারেখা ধরিয়া রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও রাশিয়া করিতে লাগিল। বাল্‌টিক অঞ্চলে এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া, বলকান অঞ্চল ও জার্মানির সন্নিকটে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, আলবানিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি মোট এগারটি রাষ্ট্র ক্রমে রাশিয়ার কুক্ষিগত হইল। এই রাষ্ট্রগুলি 'জনসাধারণের গণতন্ত্র' (People's Democracy) নামে এক নূতন ধরনের সমাজতান্ত্রিক

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণ—পূর্ব-ইওরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার

শাসনব্যবস্থাধীনে স্থাপিত হয়। এই সকল দেশ নাৎসি জার্মানির অধিকার হইতে রাশিয়ার লালফৌজ কর্তৃক মুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেই রাশিয়া রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল গঠনের দিকে মনোযোগী হয়। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে অবশ্য এই নীতি সাফল্য লাভ করে। গ্রীসের উপর রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ব্রিটেনের বিরোধিতায় ব্যাহত হইয়াছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিন ও চার্চিল এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া গ্রীসের উপর ইংলণ্ডের এবং রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার উপর রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার উপর রুশ প্রাধান্য বিস্তার নীতির ব্যর্থতা

পূর্ব-ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের উপর রুশ প্রভাব রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ নৈতিক —এই তিনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সকল দেশের সহিত রাশিয়ার যোগসূত্র কমিনফর্মের শাখা ও স্থানীয় কমিউনিস্ট দলের মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে এই সকল দেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র লইয়া 'রুশ ব্লক' (**Russian or Soviet Bloc**) গঠিত হইয়াছে। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার সহিত রুশ ব্লকভুক্ত দেশসমূহের যোগাযোগ কতকগুলি বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল দেশে রাশিয়ার সাহায্য লইয়া নানাবিধ যুগ্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়ার চেষ্টায় জার্মানি ও ইতালির নিকট হইতে বিভিন্ন সামগ্রী আদায় করিয়া এই সকল দেশকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই সকল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি রাশিয়ার চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে।

রুশ প্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহের সহিত রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্ক

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ (Western Powers): রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপে প্রভাব বিস্তার ও সোভিয়েত ব্লক গঠন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশ গ্রহণ এবং নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতনের পশ্চাতে রাশিয়ার অবদান, সর্বোপরি রাশিয়ার সামরিক দক্ষতা রাশিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে ইঙ্গ-ফরাসী প্রাধান্যের স্থলে আমেরিকার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিলাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপর শ্রেষ্ঠশক্তির মর্যাদা দান করিয়াছে। বস্তুত, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তিই হইল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া কর্তৃক 'সোভিয়েত ব্লক' গঠনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহার ফলেই 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' (Truman Doctrine) এবং 'মার্শাল প্ল্যান' (Marshall Plan) ঘোষিত হয়। গ্রীক, তুরস্ক ও পারস্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগে রাশিয়া কর্তৃক সেই সকল দেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করিবার ফলেই 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ও 'মার্শাল প্ল্যান' ঘোষিত হইয়াছিল। এইভাবে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কমিউনিস্ট্ প্রভাব বিস্তৃতি প্রতিরোধে বদ্ধ-পরিকর হইলে 'পশ্চিমী ব্লক' (Western Bloc)-এর সৃষ্টি হইল।

সোভিয়েত ব্লক গঠন—'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ও 'মার্শাল প্ল্যান'-এর মাধ্যমে পশ্চিমী ব্লক গঠন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লার-মুসোলিনির সমরবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রীস বীরত্ব সহকারে যুঝিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের অপরিসীম ব্যয়ভার অল্পকালের মধ্যেই গ্রীসের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত করিয়া দিলে গ্রীসের পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। নাৎসি অধিকৃত অবস্থায় গ্রীসের শিল্পোৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কৃষিও পরিবহনের অসুবিধাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সেনাবাহিনী গ্রীস হইতে অপসরণে বাধ্য হইলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হয়। ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা গ্রীসে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের নীতি গৃহীত হইবার পরই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হইবার পর বামপন্থীদল ও রাজ-তন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাজতান্ত্রিকদের সমর্থন করিলে ক্রমে গ্রীসে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই অন্তর্যুদ্ধ দমন করিলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অত্যাচারে বহু গ্রীক কমিউনিস্ট্ গ্রীসের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। ঐ বৎসরই (১৯৪৫) সেপ্টেম্বর মাসে এক গণভোটে গ্রীসে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট্‌গণ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক সরকারকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। যুগোস্লাভিয়া, আলবানিয়া ও বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট্‌গণ গ্রীক কমিউনিস্ট্‌দিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে লাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে

গ্রীসের প্রতিরক্ষা সমস্যা

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গ্রীসের প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয়-সংকুলান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এমতাবস্থায় গ্রীসকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ-ই ছিল সেইস্থানে কমিউনিস্ট্ প্রাধান্য স্থাপনের পথ সহজ করিয়া দেওয়া এবং তুরস্কের দিকে কমিউনিস্ট্ প্রাধান্য বিস্তারের উৎসাহ দান করা। একথা বিবেচনা করিয়া ট্রুম্যান সেক্রেটারী মার্শাল-এর পরামর্শ অনুসারে 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' (**Truman Doctrine**) ঘোষিত হইল।

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ঘোষণার প্রত্যক্ষ কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পররাষ্ট্র-নীতি জার্মানির আক্রমণ এড়াইয়া চলিবার আগ্রহ এবং রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও ভীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্ক সরকারের চেষ্টা ছিল যে-কোন উপায়ে দার্দেনেলিজ প্রণালী দিয়া বিদেশী যুদ্ধজাহাজ চলাচল বন্ধ রাখা। ইহা ভিন্ন জার্মানি উত্তর-ইওরোপ অভিমুখে অগ্রসর হইলে তুরস্ক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সহিত ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও ক্রীট জয় করিতে সমর্থ হইলে তুরস্কের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। ইজিয়ান সাগরে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ক্রমে জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হইলে তুরস্কের প্রায় সকল দিকেই জার্মানির রাজনৈতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তি বিস্তার লাভ করিল। একমাত্র রাশিয়া-তুরস্ক সীমায় জার্মানির শক্তি বা অধিকার তখনও বিস্তৃত হয় নাই। এমতাবস্থায় তুরস্ক জার্মানির সংরক্ষিত দেশে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।* তদুপরি ইতালির আক্রো-এশীয় বিস্তার নীতিও তুরস্কের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলা একপ্রকার অসম্ভব দেখিয়া তুরস্ক জার্মানির সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন জার্মানি ও তুরস্কের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য একটি অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। জার্মানির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাই ছিল তুরস্কের এই চুক্তি স্বাক্ষর করিবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে জার্মানি তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখিয়া রাশিয়া ও

তুরস্কের পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

জার্মানি-তুরস্ক অনাক্রমণ-চুক্তি : তুরস্কের নিরপেক্ষতা

---

*Vide : George Lenczowski : *The Middle East in the World Affairs*, p. 138ff.**

তুরস্কের সম্ভাব্য মিত্রতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। কারণ, হিট্‌লার রাশিয়াকে মিত্রহীন অবস্থায় রাখিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তুরস্ককে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া জার্মানি তুরস্ককে কার্যকরীভাবে সাহায্যদানের জন্য চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক নিজ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জার্মানি তুরস্কের সহিত একাধিক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আফ্রিকার সমরকেন্দ্রে জার্মানির অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িলে তুরস্ক জার্মানির সহিত স্বাক্ষরিত বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ করিল এবং দার্দেনেলিজ প্রণালী দিয়া জার্মান নৌবাহিনীর জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিল। যুদ্ধে জার্মানির সামরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং মিত্রপক্ষের কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার ফলেই তুরস্ক ক্রমে জার্মানির মিত্রতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তুরস্ক ব্রিটেনের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। এমন কি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনমুর মধ্যে আদানা নামক স্থানে আলাপ-আলোচনার পর ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর কর্মচারিবর্গ গোপনে তুরস্কে আসিয়া তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগ-দানের উপযোগী সামরিক শিক্ষাদানের চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মান বিমান আক্রমণের ভয়ে তুরস্ক ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গকে তুরস্ক পরিত্যাগের আদেশ দিতে বাধ্য হয়। ইহার পরও মিত্রপক্ষ—ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া—তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু তুরস্ক এবিষয়ে কোন কিছুই করিতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট তুরস্ক জার্মানির সামরিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া জার্মানির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

জার্মানি-তুরস্ক বাণিজ্য-চুক্তি

তুরস্ক কর্তৃক জার্মানির সহিত বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ—দার্দেনেলিজ প্রণালী জার্মান নৌবহরের নিকট রুদ্ধ

জার্মানির সহিত তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ—জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি জার্মানির নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করা রাশিয়ার বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তুরস্কের রুশ-ভীতি এবং প্রয়োজনবোধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণের জন্য ফ্রান্সকে তুর্কী সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবার গোপন স্বীকৃতি রাশিয়াকে তুরস্কের শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল।

রুশ-তুর্কী মনোমালিন্য

ইহা ভিন্ন হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণ করিলে তুরস্ক মিত্রপক্ষে যোগদান করিবে এই আশাও রাশিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক এইসব কোন কিছুই না করিলে তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তুরস্ক ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি দার্দেনেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া রাশিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের অনুমতি দান করিল, শুধু তাহাই নহে অক্ষশক্তিবর্গের অন্যতম জাপানের সহিতও কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিল। কিন্তু রাশিয়া ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, রাশিয়া উহার শর্তাদির পরিবর্তন দাবি করিল এবং (১) কারস্‌ ও আর্‌দাহন নামক স্থান দুইটির অধিকার, (২) বোস্‌ফোরাস্‌ ও দার্দেনেলিজ প্রণালীর সন্নিকটে সামরিক ঘাটি স্থাপনের অধিকার, (৩) বুলগেরিয়া ও থ্রেসের মধ্যবর্তী সীমারেখার পরিবর্তন এবং (৪) ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মন্ট্রে চুক্তি (Montreau Convention) দ্বারা বোস্‌ফোরাস ও দার্দেনেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াতের শর্তাদির পরিবর্তনও দাবি করিল (১৯৪৫)। রাশিয়া এবিষয় লইয়া তুরস্কের উপর চাপ দিতে লাগিল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বোস্‌ফোরাস্‌ ও দার্দেনেলিজ প্রণালী দুইটি রাশিয়া ও তুরস্কের যুগ্ম সংরক্ষণাধীন থাকিবে এবং এতদঞ্চলের সামরিক নিরাপত্তার ভারও রাশিয়া ও তুরস্কের উপর যুগ্মভাবে ন্যস্ত থাকিবে। এই ব্যাপারে রাশিয়া ও তুরস্কের পরস্পর সম্পর্ক এমন বিষাইয়া উঠিল যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তুরস্ক রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরই (১২ই মার্চ, ১৯৪৭) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রাশিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্যদানের ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার ফলে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল।

রাশিয়া কর্তৃক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী অনাক্রমণ-চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তন দাবি

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন —তুরস্কের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য-দানের ঘোষণা

ইরাণ বা পারস্যের তৈলসম্পদের উপর রুশ অধিকার বিস্তৃতির চেষ্টাও 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ঘোষিত হইবার অন্যতম কারণ ছিল। পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি বা প্রভাব বিস্তার, ভারতমহাসাগরের উপর অধিকার বিস্তার এবং বিশেষভাবে পারস্যের তৈলসম্পদের অংশ গ্রহণের ইচ্ছাপ্রসূত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে পাছে পারস্যের তৈলসম্পদ অক্ষ-শক্তিবর্গের হস্তগত হয় সেই ভয়ে রাশিয়া ও ব্রিটেনের

যুগ্মবাহিনী পারস্যে মোতায়েন করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দিকে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা এবং রাশিয়ার খনিজ তৈলসম্পদে পরিপূর্ণ বাকু অঞ্চল জার্মানি কর্তৃক যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পারে সেজন্যও এই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। পরে মার্কিন সেনাবাহিনীও পারস্যের তৈল উৎপাদনের অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

ইরাণ বা পারস্যের তৈলসম্পদ-সংক্রান্ত জটিলতা

পারস্যের উত্তরাঞ্চলের আজারবাইজান, জিলান, মাজানদেরাণ, গোরগান ও খোরাসান—এই পাঁচটি প্রদেশ ছিল রাশিয়ার অধিকারে, আর অবশিষ্টাংশ ছিল ব্রিটেনের অধিকারে। তেহ্‌রাণ অবশ্য নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে রহিল। যুদ্ধের কালে মিত্রপক্ষ পারস্যের সামরিক সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট, রেলপথ প্রভৃতি তৈয়ার করিল। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-রুশ-চাপে রেজা শাহ্ তাঁহার পুত্র মোহম্মদ রেজার সপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এই সকল কারণে পারস্যবাসীদের অর্থাৎ ইরাণীয়দের মধ্যে মিত্রপক্ষের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি রাশিয়া, ব্রিটেন ও পারস্যের মধ্যে এক ত্রি-শক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হইল যে, মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর পারস্যে অবস্থান পারস্যের উপর মিত্রপক্ষীয় সামরিক অধিকার (Military Occupation) বলিয়া ধরা হইবে না এবং যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্য পারস্য হইতে অপসারণ করা হইবে। ইহা ভিন্ন মিত্রপক্ষ পারস্যকে স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু ঐ বৎসরের শেষ দিকে ৩০ হাজার মার্কিন সৈন্য পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিস্থিতির এইরূপ দ্রুত পরিবর্তনে পারসিকদের মনে ভীতির সৃষ্টি হইল। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কিভাবে ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহাই পারস্য সরকারের তথা পারসিকদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

মিত্রপক্ষ কর্তৃক ইরাণ অধিকৃত

মার্কিন সেনাবাহিনীর তুরস্কে আগমন

এদিকে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরাঞ্চলে আজারবাইজান প্রদেশে কমিউনিস্ট্ প্রভাবিত 'টুডে দল' (Tudeh Party) এই প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করিতে চাহিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করিলে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইরাণীয় (পারসিক) সরকার বহু চেষ্টা করিয়াও এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও এবিষয়ে কোন দৃঢ় নীতি অবলম্বন করিতে চাহিল না। ঐ বৎসরই (১৯৪৫)

আজারবাইজান-বিদ্রোহ

১২ই ডিসেম্বর টুডে দল আজারবাইজানকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহার অব্যবহিত পরে কুর্দ প্রজাতন্ত্রও স্থাপিত হইল। ইরাণীয় সরকার অনন্যোপায় হইয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট রাশিয়া কর্তৃক ইরাণীয় অঞ্চল অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিল ইরাণীয় সমস্যা সমাধানে তেমন তৎপরতা দেখাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়াই ইরাণীয় প্রধানমন্ত্রী কাভাম এস-সুলতানে (Qavam-es-Sultaneh) রাশিয়ার সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬)। এই চুক্তির শর্তানুসারে রুশ-ইরাণীয় যুগ্ম এক প্রতিষ্ঠানের হস্তে উত্তর-ইরাণের তৈলসম্পদ ২৫ বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের ৫১ শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ৪৯ শতাংশ ইরাণ পাইবে স্থির হইল। ইহা ভিন্ন আজারবাইজানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কতক অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরাণ যে অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইল। তদুপরি ইরাণীয় মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট্ দল হইতে তিনজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। এই সকল সুযোগ-সুবিধা লাভের পর রাশিয়া ইরাণ হইতে নিজ সৈন্য অপসারণ করিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নবনির্বাচিত 'মজলিস্' অর্থাৎ ইরাণীয় জাতীয় সভা ইরাণ-সোভিয়েত চুক্তি অনুমোদন না করিলে এই দুই দেশের পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বে (১২ই মার্চ, ১৯৪৭) ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ঘোষিত হইলে ইরাণে মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই উৎসাহ হইয়াছিল। সুতরাং নবনির্বাচিত মজলিস্ রাশিয়ার সহিত কাভাম এস-সুলতানে কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি নাকচ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইরাণকে সামরিক ও বে-সামরিক সাহায্যদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য।

সিকিউরিটি কাউন্সিলে তুরস্কের নিষ্ফল অভিযোগ

রুশ-ইরাণীয় চুক্তি (১৯৪৬)

ইরাণীয় জাতীয় সভা মজলিস্ কর্তৃক রুশ-ইরাণীয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান

ইরাণ-আমেরিকা মিত্রতা-চুক্তি

গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণের উপর রাশিয়ার প্রভাব-বিস্তৃতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার বিখ্যাত 'ট্রুম্যান

ডকট্রিন'* ঘোষণা করেন। স্বাধীন দেশ বা জাতিকে বহির্দেশীয় সকল প্রকার প্রভাব ও প্রাধান্য মুক্ত রাখিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য-সহায়তা দানে বদ্ধ-পরিকর হয়। বস্তুত, রাশিয়ার বলকান ও মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রতিরোধকল্পেই 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ঘোষণায় বিশ্লেষিত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রীস ও তুরস্কের সাহায্যার্থে চারিশত মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দ করিবার জন্য মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ জানান। তাঁহার মতে পৃথিবীর শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার যথাযথ নেতৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর যে-কোন অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সামিল—ইহাই ছিল 'ট্রুম্যান ডকট্রিন'-এর মূল সূত্র।

'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন্'—ঘোষণা (মার্চ ১২, ১৯৪৭)

ট্রুম্যান ডকট্রিন-এর মূল সূত্র অনুধাবন করিলেই একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে। ট্রুম্যান ডকট্রিন-এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সোভিয়েত ব্লকের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ব্লক গঠন করা। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা উহার নেতৃত্বাধীন দেশসমূহের সহিত ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ট্রুম্যান ডকট্রিন ঘোষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুর্বলীকৃত ব্রিটিশ শক্তির স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা ট্রুম্যান ডকট্রিন-এর পশ্চাতে অন্যতম যুক্তি ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ট্রুম্যান ডকট্রিন পশ্চিমী স্বার্থপ্রণোদিত পদক্ষেপ হিসাবেই বিবেচ্য। কারণ গ্রীস, তুরস্ক বা ইরাণের নিরাপত্তা

ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন-এর মূল্য উদ্দেশ্য

---

*"I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting the attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I believe that our help should be primarily through economic and financial aid which is essential to economic stability and orderly political processes." President Truman's address to a joint session of the U. S. A. Congress, (March 12, 1947).

অপেক্ষা মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলের তৈলসম্পদ রুশ-প্রভাবিত অঞ্চলভুক্ত যাহাতে না হইতে পারে তাহাই ছিল এই ডক্ট্রিনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক অবনতির ফলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে ইওরোপীয় দেশসমূহে এক অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিতে চলিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা অদূর ভবিষ্যতে এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে এবং ইওরোপে সাম্যবাদী প্রভাব স্বভাবতই বিস্তারলাভ করিবে একথা যখন ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রুমান ডক্ট্রিন্-এর এক ব্যাপক ব্যাখ্যা করিয়া ইওরোপের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) প্রস্তুত করিয়া ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলিল। জেনারেল মার্শাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন হার্বার্ড (Harvard)-এ বক্তৃতায় ইওরোপের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেন। ইওরোপীয় দেশগুলিতে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি দূর হইয়া স্বাধীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবে—একথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। অবশ্য মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হইল এই যে, সাহায্যপ্রার্থী দেশকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে অর্থাৎ যে-সকল দেশ নিজ চেষ্টায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে সেগুলিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে। অনিচ্ছুক দেশকে জোর করিয়া সাহায্যদান করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

মার্শাল পরিকল্পনা ট্রুম্যান-ডক্ট্রিন-এর ব্যাপক প্রয়োগ বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা থাকায় যে-সকল দেশ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিল সেগুলির সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক দিকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহের সাম্যবাদের প্রসার রোধ করা-ই ছিল মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ইওরোপে সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে সেই আশঙ্কা হইতেই মার্শাল পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়াছিল বলা

মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাহুল্য। ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ও মার্শাল পরিকল্পনা আরও একটি কথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল উহার কোন সুযোগ গ্রহণ না করিয়া এককভাবে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইয়া এই আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ঘোষণা ও মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরীকরণ সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মুখে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অপরাপর দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সেই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে একথা সোভিয়েত সরকার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন। ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার-এর মূল নীতিরও ইহা পরিপন্থী একথাও সোভিয়েত সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইল। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোট বা পশ্চিমী ব্লক ও সোভিয়েত ব্লকের মধ্যে এক তীব্র মতদ্বৈধতা দেখা দিল। ক্রমে এই দুইটি ব্লক পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিলে যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধকালীন শত্রুতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইল। ইহাই 'ঠাণ্ডা লড়াই' (Cold War) নামে অভিহিত।

সোভিয়েত বিরোধিতা—সোভিয়েত ব্লক ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর শত্রুতামূলক মনোভাব : ঠাণ্ডা লড়াই

ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অর্থাৎ বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হইল পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবজনিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ-চাপ (War tension) সৃষ্টি। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি—রাশিয়া ও আমেরিকা নিজ নিজ তাঁবেদার রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরে পরিণত করিয়াছে। ঠাণ্ডা লড়াই ঠিক কোন্ সময় হইতে শুরু হইয়াছিল সেবিষয়ে কতক মতভেদ আছে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট্ ও সেক্রেটারি কর্ডেল হালের চেষ্টায় রুশ-মার্কিন যে মতৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যুদ্ধের শেষে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা পর্যন্ত বজায় থাকিবে, এই ধারণা স্বভাবতই জন্মিয়াছিল। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে এই সমঝোতার ফল হিসাবেই রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পুরস্কারস্বরূপ সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের অল্পকালের মধ্যেই রুজ্‌ভেল্টের মৃত্যু এবং রাশিয়া কর্তৃক জার্মানি ও ইতালির কবলমুক্ত ইওরোপের

ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনা

রাজনৈতিক পুনর্গঠনের যে শর্ত ইয়াল্টা চুক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছিল উহা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ইওরোপে রুশ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা ও পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকারের সমর্থন না করিয়া লাব্‌লিন সরকারের সমর্থন ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্সে যোগদানের পথে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্‌ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাতের সময় ট্রুম্যান মলটভ্‌কে তীব্র ভাষায় রাশিয়া কর্তৃক 'ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত বিরোধী' কাজের জন্য সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই এর সূচনা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন।

বস্তুত, যুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ—রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান দেশসমূহে রাশিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই নগ্নরূপ ধারণ করে। এই সকল দেশে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক, এই ছিল আমেরিকার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার পশ্চাতে অবশ্য আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সৃষ্টির মাধ্যমে রুশ সাম্যবাদের প্রসারে বাধাদানের ইচ্ছাও যে পরোক্ষভাবে উপস্থিত ছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ঐ সকল দেশে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইলে রাশিয়ার দ্বারদেশে সাম্যবাদ-বিরোধী দেশ গড়িয়া উঠিবে এই ভয় স্বভাবতই রাশিয়াকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। এজন্য রাশিয়া চাহিয়াছিল রাশিয়ার সীমান্তদেশে রুশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কতকগুলি তাঁবেদার রাজ্য গঠন করিতে। ফলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য এবং উহার ফলস্বরূপ 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পূর্ব-ইওরোপ ও মধ্য-প্রাচ্যে রুশপ্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা হইতে 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'র উদ্ভব ঘটিলে ঠাণ্ডা লড়াই রীতিমত শুরু হইল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান্য বিস্তার-রোধে মার্কিন চেষ্টা ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিস্থিতির সৃষ্টি

সোভিয়েত রাশিয়া 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নূতন স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিল। ইহা ভিন্ন মলটভ্‌ পরিকল্পনা (**Molotov Plan**) পূর্ব ইওরোপের রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হইল। ইহার আশু ফল পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের পরস্পর বাণিজ্য-সম্পর্ক নাশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে

ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমিকা

সাম্যবাদী দেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া 'কমিনফরম্' (**Cominform i.e.—Communist Information Bureau**) নামে একটি আন্তঃরাষ্ট্র সংস্থা স্থাপিত হইল। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সাম্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে তথ্যাদির আদান-প্রদান ও পররাষ্ট্র-নীতির সংহতি বৃদ্ধি এবং মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (**Cold War**) পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। সমগ্র পৃথিবী এক অনভিপ্রেত যুদ্ধ-চাপে ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লক বা রাষ্ট্রজোটের এই পরস্পর-বিরোধিতার কারণেই ইতিহাস-দার্শনিক অধ্যাপক টয়নবী বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে **'Bipolar Politics'** নামে অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে আজ সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন দুইটি গোলার্ধে ভাগ করা যাইতে পারে। বস্তুত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রাধান্য ও নেতৃত্ব-লাভ। আঞ্চলিক নেতৃত্ব বা প্রাধান্য আজ অতীতের কথায় পরিণত হইয়াছে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারত, মিশর, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইলে এই সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা হয়ত সম্ভব হইবে না।

Bipolar Politics

স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতিগত বৈষম্য, সর্বোপরি পরস্পর সন্দেহ পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ব্লকের লড়াই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত বিরোধিতায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠন, সামরিক উপকরণ সঞ্চয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অর্জন প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এমন কি কোন কোন আঞ্চলিক সশস্ত্র যুদ্ধ, যেমন কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দো-চীনের যুদ্ধ, কাশ্মীরের যুদ্ধ প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর আওতায় লইয়া গিয়া পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর-বিরোধিতার

ঠাণ্ডা লড়াই-এর ব্যাপকতা

তীব্রতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডিত জার্মানি বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ঘোষণা, মার্শাল পরিকল্পনা, পক্ষান্তরে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক মার্শাল পরিকল্পনা বর্জন, কমিনফরম্ স্থাপন প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। রাশিয়ার শক্তি ও প্রভাব প্রতিরোধকল্পে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ব্রাসেলস্-এর চুক্তি (**Treaty of Brussels**) পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ ও নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টার-এ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিল এবং পরস্পর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমবায় ও সহযোগিতা দানে প্রতিশ্রুত হইল। ব্রাসেলস্-এর চুক্তি ইওরোপীয় দেশসমূহের নিরাপত্তা রক্ষা ও ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। ইহা ভিন্ন, এই চুক্তি **NATO (North Atlantic Treaty Organisation)**, **SEATO, CENTO** প্রভৃতি অপরাপর শক্তিজোটের পথ-প্রদর্শক ছিল।

ব্রাসেলস্-এর চুক্তি (১৭ই মার্চ, ১৯৪৮)

উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation—NATO) : ব্রাসেলস্-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর (মার্চ, ১৯৪৮) সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য-সহায়তার পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জার্মানির সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে অর্থাৎ রাশিয়া ও রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করিল। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন শহরের অবরোধে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। [বার্লিন অবরোধ সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য]। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, লাক্সেমবুর্গ, নরওয়ে, পোর্তুগাল, আইসল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশ 'উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি' স্বাক্ষর করিল। তিন বৎসর পর (১৯৫২) গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-জার্মানি এই সংস্থায় যোগদান করিয়াছে।

উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO) ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯

১৪টি শর্ত-সম্বলিত NATO চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে আস্থা স্থাপন, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়-বিচার রক্ষা, নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা প্রভৃতি শর্ত মানিয়া লয়। ইহা ভিন্ন, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ নিজ নিজ দেশে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ় করিয়া, পরস্পর অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা দ্বারা সকলের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ পরস্পর সাহায্যের মাধ্যমে যুগ্মভাবে অথবা এককভাবে বৈদেশিক সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে বদ্ধপরিকর থাকিবে। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের কোন একটি যদি অপর কোন শত্রু দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক দেশই উহা নিজ দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং উহা প্রতিহত করিবার জন্য যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবে। NATO চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টার অনুযায়ী কর্তব্যাদি পালন করিবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সাহায্য দান করিবে। NATO সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে অপর যে-কোন ইওরোপীয় রাষ্ট্রকে এই সংস্থায় যোগদান করিতে এবং উত্তর-আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে আহ্বান করা চলিবে। এই চুক্তি প্রথমত দশ বৎসরকাল চালু থাকিবার পর যে-কোন সদস্য রাষ্ট্র আলোচনার মাধ্যমে উহার শর্তাদির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুরোধ জানাইতে পারিবে। ২০ বৎসর পর অবশ্য যে-কোন সদস্য রাষ্ট্র এক বৎসরের নোটিশ দিয়া উহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবে। NATO সংস্থার অধীন সামরিক কমিটি, উত্তর-আটলান্টিক কাউন্সিল প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা আছে।)

NATO চুক্তির শর্তাদি

NATO সংস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা নাশের চেষ্টার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত সামরিক মৈত্রীর মূল ভিত্তি হইল NATO. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে যে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই NATO সংস্থা গঠিত হইয়াছিল

NATO-এর প্রকৃতি

সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।* সোভিয়েত রাশিয়ার পশ্চিম-ইওরোপের দিকে প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে যে NATO গঠন করা হইয়াছিল মার্কিন রাষ্ট্র-নেতাদের বিভিন্ন মন্তব্য হইতে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

NATO সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রবর্গ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের মোট যুদ্ধজাহাজ, বিমান প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং আধুনিক ধরনের মারণাস্ত্র দ্বারা প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সজ্জিত করিয়া NATO সংস্থাটির সামরিক শক্তি বহুগুণে বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন NATO-এর সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ও সামরিক প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ করিয়া এই সকল দেশের শক্তি, অর্থ প্রভৃতি অপচয় বন্ধ করিয়াছিল। রাশিয়ার পক্ষেও এই সংস্থার বিরোধিতা করিয়া ইওরোপীয় মহাদেশে আর প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, NATO ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ হইয়া পড়ায় অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর দায়িত্ব অধিকাংশভাবে এই সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে উহার আন্তর্জাতিক শক্তি ও মর্যাদা কতক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন NATO স্থাপনের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর বিরোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এই সংস্থায় যোগদানের ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের ইচ্ছানুযায়ীই NATO-এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। রুশ নেতৃবর্গ স্বভাবতই NATO সংস্থা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় কর্তৃক পৃথিবীর উপর প্রভাব-বিস্তার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিনাশের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে এই অভিযোগ করিয়াছেন। গ্রীস ও তুরস্কের NATO-এর সদস্যপদভুক্তি এই অভিযোগের সত্যতা প্রমান করিয়াছে। বস্তুত, NATO আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও যেহেতু ইহা সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী সামরিক চুক্তি হিসাবেই গঠিত হইয়াছিল সেহেতু ইহা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত না করিয়া যুদ্ধের মনোভাবেরই সৃষ্টি করিয়াছে। রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এই অলীক কল্পনা হইতেই NATO-এর উদ্ভব ঘটিয়াছিল একথা স্মরণ রাখিলে NATO শান্তি ও নিরাপত্তার পথে না চলিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকেই অধিকতর মনোযোগী একথা বলা যাইতে পারে।

NATO-এর সমালোচনা

---

* **Vide Hartmann :** ***The Relations of Nations.***

ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact): NATO সংস্থা স্থাপনের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact) স্বাক্ষরিত (১৪ই মে, ১৯৫৫) হয়। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আল্‌বানিয়া ও পূর্ব-জার্মানি লইয়া এই চুক্তি বা মৈত্রী গঠিত। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সামরিক শক্তিজোট স্থাপনের দ্বারা এক যুদ্ধের চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলেও আঞ্চলিক শক্তিজোট গঠন করিয়া যুদ্ধের ইন্ধন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওয়ারসো চুক্তি (Warsaw Pact)

ওয়ারসো চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ তাহাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার শক্তি প্রয়োগ না করিয়া শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে এবং কোন সদস্য-রাষ্ট্র শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রয়োজনবোধে সকলে সম্মিলিতভাবে সামরিক সাহায্যের দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে স্বীকৃত হইল। পরস্পর নিরাপত্তা ও সামরিক সাহায্য ভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবেও এই চুক্তির গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। অপরাপর যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই চুক্তিতে যোগদানের কোন বাধা রহিল না। এই চুক্তিটি ২০ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে স্থিরীকৃত হইল।

শর্তাদি

ওয়ারসো চুক্তির দোহাই দিয়া রাশিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সাম্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহা বলপূর্বক দমন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের পশ্চাতে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নৈতিক সমর্থন ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া রাশিয়া ওয়ারসো চুক্তির অপব্যবহার করিয়াছিল। ইহা হইতে একথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিত্র রাষ্ট্রবর্গের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া চলাই রাশিয়ার উদ্দেশ্য।

রাশিয়া কর্তৃক হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন

আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট (Regional Security Alliances):

মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East): মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি পৃথিবীর মোট তৈলসম্পদের প্রায় অর্ধাংশের অধিকারী। এই তৈলসম্পদ নিজ নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন

দেশগুলি এক তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। স্বভাবতই পূর্ব-পশ্চিমী ব্লকের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদমূলক প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া নিজেদের স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হউক ইহা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অভিপ্রেত ছিল না। স্বভাবতই এই সকল দেশ স্বাধীন, নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবার এবং মধ্য-প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ কর্তৃক ইহুদি জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ইস্রায়েল রাষ্ট্র স্থাপন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইহার সমর্থন প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা জটিলতাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তৈলসম্পদ, প্যালেস্টাইন সমস্যা ও সোভিয়েত প্রভাব বিস্তৃতির ভীতি মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যার মূল কথা।* এইরূপ পরিস্থিতিতে মধ্য-প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম হিসাবে দেখা দিলে মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে আরব লীগ, বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য-মূলক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হইয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যের গুরুত্ব : পূর্ব-পশ্চিমী ব্লকের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা

যুদ্ধোত্তরকালে ইহুদিদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ব্রিটেন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে চলিয়া যায়। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মধ্য-প্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারের আশঙ্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণে বাধ্য করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মধ্য-প্রাচ্যে কর্মরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণের বাৎসরিক সম্মেলন এবং উহাতে মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা একদিকে যেমন মধ্য-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে অপর দিকে মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে শান্তিরক্ষা মার্কিন নিরাপত্তারই অন্যতম সূত্র বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে ইহাও প্রমাণ করে। মধ্য-প্রাচ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রজোট গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছিল

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ

---

* "Oil, Palestine and the Soviet menace provided the three avenues of approach." Lenczowski, p. 532.

তাহা গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক ও পাকিস্তান কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীনে আসিতে রাজী হইবার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আরব লীগভুক্ত দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন করা ও ইহুদি-বিরোধী আরব দেশসমূহের সৌহার্দ্যলাভ একই সঙ্গে সম্ভব ছিল না। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে কোনপ্রকার শক্তিজোট গঠিত না হইলে সেই অঞ্চলে রুশ প্রভাব-বিস্তৃতি রোধ করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য-প্রাচ্যে সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠনে সচেষ্ট হইল। বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে (১৯৫৫) সেই চেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য-প্রাচ্য

বাগদাদ চুক্তি (The Bagdad Pact or CENTO): ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে পরস্পর নিরাপত্তা ও সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাই বাগদাদ চুক্তি নামে পরিচিত। আরব লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইরাক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল। যে-কোন রাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগদান করিতে পারিবে এই শর্তের সুযোগে ব্রিটেন, পাকিস্তান, ইরাণ উহাতে যোগদান করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই রাষ্ট্রজোটে সংযুক্ত হইল। বাগদাদ চুক্তিতে ইরাকের যোগদান আরব লীগের যুগ্ম নিরাপত্তার প্রচেষ্টা কতক পরিমাণে ব্যাহত করিল এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের উপর মিশরের নেতৃত্বও কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বাগদাদ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে সামরিক সাহায্য ও সামরিক শিক্ষা দান করিয়া মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী এক সামরিক রাষ্ট্রজোট গড়িয়া তুলিল। ইহার ফলে সিরিয়া, মিশর, সউদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা-মূলক নীতি অনুসরণের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রাশিয়ার প্রতি এই সকল রাষ্ট্রের মনোভাব আরও মিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মধ্য-প্রাচ্যে পশ্চিমী নেতৃত্বে রাষ্ট্রজোট গঠন

আরব দেশসমূহের বিরোধিতা

বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মনোভাব যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি উহার ফলে ভারত-পাকিস্তান মনোমালিন্য, আরব দেশসমূহের সহিত বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতের নিরাপত্তার দিক হইতে বিচার করিলে পাকিস্তানের বাগদাদ

বাগদাদ চুক্তি ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী

চুক্তিতে যোগদান এবং মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ইহার ফলে ঠাণ্ডা লড়াই ভারতীয় সীমান্তে বিস্তৃত হইয়াছিল।) তদুপরি পাকিস্তানী নেতৃবর্গের 'যুদ্ধং দেহি' মনোবৃত্তির কথা স্মরণ রাখিলে বিদেশী সামরিক সাজ-সরঞ্জাম পাকিস্তানের হস্তে দেওয়ার বিপদও নেহাৎ কম নহে, একথাও স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য ভারতকে নিরাপত্তা খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে এবং তাহাতে উন্নয়নমূলক কার্য ব্যাহত হইবে। (ইহা ভিন্ন বৃহৎ শক্তিবর্গের সহিত সামরিক চুক্তিবদ্ধ হইবার রাজনৈতিক কুফল নীতিগতভাবে ভারত সমর্থন করিতে পারে না, কারণ এই ধরনের সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদান করা দুর্বল রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। ইহা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আধুনিকতম রূপ।)

(এদিকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৩শে) মিশরের সেনানায়ক জেনারেল নগুইব-এর নেতৃত্বে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইহাতে রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিশরে সামরিক শাসন স্থাপিত হয়। ইহার দুই বৎসর পর (১৯৫৪) নগুইবকে পদচ্যুত করিয়া গামাল আব্দুল নাসের মিশরের শাসনকার্য হস্তগত করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা তাঁহাকে মিশরীয় জাতির অকুণ্ঠ আনুগত্যলাভে সমর্থ করিয়াছে।

মিশরের বিপ্লব

বাগদাদ চুক্তি নাসের-এর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, কারণ মধ্য-প্রাচ্যে এই রাষ্ট্রজোট গঠন এবং বিশেষত ইরাকের এই চুক্তিতে যোগদান মিশরের নেতৃত্বের পরিপন্থী ছিল।) ইহা ভিন্ন ইস্রায়েল-আরব বিরোধও মিশরের সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। (এই পরিস্থিতিতে নাসের বাধ্য হইয়াই রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিলেন। এদিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অসওয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। কিন্তু রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সামরিক উপকরণ ক্রয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মনঃপূত ছিল না। এই অসন্তোষের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকস্মিকভাবে অসওয়ান বাঁধের জন্য অর্থ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইলে নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানির (**Suez Canal Company**) জাতীয়করণ করিলেন। ইহাতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে এই দুই দেশ

মিশর ও বাগদাদ চুক্তি

সুয়েজ খাল আক্রমণ

যুগ্মভাবে ইস্রায়েল এর সহযোগিতায় সুয়েজ খাল অঞ্চল, গাজা অঞ্চল প্রভৃতিতে সৈন্য প্রেরণ করিল (অক্টোবর, ১৯৫৬)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সরকার এই যুদ্ধ-পন্থা অনুসরণ করিলে মার্কিন প্রতিনিধি ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ ইস্‌রায়েলকে সৈন্যাপসারণে এবং ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়কে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে নির্দেশ-সম্বলিত এক প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সর্বত্র এক তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করিল। পৃথিবীর জনমতের চাপে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর নির্দেশক্রমে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। এই ঘটনা একদিকে যেমন বৃটেন ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মর্যাদায় আঘাত হানিয়াছিল, অপরদিকে মিশরের রাষ্ট্রনায়ক গামাল নাসের-এর জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সাময়িকভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কেও তিক্ততা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, সুয়েজ খাল আক্রমণের ঘটনা আরব জাতীয়তাবাদকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার ফল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক্ (**United Arab Republic**)-এর স্থাপনে (১৯৫৮) পরিলক্ষিত হইল। মিশরের সহিত সিরিয়া ও ইয়েমেন এই প্রজাতন্ত্রে যোগদান করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে নাসের অসওয়ান বাঁধ নির্মাণ ও সুয়েজ খাল সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য লাভে সমর্থ হইলেন। ব্রিটেনের সহিত শেষ পর্যন্ত মিশরের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক চাপে যুদ্ধ-বিরতি

ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের মর্যাদা হ্রাস—নাসের-এর জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি

ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক্

নাসের-এর কৃতিত্ব

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি (The ANZUS Pact): ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে কমিউনিস্টদের জয়লাভ এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভীতির সৃষ্টি করিল। এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **NATO**-এর নীতি এবং শর্তাদি অনুসরণ করিয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত এক সামরিক সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করে। **Australia, Newzealand** ও **United States of America**—এই তিন নাম হইতেই **ANZUS**-নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বলবৎ হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাহায্য দান, কোন দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোনপ্রকার সামরিক আক্রমণকে নিজের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহার প্রতিরোধ প্রভৃতি এই চুক্তির শর্তে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সামরিক রাষ্ট্রজোটে ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল দেশ এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলে, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ ও ANZUS চুক্তিবদ্ধ দেশের মধ্যে SEATO চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

শর্তাদি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি বা ম্যানিলা চুক্তি (South-East Asia-SEATO or Manila Pact): ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট্ দলের জয়লাভের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার জন্য তৎপরতা শুরু হইল। জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াং-কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কমিউনিস্ট্ আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভব করিলেন। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট কুইরিনো ও চিয়াং-কাইশেক কয়েকটি এশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক আহ্বান করিতে চাহিলেন। কিন্তু এবিষয়ে দক্ষিণ-কোরিয়া ভিন্ন অপর কোন রাষ্ট্র কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করিলে কুইরিনো বাধ্য হইয়া এই বৈঠকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক বা সামরিক প্রশ্নের আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধিবর্গ বাগুইও (Baguio) নামক স্থানে সম্মিলিত হইলেন (১৯৫০)। কুয়ো-মিং-তাং নেতা চিয়াং-কাইশেক ও দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিঙ্গম্যান রী (Syngman Rhee) এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট্-বিরোধিতার কোন ব্যবস্থা করা হইবে না বলিয়া উহা বর্জন করিলেন। ফলে, এই সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠনের নীতি অনুসরণের অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৎপরতা শুরু করিল। পাকিস্তান মার্কিন

বাগুইও সম্মেলন

যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকার সমস্যা তদুপরি ভারতের প্রতি পাকিস্তানের বিরূপ মনোভাব প্রভৃতির সুযোগ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট্-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিল। ব্রহ্মদেশ, ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিতও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া এই সকল দেশকে সামরিক জোটে যোগদানে স্বীকৃত করাইতে পারে নাই। যাহা হউক, ঐ বৎসরই (১৯৫৪) ম্যানিলাতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড—এই আটটি দেশের প্রতিনিধি-বর্গ এক সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া **South-East Asian Collective Defence Treaty** নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে, সম্মিলিতভাবে যে-কোন স্বাক্ষরকারী দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ রোধ করিতে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান করিতে স্বীকৃত হইল। বিদেশী সশস্ত্র আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে এই সকল রাষ্ট্র পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবে বলিয়াও স্বীকৃত হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, **SEATO** চুক্তিটি অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত **ANZUS** (অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত) চুক্তির অনুকরণেই রচিত হইয়াছিল। এই চুক্তিটির প্রয়োগস্থল ছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, এশিয়াস্থ যে সকল দেশ এই চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে সেই সকল দেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। এই চুক্তির পরিপূরক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের যে-কোনটি কমিউনিস্ট্ দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য কমিউনিস্ট্ চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধেই এই রাষ্ট্রজোট গঠন করা হইয়াছিল। **NATO** এবং **ANZUS** চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এবং পাকিস্তান ভিন্ন অপর কোন দেশকে এই সামরিক জোটে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

পাকিস্তান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি

ম্যানিলা চুক্তি

SEATO-এর শর্তাদি

SEATO-এর প্রয়োগস্থল

ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সামরিক রাষ্ট্রজোটে যোগদানের মনোবৃত্তি ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির বহু দেশেরই ছিল না। ভারতের সহিত বিরোধিতা হেতু পাকিস্তান এই সামরিক জোটে যোগদান করিয়াছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরউল্লা খাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এমন এক প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে **SEATO** শক্তিজোটকে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে ভারতের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে **SEATO** শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক সাহায্যদানে প্রস্তুত এই শর্তের অধিক কিছু করিতে প্রতিশ্রুত না হওয়ায় জাফরউল্লা খাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তথাপি এই ধরনের সামরিক রাষ্ট্রজোটে পাকিস্তানের যোগদানের ফলে ভারতকেও বাধ্য হইয়া সামরিক দিক দিয়া তৎপর হইতে হইয়াছে।

ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কর্তৃক এই চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃতি

জাফরউল্লার উদ্দেশ্য ব্যর্থ

আমেরিকা (America): রিও চুক্তি (Rio Pact): ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গ একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার যে-কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা কোন বিদেশী অথবা আমেরিকাস্থ অপর কোন শক্তি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইলে তথাকার সকল রাষ্ট্র উহা নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লইবে। এই সকল শর্তসম্বলিত একটি আইন আর্জেন্টিনা ভিন্ন অপরাপর দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিল (মার্চ, ১৯৪৫)। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারে আঞ্চলিক আত্মরক্ষামূলক রাষ্ট্রজোট গঠন এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইবে না এইরূপ শর্ত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় দক্ষিণ-আমেরিকা নিজেদের মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে একটি রাষ্ট্রজোট গঠনে সচেষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক 'সৎ-প্রতিবেশী নীতি' (Good Neighbour Policy) অনুসরণে দক্ষিণ-আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতির জয় হইতে মুক্ত হইল। ইহার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রিও-ডি-জ্যানেরিওতে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ এক সম্মেলনে সমবেত হইলেন। এই সম্মেলনে দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্র-

দক্ষিণ-আমেরিকা রাষ্ট্রজোট—রিও চুক্তি

গুলি আমেরিকা বহির্ভূত বা আমেরিকাস্থ কোন দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পর সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। এইভাবে রিও চুক্তি (Rio Pact) স্বাক্ষরিত হইলে দক্ষিণ আমেরিকায়ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। এই চুক্তির প্রয়োগস্থল কানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হইল। এই দুইটি দেশ অবশ্য রিও চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে নাই।) (যাহা হউক, আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা স্থাপনের জন্য কলম্বিয়ার বোগোটা (Bogota) নামক স্থানে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক কনফারেন্স আহূত হয় (১৯৪৮)।

বোগোটা চুক্তি—
OAS সংগঠন

এখানে স্বাক্ষরিত বোগোটা চুক্তি (Bogota Pact) দ্বারা 'আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের সংগঠন' (Organisation of the American States—OAS) নামে উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রবর্গের একটি স্থায়ী সংস্থা স্থাপিত হয়।) এই সংস্থার উপর আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, চিলি, কিউবা, কোস্টারিকা, ব্রাজিল, বোলিভিয়া, ডোমিনিকোর প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল্‌-সেলভাডোর, হাইটি, গোয়াটুমেলা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, পেরু, পানামা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা—এই একুশটি প্রজাতন্ত্র বোগোটা চুক্তি অনুসারে OAS-এর সদস্যভুক্ত হইয়াছে। আর (রিও চুক্তি দ্বারা আঞ্চলিক নিরাপত্তার যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করা হইয়াছে)

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী
(Post-World War II World)

সোভিয়েত রাশিয়া (Soviet Russia): ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ব্রিটেনের দুর্বলতা অক্ষশক্তিবর্গ—জাপান, জার্মানি ও ইতালির পতন এবং অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্দশা ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে সাম্যবাদ প্রসারের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর জগতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সম-মর্যাদা ও শক্তি-সম্পন্ন ছিল। এমতাবস্থায় সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব মলটভের উক্তি "We live in an age when all roads lead to Communism." সোভিয়েত পররাষ্ট্র-সম্পর্ক তথা সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিল।* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের মার্কস্‌বাদীয় ব্যাখ্যা অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বুর্জোয়া আধিপত্য পৃথিবীর সর্বত্র আরও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে এবং প্রোলিটার্যারিয়াট শাসন স্থাপিত হইবে। সোভিয়েত রাশিয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল এই ব্যাপক বিপ্লবের নেতৃত্ব করা। স্বভাবতই, পৃথিবীর সর্বত্র প্রোলিটার্যারিয়াট বিপ্লবে সাহায্য ও উৎসাহ দান এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারী জনসাধারণকে সমর্থন সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সোভিয়েত আদর্শের ব্যাপক প্রসার, সোভিয়েত-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন ও সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং সোভিয়েত রাশিয়া যাহাতে অপরাপর রাষ্ট্রের ভীতির সঞ্চার না করে সেজন্য 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (Peaceful Co-existence) নীতি সোভিয়েত রাশিয়া অনুসরণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে। এই শান্তিপূর্ণ সহ-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে "সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতি

* Molotov's Speech, November 6, 1947. Vide M. G. Gupta *International Relations Since 1919. Part II*, p 2৬5.

অবস্থান নীতি আঞ্চলিক যুদ্ধ-বিগ্রহের—যথা, কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দো-চীনের যুদ্ধ প্রভৃতির অবসান ঘটাইতে না পারিলেও এই নীতি অনুসরণের ফলে কোন ব্যাপক আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলসমূহের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, আলবানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি বাদেই মোট প্রায় ২৭৪ মিলিয়ন বর্গমাইল (অর্থাৎ ২৭ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গমাইল) স্থান রাশিয়ার অধীন হইয়াছিল। পূর্ব জার্মানিও সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। একমাত্র যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ-পাশ ছিন্ন করিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সার্বভৌম হইয়া গিয়াছে। মার্শাল টিটো ও স্টালিনের মধ্যে মতানৈক্যই ছিল উহার কারণ। স্টালিনের আমলে মধ্য প্রাচ্যে রাশিয়া কর্তৃক ইরাণের আজারবাইজান অধিকার, গ্রীসের অন্তর্যুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌পন্থীদের উৎসাহ ও সাহায্য দান, ইওরোপের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার (European Recovery Plan) পাল্টা সংস্থা কমিন্‌ফরম (Cominform) গঠন, কোরিয়ার যুদ্ধে সাহায্য দান, বার্লিন-অবরোধ এবং কমিউনিস্ট্‌ চীনের সহিত পরস্পর সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর স্টালিনের আমলের সোভিয়েত পররাষ্ট্র সম্পর্কের কার্যকলাপের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্টালিনের পররাষ্ট্র নীতির অনমনীয়তা এবং উহার ব্যাপকতা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অন্তরে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া সেগুলিকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিল। বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠনে তাহা পরিলক্ষিত হইল। পক্ষান্তরে ঐ সময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র-নায়কগণ একথাই রুশ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি (Capitalist Countries) সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই সকল দেশের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট্‌ রাশিয়ার অস্তিত্ব বিলোপ করা। ফলে, রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ ও সেই সকল দেশবাসীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। রাশিয়া অ-কমিউনিস্ট্‌ দেশগুলির সহিত সর্বপ্রকার আদান-প্রদান এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল যে, রাশিয়া ঐ সময়ে এক কঠিন 'লৌহ-আবেষ্টনী'র (Iron Curtain) অন্তরালে নিজেকে অপসৃত করিয়াছে এই ধারণা পৃথিবীর সর্বত্র

স্টালিন-নিয়ন্ত্রিত রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্রাদি

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি

সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নীতিগত বৈষম্য

স্বভাবতই সৃষ্টি হইল। স্টেটিন হইতে ট্রিয়েস্ট পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এই লৌহ-আবেষ্টনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বিদেশ হইতে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষেও সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ খুবই কঠিন ছিল।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে যুদ্ধমনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া অভিযুক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে সামরিক সাজ সরঞ্জাম, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রভৃতি বৃদ্ধি ও আণবিক গবেষণা দ্বারা শক্তিশালী মারণাস্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হইল। তথাপি নীতিগতভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শ বলিয়াই রুশ সরকার পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টির জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। এই উদ্দেশ্যে স্টালিনের আমলে একাধিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের 'স্টক্‌হলম্ শান্তি আবেদন' (Stockholm Peace Appeal) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আবেদনে আণবিক বোমা প্রস্তুত নিষিদ্ধ করণের অনুরোধ পৃথিবীর আণবিক বোমা প্রস্তুতকারী দেশ-সমূহের নিকট জানান হইয়াছিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিরক্ষার আন্দোলনকে নিছক প্রচারকার্য বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহারা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচার এবং প্রকৃত কার্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া রাশিয়া শান্তিস্থাপনে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক নহে, একথাই প্রমাণ করিতে চাহিল। যাহা হউক, যোসেফ স্টালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩) পর সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা হইতে বর্তমান জগতে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার আগ্রহের আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেকেই নিঃসন্দিহান হইয়াছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টা—স্টক্‌হলম্ শান্তি আবেদন: পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সন্দেহ

স্টালিনের মৃত্যু—সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্কের পরিবর্তন

যোসেফ্ স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল ম্যালেনকভ্, মলটভ্, নিকোলাই বুলগানিন, বেরিয়া ও কাগানোভিচ্—এই পাঁচজন নেতার উপর। ম্যালেনকভ্ হইলেন প্রধানমন্ত্রী, মলটভ্ পররাষ্ট্র সচিব বুলগানিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, বেরিয়া আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ও পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী এবং কাগানোভিচ্ হইলেন অর্থনৈতিক বিষয়াদির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু সেই সময়ে সোভিয়েত নেতৃবর্গের মধ্যে যে

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন নেতৃবর্গ

বর্তমান পৃথিবী
রুশ মিত্রশক্তিবর্গ
মার্কিন মিত্রশক্তিবর্গ
ফরাসী ইউনিয়ন
ব্রিটিশ কমনওয়েলথ

মতানৈক্য ও মনোমালিন্য চলিতেছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই বেরিয়ার গ্রেপ্তার ও তাঁহার সমর্থকগণের পদচ্যুতিতে প্রকাশ পাইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেনকভ্-এর স্থলে নিকোলাই বুলগানিন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এদিকে মার্শাল জুকভ্ হইলেন সমর অধিনায়ক ও মার্শাল ভরোশিলভ্ হইলেন প্রেসিডেণ্ট।

স্টালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই সোভিয়েত পররাষ্ট্র-সম্পর্কের তথা পররাষ্ট্র-নীতির যে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিল তাহা সোভিয়েত সরকারের কার্যকলাপের মধ্যেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নূতন রুশ নেতৃত্বাধীনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপ কতকটা হ্রাস পাইল। কারণ স্টালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে বক্তৃতায় এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ম্যালেনকভ্ রাশিয়ার আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত (Supreme Soviet)-এর এক অধিবেশনে রুশ পররাষ্ট্র-সম্পর্কের কতকগুলি নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। এই বক্তৃতায় সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীর সকল দেশ এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও সকল সমস্যার সমাধান করিবার আগ্রহ এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সহ-অবস্থান নীতি মানিয়া চলা রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের মূল সূত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সকল মূল সূত্রের কার্যকরী প্রয়োগ দেখা গেল কোরিয়ার যুদ্ধের অবসানকল্পে এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে (জুলাই, ১৯৫৩)। ইহা ভিন্ন, বিদেশীয়দের সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ সম্পর্কে যে সকল কঠোর বাধা-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল সেগুলিও উঠাইয়া লওয়া হইল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতেও রাশিয়া স্বাক্ষর করিল। সর্বোপরি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সানফ্রান্সিস্কো শহরে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর (মে ১৫, ১৯৫৫)। সোভিয়েত রাশিয়ার এই নূতন পররাষ্ট্র-নীতি পূর্ব-ইওরোপ, মধ্য-প্রাচ্য, পশ্চিম-ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র প্রযুক্ত হইল। গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, ইসরায়েল-এর সহিত রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ-স্থাপন করিল এবং ড্যাগ হ্যামারশিল্ড (Dag Hammarskjoeld)-এর ইউনাইটেড

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রসমূহ

সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন পররাষ্ট্র-নীতির কার্যকরী প্রয়োগ

স্থাশন্‌স্-এর সেক্রেটারী-জেনারেল পদে নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিল। স্টালিনের উত্তর-সাধকগণ পররাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান পররাষ্ট্র-নীতির অন্ততম প্রধান উপায় এবং নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অ-কমিউনিস্ট্ দেশগুলিকে অর্থ-নৈতিক সাহায্যদানের মাধ্যমে সেই সকল দেশের জনসাধারণকে পূর্বতন অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া এক উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক জীবন ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে আগাইয়া দেওয়াই নূতন সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির অন্ততম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্ক আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলা যাইতে পারে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্রুশ্চভ্-এর নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সম্পর্কে উদারনীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ক্রুশ্চভ-এর নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েত নীতির উদারতা

অবশ্য ঐ বৎসরই সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দেশ পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে সাময়িকভাবে রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতিতে কঠোরতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় সেই কঠোরতা দূরীভূত হইয়া উদারতারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

পূর্ব-ইওরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে যেগুলি রাশিয়ার প্রভাবাধীন সেগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড অন্ততম প্রধান। সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব-জার্মানির সহিত সংযোগ রক্ষা করাও পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়াই সম্ভব। এমতাবস্থায় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে পোজনান নামক স্থানে এক আন্তর্জাতিক মেলা উপলক্ষে এক দাঙ্গা শুরু হইলে উহা কঠোর হস্তে দমন করা হইল। সোভিয়েত সরকার ও

পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ

সোভিয়েত সরকারের প্রভাবাধীন পোল্যাণ্ড সরকার এই দাঙ্গা সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছে, একথাই ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থাকে চাপা দেওয়া সম্ভব হইল না। জন-সাধারণের সোভিয়েত রাশিয়া-বিরোধী মনোভাব পোল্যাণ্ডের সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অবশেষে বহিঃশক্তির প্রভাব-মুক্ত জাতীয়তা-ভিত্তিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী ল্যাডিস্লাভ্ গোমুল্কা (**Wladyslav Gomulka**) পোল্যাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সোভিয়েত নেতৃবর্গ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভ্, মিকোয়ান, কাগানোভিচ্ ও মলটভ্ পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসোতে আসিয়া

পোল্যাণ্ড-সোভিয়েত চুক্তি

আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের নেতৃবর্গকে মস্কোতে এক যুগ্ম বৈঠকের জন্ম আমন্ত্রণ জানাইয়া আসিলেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর মস্কোতে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত নেতৃবর্গের যুগ্ম

বৈঠকে উভয় পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে পোল্যাণ্ডের সীমার মধ্যে মোতায়েন রুশ সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস, সৈন্যদের ব্যয় সোভিয়েত সরকার কর্তৃক বহন, রাশিয়ার নিকট পোল্যাণ্ডের পূর্বেকার দুই বিলিয়ন রুব্‌ল ঋণ নাকচ করা হইবে স্থির হইল এবং পোল্যাণ্ডকে নানাপ্রকার জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ ব্যাপারে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাশিয়ার সাহায্য ও সৌহার্দ্য পোল্যাণ্ডের নিকটও অপরিহার্য ছিল। এইভাবে নূতন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত রাশিয়ার উদার পররাষ্ট্র-নীতির ফলে পোল্যাণ্ডের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism) ও সোভিয়েত সাম্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইল।

রুশ সাম্যবাদ ও পোল্যাণ্ডের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের সামঞ্জস্য বিধান

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ ১৯৫৬, ২৩শে অক্টোবর (Hungarian Revolt 1956, October, 23): সোভিয়েত রাশিয়া-প্রভাবিত দেশসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পোল্যাণ্ডেই যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এমন নহে। হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-প্রভাব ও কঠোর সাম্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। পোল্যাণ্ডে গোমুল্‌কার ক্ষমতালাভ হাঙ্গেরীর জাতীয় আন্দোলনকে আরও উৎসাহিত করিয়াছিল। হাঙ্গেরীর যুবসম্প্রদায় ও শ্রমিকগণ ছিল এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ শুরু হয় ও সাময়িক-ভাবে উহা সাফল্য লাভ করে। এমন কি, ২৯শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহকাল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক এই বিদ্রোহ দমনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হাঙ্গেরী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার পরবর্তী দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া সোভিয়েত সামরিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির তৎপরতায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লবের পূর্বেকার শাসন-পদ্ধতি পুনঃ-স্থাপিত হয়। বিপ্লব শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরীর কেন্দ্রীয় সমিতি (Hungarian Central Committee) হেজেডাস (Hegedus)-এর স্থলে নাগি (Nagy)-কে প্রধানমন্ত্রী-পদে স্থাপন করিয়া হাঙ্গেরীর শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব দান

বিদ্রোহ ১৯৫৬, অক্টোবর

করিয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারী জেরো (Geroe) নাগিকে না জানাইয়া 'ওয়ারসো চুক্তি'র শর্তানুসারে রাশিয়ার নিকট সামরিক সাহায্য চাহিলেন। সোভিয়েত ও হাঙ্গেরীয় সেনাবাহিনী বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিয়োজিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া হইতে (২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৬) সুশ্‌লভ্‌ ও মিকোয়ান বুদাপেস্ট-এ আসিয়া হাঙ্গেরীর শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী-পদে নাগি-র নিয়োগ সমর্থন করিলেন এবং কাদার (Kadar)-কে পার্টি সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সেনাবাহিনী হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে নিযুক্ত হইলে হাঙ্গেরীতে উহার তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর জনমত ইহার সমর্থন করিল না। এমতাবস্থায় সোভিয়েত সরকার বুদাপেস্ট হইতে রুশ সৈন্য অপসারণ করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নাগি ও কাদারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। এদিকে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ প্রায় জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। নাগি হাঙ্গেরীর 'সোশিয়ালিস্ট ডেমোক্রেটিক দল' ও 'পেটো ফি পার্টি'—এই উভয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক যুগ্ম মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করিলেন। এমতাবস্থায় সোভিয়েত দূত মিকোয়ান ও সুশ্‌লভ্‌ পুনরায় হাঙ্গেরীতে আসিলেন। কিন্তু এবার নাগি রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ওয়ারসো চুক্তি দ্বারা যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নাকচ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নাগি-র এই দাবি মিকোয়ান ও সুশ্‌লভের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা কাদারের সহিত পৃথক্‌ভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত নাগির পদচ্যুতি এবং কাদারের প্রধানমন্ত্রিত্বলাভে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। নাগিকে সোভিয়েত সরকার গোপনে হাঙ্গেরী হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া গেলেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। বিপ্লবী সভা-সমিতি, শ্রমিকদের সমিতি সব কিছু বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল।

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে রুশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ

নাগি-র শাসনক্ষমতা লাভ

নাগি-কাদার মতানৈক্য

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের অবসান

হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে সোভিয়েত সৈন্যের অংশগ্রহণ পৃথিবীর সর্বত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক গভীর অসন্তোষ ও তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করিলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশ্চভ্‌, মেলেনকভ্‌ এবং চু-এন-লাই হাঙ্গেরীর সহিত

সোভিয়েত রাশিয়ার সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট-এ আসিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী কাদারকে রাশিয়ায় আসিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া ক্রুশ্চভ্ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিলেন। হাঙ্গেরীর জনসাধারণের রুশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় তাঁহারা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কাদার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পুনরায় আলাপ-আলোচনা শুরু হইল। অবশেষে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য রাশিয়া বহু পরিমাণ অর্থ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইল। ইহা ভিন্ন হাঙ্গেরীর নিজস্ব প্রয়োজনে যতদিন পর্যন্ত রুশ সেনাবাহিনী হাঙ্গেরীতে রাখা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিককাল রুশসৈন্য হাঙ্গেরীতে রাখা হইবে না এবং হাঙ্গেরীর বিচারালয়ে রুশ সৈন্যগণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করা হইবে স্থির হইল। এই সকল শর্তসম্বলিত চুক্তি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ বুদাপেস্ট শহরে সোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পর হইতে হাঙ্গেরী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পরস্পর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ-ই রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া হাঙ্গেরীকে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

সোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরীর চুক্তি (২৮শে মার্চ, ১৯৫৭)

হাঙ্গেরীয় বিপ্লব সম্পর্কে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। হাঙ্গেরীয়দের জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে রুশ সেনাবাহিনী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে দমনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র জনমত প্রকাশিত হইলে সোভিয়েত সরকার হাঙ্গেরীর বিদ্রোহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানি ও অর্থসাহায্যদানের গোপন তথ্যাদি প্রকাশ করেন। বস্তুত, মার্কিন সরকার কর্তৃক পূর্ব-ইওরোপস্থ সোভিয়েত প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির 'মুক্তি-সাধন' করিবার ইচ্ছা প্রকাশে এতদঞ্চলে শান্তি ব্যাহত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য।

হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহে বহিঃশক্তির অংশগ্রহণ

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার পরস্পর সম্পর্ক বহুল পরিমাণে সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগোস্লাভিয়া রুশ ব্লক ত্যাগ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রোলিট্যারিয়াট শাসন-নীতির স্থলে সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং স্বাধীন পন্থায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে যে-দেশের পক্ষে যে পন্থা সর্বাপেক্ষা

সহায়ক সেই দেশ সেই পন্থা অনুসরণ করিবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী। এই ব্যাপারে

রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়া

স্টালিন ও টিটোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টিটো যুগোস্লাভিয়াকে রুশ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই মার্চ স্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নূতন নেতৃবর্গ মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার শুরু করেন এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন পন্থা আছে এই যুক্তিও মানিয়া লইলেন। সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক দূত-বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি,

আদর্শগত অনৈক্য

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিন্‌ফর্‌ম-এর অবসান প্রভৃতি এই দুই দেশের মিত্রতার পরিচায়ক। কিন্তু ঐ বৎসর হাঙ্গেরীর বিপ্লবে সোভিয়েত রাশিয়ার দমনমূলক পন্থা অবলম্বনের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্ক কতকটা ক্ষুন্ন হইয়াছিল কিন্তু ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রুমানিয়ায় ক্রুশ্চভ্‌ ও টিটোর সাক্ষাৎকারের পর হইতে এই দুই দেশের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার আদর্শগত অনৈক্য এখনও বিদ্যমান আছে।

চীনদেশে সাম্যবাদের সাফল্যের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান নেহাৎ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্যবাদী চীন

কম ছিল না। সাম্যবাদী চীনের সংবিধানে ইহার প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের জন্য এক সাহায্য-সহায়তা ও সৌহার্দ্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নেব যুগ্ম প্রচেষ্টায় চীনদেশে নানাবিধ উন্নয়নমূলক এবং যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে চ্যাংচুন রেলপথ, পোর্ট আর্থার প্রভৃতি ফিরাইয়া দিয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে এবং ইন্দো-চীনের যুদ্ধে সাম্যবাদী চীন ও

পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা

সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদী দলকে যুগ্মভাবে সমর্থন করিয়াছে। চীনদেশকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্ত করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠনের বিরোধিতার ব্যাপারেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনদেশ সমানভাবে প্রতিবাদ করিয়াছে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের কালে চীন ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছে। এই সব হইতে সাম্যবাদী চীন ও সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরস্পর

সমর্থন, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আন্তরিকতার অন্তরালে পৃথিবীর সাম্যবাদী দেশসমূহের নেতৃত্ব ও বহির্মোঙ্গোলিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার লইয়া উভয় দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা প্রথম হইতেই ছিল।

প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা

যাহা হউক, সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চভের আমলে সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন এবং স্টালিন অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা ক্রমে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রসারের নীতিতে বিশ্বাসী স্টালিনপন্থী মাও-সে-তুং ক্রুশ্চভের সহাবস্থান নীতির সমর্থন স্বভাবতই করিতে পারেন নাই। এই আদর্শগত পার্থক্য দেখা দিবার পরও এই দুই দেশের মধ্যে কোন প্রকাশ্য বিরোধ পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং সোভিয়েত সরকার কিউবার সাহায্যে সেই দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি (missile bases) নির্মাণ শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ কেনেডির চাপে কিউবা হইতে সেই সকল সামরিক সরঞ্জাম অপসারণ করেন তখন হইতে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা প্রকাশ্যভাবে শুরু হয়। সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে আল্বানিয়া ও চীনই ক্রুশ্চভের কিউবা-নীতির তীব্র সমালোচনা করে। চীন ক্রুশ্চভের কিউবা-নীতির সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিল যে, পশ্চিমী-রাষ্ট্রগুলি হইল 'কাগজের তৈয়ারী বাঘ' (Paper tiger) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমী রাষ্ট্র-ভীতি 'কাগজের বাঘ' দেখিয়া ভীতিগ্রস্ত হইবার মতনই। ইহার প্রত্যুত্তরে ক্রুশ্চভ্ বলিয়াছিলেন যে, কাগজের বাঘই বটে, কিন্তু উহার দাঁত আণবিক শক্তিসম্পন্ন।

কিউবা ঘটনা—চীন-সোভিয়েত প্রকাশ্য বিবাদ

যাহা হউক, এইভাবে বাদানুবাদের পর চীন-সোভিয়েত আদর্শগত ও নীতিগত দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যভাবে শুরু হইল। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া MIG বিমান ভারতে প্রেরণ করিলে এবং সেইরূপ বিমান প্রস্তুতের জন্য কারখানা নির্মাণ করিতে মনোযোগী হইলে চীনদেশ সোভিয়েত নেতৃবর্গের তীব্র নিন্দা করে। চীন-সোভিয়েত সীমান্ত-বিরোধও ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করিলে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া হইতে রুশ-রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপে রত

চীন-সোভিয়েত বিরোধিতার তীব্রতা

এবং চীনের পক্ষে প্রচার-কার্যে রত চীনাদিগকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। বর্তমানেও এই বিরোধিতার কোন অবসান ঘটে নাই।

সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন (Shift in the Soviet Foreign Policy): স্টালিনের মৃত্যুব পব নূতন নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পবিবর্তনের কারণ সম্পর্কে পৃথিবীব বিভিন্নাংশে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে। কাহারো কাহারো মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক আবেদন পরিত্যাগ করিয়া বাশিয়াকে একটি জাতীয় বাষ্ট্রে রূপান্তরিত কবিবার উদ্দেশ্যেই পররাষ্ট্র-নীতির এইরূপ পবিবর্তন সাধন করিয়াছে। সশস্ত্র আন্দোলনেব মাধ্যমে অর্থাৎ বিপ্লবেব মাধামে পৃথিবীব সর্বত্র সাম্যবাদের প্রসার-নীতি রাশিয়া পবিত্যাগ কবিয়াছে এবং অপবাপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত সহাবস্থানেব নীতি মানিয়া লইয়াছে—এই মতও অনেকে প্রকাশ করিলেন। রাশিয়াব আভ্যন্তবীণ দুর্বলতা এই পরিবর্তনের মূল কারণ, এইরূপ মন্তব্যও কেহ কেহ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল মতামতের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিলেই আমবা আমাদেব নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাবিব।

বিভিন্ন মতামত

সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক আবেদন পবিত্যাগ করিয়া জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর অপরাপর শাসনব্যবস্থার সহিত সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান জগতে যত বেশি, পৃথিবীর ইতিহাসে অপব কোন সময়েই সেরূপ ছিল না। আণবিক যুগে 'সহাবস্থান' অথবা 'সহ-ধ্বংস' এই দুইয়ের একটি বাছিয়া লইতে হইবে, সেবিষয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতাগণ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিউবার ঘটনা হইতেই এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি অপসারণের পশ্চাতে আণবিক যুদ্ধের সর্বনাশাত্মক ফলাফল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার দায়িত্বের স্বীকৃতি রহিয়াছে বলা বাহুল্য। এই ঘটনা হইতেই রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি ও আদর্শ যে যথেষ্ট বাস্তববাদী তাহা প্রমাণিত হয়।

সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত

কিউবার উদাহরণ

কিউবা ঘটনা ভিন্ন চীন-ভারত বিরোধে রাশিয়ার নীতি উগ্র সাম্যবাদসুলভ আক্রমণাত্মক নীতির বিরোধী এবং সহাবস্থানের পক্ষপাতী সেকথা প্রমাণ করিয়াছে।

চীন-ভারত বিরোধ ও সোভিয়েত রাশিয়া

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে (১৯৬৩) পশ্চিমী-শক্তিবর্গের সহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ জলে, স্থলে বা বায়ুমণ্ডলে করা হইবে না, একমাত্র ভূগর্ভেই করা চলিবে, এই চুক্তি নিরস্ত্রীকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সন্দেহ নাই।

আণবিক বিস্ফোরণ-সংক্রান্ত চুক্তি

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ কারিগরি উন্নয়ন, অনুন্নত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক সাহায্যদান, মারণাস্ত্র প্রস্তুতকরণে রাশিয়ার ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মহাশূন্য জয়ে রুশ বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য—এই সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হেতু রুশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে কথা বলা চলে না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই পণ্ডিত নেহরু রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষা, কারিগরি জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উন্নতি—সব দিক্ দিয়াই রুশ সমাজ এক চরম উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং যুদ্ধের ভীতি দূর হইলে উহাতে কতক পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতাও আসিতে পারে।*

আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য

অধ্যাপক টয়নবি (Prof. Toynbee)-র মতে সাম্যবাদ ধর্মান্দোলনের ন্যায়ই প্রথমে উগ্র, আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে ধর্মান্দোলন অপরাপর ধর্মমতের সহিত সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রাথমিক আক্রমণাত্মক নীতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী ও অ-সাম্যবাদী অংশের মধ্যে নিছক বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনেই সহাবস্থান নীতির অনুসরণ প্রয়োজন হইবে। বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার প্রয়োজনেই রুশ পররাষ্ট্র-নীতির এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে, একথা বলা অযৌক্তিক হইবে না।

অধ্যাপক টয়নবির মত

অল্পকাল পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের অপসারণ এবং এলেক্সি কোসিজিনের প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণ সোভিয়েত আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিবে এই আশঙ্কা সাধারণ্যে জাগিয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইহা

---

*"I imagine that if fear of war goes, there will be a progressive approach to normality and a measure of individual freedom may also come in its train."—Jawaharlal Nehru, July 19, 1955.

সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, সোভিয়েত রাশিয়া শান্তির পথই অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর এবং এদিক দিয়া চীনের জঙ্গীবাদের সহিত রাশিয়া কোনপ্রকার আপস করিতে রাজী নহে, ইহাও স্পষ্ট হইয়াছে।

শান্তিকামী রাশিয়া

সর্বশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে সোভিয়েত নেতৃত্বের উদারতা, সহাবস্থানের আগ্রহ, পৃথিবীকে আণবিক যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ফলাফল হইতে রক্ষার জন্য দায়িত্ববোধ পৃথিবীর সর্বত্র এক আশার সঞ্চার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সহিত রাশিয়ার আদর্শগত পার্থক্য হেতু বিরোধ ক্রমেই হ্রাস পাইয়া অধিকতর সৌহার্দ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে।

চীনের সহিত তুলনা

সাম্যবাদী চীন এশিয়ার দেশসমূহের পক্ষে যে ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পশ্চিম জগতে রাশিয়া সেরূপ ভীতির কারণ নহে, একথা স্পষ্টভাবেই বলা যাইতে পারে। সাম্যবাদ সম্পর্কে এই দুই দেশের চিন্তাধারার পার্থক্যই ইহার কারণ, বলা বাহুল্য।

গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি গ্রেট ব্রিটেন ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ব-মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রায় তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থ নৈতিক চাপ এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিধি হ্রাস প্রভৃতি এজন্য দায়ী ছিল, বলা বাহুল্য। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের পক্ষে আত্মরক্ষার ব্যাপারে অপরাপর শক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধনীতি অনুসরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িল। NATO-তে অংশ গ্রহণ ইহারই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্রিটেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল এবং অপরাপর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেই নেতৃত্ব যেমন রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ত্যাগ করিতে হইয়াছে, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতিও ত্যাগ করিয়া ব্রাসেলস্ চুক্তি, NATO, SEATO, CENTO (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতিতে যোগদানে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটেনের স্বতন্ত্রনীতির দুর্বলতা, অর্থাৎ মার্কিন

ব্রিটেনের মর্যাদা হ্রাস

আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রজোটে যোগদানের নীতি অনুসরণ

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুগ্মভাবে না থাকিয়া কোন সামরিক অভিযান বা পরিকল্পনা কার্যকরী করা ব্রিটেনের পক্ষে যে আর সম্ভব নহে, তাহার প্রমাণ সুয়েজখাল দখলে রাখিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সামরিক অভিযানের ব্যর্থতায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের প্রতি উদারনীতির অনুসরণ ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের মূলনীতির পরিবর্তনের পরিচায়ক। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বর্তমান নীতি পশ্চিম ইওরোপীয়-রাষ্ট্রবর্গের সহিত সংঘবদ্ধভাবে চলিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

সুয়েজ খাল আক্রমণের ব্যর্থতা

সাম্যবাদী নীতির স্থলে উদারনীতির অনুসরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বপ্রধান শক্তিদ্বয়ের অন্যতম হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নেতৃত্ব অর্জন করিয়াছে এবং এই নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনেই উহার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি (Policy of isolation) ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম নেতা হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্বস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রীসের অন্তর্যুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌দের দমনের অক্ষমতা দেখা দিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান "স্বাধীন জাতি তথা রাষ্ট্রমাত্রকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সামরিক দমন-নীতি অথবা বহিরাগত চাপ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক নীতির সূত্র বলিয়া গৃহীত হইবে", এই ঘোষণা করিলেন এবং গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশকে কমিউনিজম্-এর বিরুদ্ধে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক এক বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করাইলেন (১৯৪৭)। এই নীতি 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' (Truman Doctrine) নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সাম্যবাদের প্রসার এবং বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্যবাদী দল কর্তৃক প্রাধান্য লাভের বিরোধিতা করাই ছিল ট্রুম্যান ডকট্রিন-এর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন স্বাতন্ত্র্য-নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত

ট্রুম্যান ডকট্রিন

ঐ বৎসরই (১৯৪৭) জুন মাসে জর্জ মার্শাল 'মার্শাল প্ল্যান' (Marshall Plan) ঘোষণা করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরোপীয় দেশসমূহকে দারিদ্র্যজনিত হতাশা ও উহার ফলে সাম্যবাদের প্রতি স্বাভাবিক

মার্শাল প্ল্যান

আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিশাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করিলেন। এই পরিকল্পনা ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা (European Recovery Programme—ERP) নামেও পরিচিত। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ—এই চারি বৎসরের মধ্যে মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপীয় মহাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনা ভিন্ন অনুন্নত দেশ মাত্রকেই 'কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা' (Technical Co-operation Programme—TCP) অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯—১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মোট ৩৯ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে। এই কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা Point Four Programme নামেও পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দেশসমূহের সাহায্যার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'কলম্বো পরিকল্পনা'-য় (Colombo Plan) যোগদান করিয়াছিল (১৯৫১)। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত TCP হইতে পাঁচ কোটি ডলার ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পাইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইওরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা তথা পৃথিবীর যাবতীয় অনুন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ সাহায্যদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল কমিউনিজমের প্রসার রোধ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, ক্ষুধিত জনসমাজের মধ্যে সাম্যবাদের প্রচার ও প্রসার স্বভাবতই ঘটিবে একথা মার্কিন নেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়া উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতিকে বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তরিত করিয়াছে।

'কারিগরি সাহায্য-সহায়তা পরিকল্পনা' (Technical Co-operation Programme= TCP)

কলম্বো প্ল্যান

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি বিশ্বরাজনীতিতে রূপান্তরিত

এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশকে দ্বিতীয় যুদ্ধের কালে জার্মানির কবলমুক্ত করিয়াছিল। এই সকল দেশ—পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবানিয়া প্রভৃতি লইয়া সোভিয়েত ব্লক বা সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়াছিল। যুগোস্লাভিয়া অবশ্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নেতৃত্ব ত্যাগ

করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও NATO, SEATO, CENTO প্রভৃতি রাষ্ট্রজোট গঠন করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

NATO, SEATO, CENTO, প্রভৃতি রাষ্ট্রজোট গঠন

চীন দেশের সাম্যবাদী দলের বিরুদ্ধে চিয়াং-কাইশেক্-এর জাতীয়তাবাদী দলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর্যাপ্ত আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী দলের জয়লাভ স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্যবাদী চীনের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্যবাদী চীনের শত্রুতে পরিণত করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সাম্যবাদী প্রসার-নীতির বাধা দান করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই একই কারণে চীনের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তির বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ করিয়া আসিতেছিল। চীন-ভারত বিরোধের কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োজনীয় সামরিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীন-নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চীনের সহিত সমঝোতায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধা না দেওয়া এবং ইদানীং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফর এই পরিবর্তনের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে ভারতের প্রতি বৈরিতা নিক্সন প্রশাসনের অন্যতম নূতন নীতি হিসাবে চালু হইয়াছে।

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সামরিক রাষ্ট্রজোট গঠন এবং অপরাপর দেশকে নানাভাবে অর্থসাহায্যদান করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে বলা কঠিন। সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিরুদ্ধ শক্তি বা শক্তিজোটকে যুদ্ধ-সৃষ্টি হইতে নিরস্ত রাখিবার নীতি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা না আনিয়া এক অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা ও পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছে একথা বলা যাইতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বর্তমান নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষভাব দ্বারা প্রভাবিত, বলা বাহুল্য। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রকে সাম্যবাদী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে গিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বনাশসাধনকারী সামরিক একক অধিনায়কত্বের (Military

মার্কিন পররাষ্ট্র সম্পর্কের সমালোচনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখীন সমস্যা

dictatorship) সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অযাচিত এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অর্থসাহায্যদানের ফলে সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলির কোন কোনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রভৃতি দাবী করিতেছে। যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যতম প্রধান সমস্যাই হইল পৃথিবীর শান্তি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, আণবিক যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীর জনসাধারণ যাহাতে রক্ষা পায় সেই সকল সমস্যার সমাধান করা।

ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কিউবার ঘটনা লইয়া ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল এবং পরিস্থিতি প্রকাশ্য যুদ্ধে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রুশ্চভ্ কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি সরাইয়া লওয়ায় রাশিয়া যে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হইতে দিতে চায় না, সেই বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিঃসন্দিহান হইয়াছিলেন। ইহার সুফল হিসাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ ও রাশিয়ার মধ্যে আণবিক বিস্ফোরণ নিরোধকল্পে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (মস্কো চুক্তি, আগস্ট, ১৯৬৩)। পৃথিবীর অপরাপর বহু রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। রুশ-মার্কিন সম্প্রীতি পৃথিবীর শান্তিকামী দেশ মাত্রেই আশার সঞ্চার করিয়াছে।

আণবিক বিস্ফোরণ-নিরোধ চুক্তি

রুশ-মার্কিন সম্প্রীতি

ফ্রান্স (France) : যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানির কবল-মুক্ত ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা ফরাসী সরকারকে এক অতি জটিল অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রের অব্যবস্থা যুদ্ধোত্তরকালে স্থাপিত চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার (Fourth Republic) পতন অনিবার্য করিয়া তুলিলে জেনারেল দ্য গল (De Gaulle) শাসনব্যবস্থা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু পররাষ্ট্রক্ষেত্রে দুর্বলতা ফ্রান্সকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং জার্মানির ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ফ্রান্স ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ ব্রাসেল্‌স্ চুক্তি, NATO প্রভৃতিতে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। তথাপি সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

পর-নির্ভরশীলতা

রক্ষা করিয়া চলা, আণবিক শক্তিতে নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া পুনরায় ইওরোপ তথা পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে যথেষ্ট আঘাত হানিয়াছে। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ঘোষণা, টিউনিস ও মরক্কোর স্বাধীনতা অর্জন, আলজেরিয়ায় বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ প্রভৃতি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শ্মশানশয্যা রচনা করিয়াছে। ভারতে ফ্রান্স অধিকৃত স্থানগুলির শাসনভার ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্রিটেনের সহিত যুগ্মভাবে সুয়েজ অভিযান করিতে গিয়া ফ্রান্স মিত্রশক্তি ব্রিটেনের ন্যায়-ই সম্পূর্ণভাবে বিফল ও হৃতমর্যাদা হইয়াছে। বর্তমান জগতে ফ্রান্স তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গের সহিত পংক্তিভুক্ত হইলেও আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রীয় শক্তি, সামর্থ্য বা মর্যাদার দিক্ দিয়া বিচার করিলে ফ্রান্স পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের স্কন্ধে মৃতের বোঝাস্বরূপ।

সাম্রাজ্যচ্যুতি

সুয়েজ অভিযানের ব্যর্থতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে রুশ-মার্কিন মৈত্রীনাশের কারণ (Causes of Russo-American rift soon after the Second World War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রবর্গের জার্মানি তোষণ রাশিয়ার ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রাশিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে মিত্রশক্তিগুলির উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত রাশিয়াকে জার্মানির সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি আত্মরক্ষার এবং জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সময় লইবার উদ্দেশ্যেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। অনুরূপ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে জার্মানি ও জার্মানির মিত্রশক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রুশ-জার্মান চুক্তির পশ্চাতে আত্মরক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল ঠিক সেইরূপ উদ্দেশ্যই বিদ্যমান ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক জার্মানিকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উভয়ই আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। রাশিয়ায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, শয়তানের সঙ্গেও পুলের শেষ পর্যন্ত হাঁটা যায় (You

রুশ-জার্মান চুক্তি

রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মৈত্রী

can walk with the Devil up to the end of the bridge)। রাশিয়া কর্তৃক ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তিবর্গের সহিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রতাবদ্ধ হওয়া এই ধরনেরই এক বিপৎকালীন ব্যবস্থা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সুতরাং যুদ্ধাবসানে সেই মিত্রতা বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রুশ-ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী মৈত্রী

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অভিপ্রেত না হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে রাশিয়া পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী দুইটি রাষ্ট্রের অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরটি হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্বভাবতই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাইল এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের কমিউনিস্ট্ রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় যুদ্ধাবসানে রাশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির অন্যতম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পারস্পরিক বিরোধের কারণ ছিল রাশিয়া কর্তৃক নিজ রাজ্যসীমার চতুঃপার্শ্বে এক তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের বেষ্টনী গঠন। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাশিয়া কর্তৃক জার্মানির একাংশের উপর অধিকার স্থাপন। ইহার ফলে মধ্য-ইওরোপে সাম্যবাদের অর্থাৎ কমিউনিজমের বিস্তারের পথ যেমন প্রস্তুত হইয়াছিল, তেমনি জার্মানিতে রুশ সৈন্যের অবস্থান পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি ও অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (Cold War) শুরু হয়। এই ঠাণ্ডা লড়াই কেবলমাত্র আদর্শগত বিরোধিতাকে কেন্দ্র করিয়াই শুরু হয় নাই, রাজনৈতিক ও মানসিক কারণও সেজন্য দায়ী ছিল। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন সন্দিহান ছিল তেমনি রাশিয়াও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। আদর্শগত বিরোধের ফলেই এই পারস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

রাশিয়া কর্তৃক তাঁবেদার রাষ্ট্র-আবেষ্টনী গঠন

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কমিউনিজমের যথেষ্ট প্রসার কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। এই যুদ্ধাবসানে রাশিয়ার রাজ্যসীমা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যতদূর বিস্তৃত ছিল ঠিক ততদূর বিস্তৃতি এবং ইওরোপে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার রুশ সীমা

পর্যন্ত সকল স্থান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি স্বভাবতই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাশিয়ার এই বিস্তৃতি এবং আনুষঙ্গিকভাবে রুশ আদর্শের প্রসার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল। সাম্যবাদের প্রসার বিশেষভাবে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট সাম্যবাদের জয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই উহা তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার প্রাধান্য; প্রতিপত্তি বিস্তার—পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি ও সন্দেহ

বলকান অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য বিস্তৃতি এবং বলকান রাষ্ট্রবর্গের যথা, আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং সাময়িকভাবে হইলেও যুগোস্লাভিয়ার উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইওরোপীয় রাষ্ট্র মাত্রেরই দারুণ ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তৃতি ইওরোপের ভীতি

ল্যাংসাম (**Langsam**) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাশিয়া কর্তৃক বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তৃতি, পূর্ব-ইওরোপে রুশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যলাভ রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তীব্রতার কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে রুশ রাজ্যসীমা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার সীমায় নির্ধারিত হইবার যৌক্তিকতা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ স্বীকার করিলেও বলকান অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য বিস্তৃতি এবং বলকান রাষ্ট্রবর্গ লইয়া রাশিয়ার সীমান্তে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র-আবেষ্টনী গঠন পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের যেমন অভিপ্রেত ছিল না, তেমনি উহা গঠন তাহাদের ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানিতে রুশ প্রাধান্য স্থাপনের মাধ্যমে মধ্য-ইওরোপে অর্থাৎ ইওরোপের কেন্দ্রস্থলে রাশিয়ার প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং লালফৌজের অবস্থান পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ভীতি ও সন্দেহের কারণ ছিল। ইহাই ছিল রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও বিরোধের প্রধান কারণ।

ল্যাংসামের মন্তব্য

বলকান অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য বিস্তার ও মধ্য-ইওরোপে লালফৌজের অবস্থিতি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল কারণ

এই পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাব রাশিয়া কর্তৃক গ্রীস ও তুরস্কের উপর প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন' (**Truman Doctrine**) ও 'মার্শাল প্ল্যান' (**Marshall**

গ্রীস ও তুরস্কের উপর রাশিয়ার চাপ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ট্রুম্যান ডক্ট্রিন, মার্শাল প্ল্যান ও ন্যাটো গঠন

Plan) চালু করিয়া তুরস্ক ও গ্রীসকে সাম্যবাদী প্রভাবমুক্ত করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক বার্লিন শহর অবরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে North Atlantic Treaty Organisation (NATO) নামক সামরিক জোট গঠনে মনোযোগী করিয়াছিল।

উপরি-উক্ত কারণসমূহের ফলে স্বভাবতই রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যে মৈত্রী ও সহযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছিল উহা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া এক বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফ স্টালিনের মৃত্যু অবধি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই অব্যাহত থাকে। ইহার পর নিকিতা ক্রুশ্চভ্ ক্ষমতায় আসীন হইলে প্রথমে এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, স্টালিনের আমলে অনুসৃত নীতিই বহাল থাকিবে। কিন্তু ক্রুশ্চভ্ পৃথিবীর বিভিন্নাংশের রাষ্ট্রবর্গের সহিত সহাবস্থান নীতি অনুসরণ রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে রুশ-মার্কিন তথা পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে তীব্র ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছিল উহা হ্রাস পাইতে থাকে।

ক্রুশ্চভের আমলে সহাবস্থান নীতি অনুসরণ

ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডির আন্তরিক চেষ্টার ফলে রুশ-মার্কিন পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাবের উপশম ঘটে। কিউবা সঙ্কটের সমাধানের পর এই দুই পক্ষের বিরোধ অনেকটা হ্রাস পায়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উপশম

জার্মানি: জার্মানির ঐক্য-সমস্যা (Germany : Problem of German Unity): বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশ্ব-ইতিহাসে জার্মানি দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টিকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক জার্মানির রাজ্যসীমা অধিকার ইওরোপীয় তথা বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধ না ঘটাইয়াও যুদ্ধের চাপের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যার অন্যতম প্রধান জটিল সমস্যাই হইল জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে বিজয়ী শক্তিবর্গ জার্মানিকে বিভক্ত করিবে না এই নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স সমগ্র জার্মানির অর্থনৈতিক ঐক্য এবং

পরাজিত জার্মানির দ্বিধা-বিভক্তি

সর্ববিষয়ে যুগ্ম-নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও কার্যত জার্মানিকে চারিটি অধিকৃত অঞ্চলে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চল হইতে মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম ফ্রান্সকে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনে ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে একটি মিত্রপক্ষীয় যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Allied Control Council) গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনটি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পশ্চিম-জার্মানি গঠন করা হইয়াছিল। পর বৎসর (১৯৪৮) মার্চ মাসে সোভিয়েত প্রতিনিধি Allied Control Council ত্যাগ করিয়া গেলে জার্মানি পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল ও পশ্চিমী অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই দুই অঞ্চলের শাসনপরিচালনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের ফলে জার্মানির সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিল। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা জার্মানির অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া জার্মানিকে সম্পূর্ণ পৃথক দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিল। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহর মিত্রপক্ষের যুগ্ম নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ-ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন হইল। বার্লিনের পশ্চিমাংশ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের এবং পূর্বাংশ সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানির ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের প্রভাব বার্লিন শহরের উপরও বিস্তৃত হইল। বার্লিন শহরটি আবার সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব-জার্মানিতে অবস্থিত। স্বভাবতই এই শহরের চতুর্দিক সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমতাবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং বিশেষভাবে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হইলে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গকে বার্লিন শহরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে বার্লিন শহরের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিয়া শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পনর মাস পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করিল। বিমানযোগে পশ্চিম-বার্লিনকে খাদ্য

মিত্রপক্ষীয় যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণ সমিতি (Allied Control Council)

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির নিয়ন্ত্রণ: পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিভেদ

পশ্চিম-জার্মানির পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা

ও অপরাপর সামগ্রী সরবরাহ করিয়া বাঁচাইয়া রাখা 'Berlin Airlift' নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। যাহা হউক, ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহকে অর্থাৎ পশ্চিম-জার্মানির সম্পূর্ণ একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বন্ নামক স্থানে এই তিনটি অঞ্চলের ৬৫ জন প্রতিনিধি সমবেত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের 'উইমার সংবিধান' (Weimar Constitution)-এর অনুকরণেই 'বন্ সংবিধান' (Bonn Constitution) রচিত হইয়াছিল। মোট এগারটি প্রদেশ লইয়া গঠিত পশ্চিম-জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একজন প্রেসিডেণ্ট, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল চ্যান্সেলর ও দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা লইয়া গঠিত আইনসভা আছে। ঊর্ধ্ব-কক্ষের নাম বুণ্ডেস্‌রাত্ (Bundesrat) ও নিম্নকক্ষের নাম বুণ্ডেস্ট্যাগ্ (Bundestag)। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্বাচনের পর ডক্টর থিওডোর হেস (Doctor Theodor Heuss) প্রেসিডেণ্ট এবং ডক্টর কন্‌রাড অ্যাডেনেয়ার (Dr. Conrad Adenauer) চ্যান্সেলর-পদ লাভ করেন। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীন পশ্চিম-জার্মানি অল্পকালের মধ্যেই অভাবনীয়ভাবে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পূর্বের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, চশমার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী, বিভিন্নপ্রকার কেমিক্যাল উৎপাদনে পশ্চিম-জার্মানির এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে।*

বার্লিন অবরোধ ও বিমানযোগে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ (Berlin Airlift)

বন্ সংবিধান

পশ্চিম-জার্মানির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত জার্মানির পূর্বাংশেও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic) নামে এক নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সংবিধান অনুসারে People's Chamber এবং Chamber of States নামে দুই কক্ষ লইয়া একটি আইনসভা গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের সভা বা People's Chamber-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক একজন মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি (Minister-President) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রোটওল্ (Grotewohl) মন্ত্রি-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব-জার্মানিতে সোভিয়েত

*Vide Langsam, pp. 645-49.

রাশিয়ার সাহায্য-সহায়তায় আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত দ্বিবর্ষ-পরিকল্পনা এবং ১৯৫১-৫৫ পর্যন্ত পঞ্চবর্ষ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু বিস্তৃতির দিক দিয়া, অর্থ নৈতিক সামর্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, লোকবল সকল দিক্‌ দিয়াই পূর্ব-জার্মানি পশ্চিম-জার্মানির তুলনায় দুর্বল। সোভিয়েত সরকারের সাহায্য-সহায়তায়ও এই অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ উন্নতি পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতির সহিত তুলনীয় হইয়া উঠে নাই।

পূর্ব-জার্মানির: নূতন সংবিধান—জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অকিঞ্চিৎকর

ইয়াণ্টা কন্‌ফারেন্সে জার্মানির রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঐক্য ভঙ্গ করা হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি সমবেত শক্তিবর্গ দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিভক্তি ঘটিয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও মতভেদ এজন্য দায়ী ছিল। এই মতভেদ হেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর হইতে আজ পর্যন্ত জার্মানির সহিত কোন শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক জটিল সমস্যা হইল জার্মানির পূর্ব ও পশ্চিমাংশের একত্রীকরণ এবং জার্মানিকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তকরণ। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য এই সমস্যা সমাধানের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ভিন্ন জার্মানিতে পশ্চিমী প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়া পশ্চিম-ইওরোপে সোভিয়েত-বিরোধী একটি কেন্দ্র গঠন করিবার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্যও পক্ষান্তরে পূর্ব-জার্মানিতে সাম্যবাদী কেন্দ্র গঠন করিবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার দৃঢ় সংকল্প জার্মানির ঐক্য-সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হইলে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ—প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-জার্মানিকে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করিবার নীতি গ্রহণ করিল। এবিষয়ে ফ্রান্সের বিরোধিতা এবং ব্রিটেনের সাবধানে অগ্রসর হইবার নীতি উপেক্ষা করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-জার্মানিকে নানাপ্রকার সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার নীতি অনুসরণ করিল। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতা তীব্রতর হইয়া উঠিল। এই সকল জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির ঐক্য-সমস্যার আলোচনা করিতে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর চুক্তি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।*

জার্মানির বর্তমান সমস্যা:

(১) জার্মানির ঐক্য

(২) বহিঃনিয়ন্ত্রণের অবসান

---

*Vide, *Survey of International Affairs*, 1949-50, pp. 154-55.

জার্মানির ঐক্য সম্পর্কে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের সুস্পষ্ট কোন ঘোষণার পূর্বেই সোভিয়েত রাশিয়া কতকগুলি শর্তাধীনে জার্মানির ঐক্যসাধনের প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব অনুসারে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উহাকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে এবং বৈদেশিক সৈন্যমাত্রকেই জার্মানি হইতে অপসারণ করিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র জার্মানির নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র জার্মানির ঐক্যসাধন করা চলিবে না। এই সকল প্রস্তাব হইতে একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, পশ্চিম-জার্মানির লোকসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবার ফলে নির্বাচনে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে, এই আশঙ্কা সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল। যাহা হউক, এই প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক গৃহীত না হইলে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানির পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কেবলমাত্র সমগ্র জার্মানির নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি 'কন্‌ফেডারেশন' (Confederation) গঠনের প্রস্তাব করিল (জুলাই ২৭, ১৯৫৭)। ইহার পূর্বেই পূর্ব-জার্মানিকে সোভিয়েত রাশিয়া গঠিত 'ওয়ারসো চুক্তি' (Warsaw Pact) এবং পশ্চিম-জার্মানিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ গঠিত North Atlantic Treaty-র সদস্যভুক্ত করা হইয়াছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাবে এই উভয় চুক্তি হইতে পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানির অপসারণ দাবি করা হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার কোন প্রস্তাবই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট গ্রহণীয় হইল না।

জার্মানির সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাব

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বার্লিন ঘোষণা (Berlin Declaration) দ্বারা জার্মানির ঐক্যসমস্যা সম্পর্কে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিল। এই ঘোষণায় প্রস্তাব করা হইল যে, সমগ্র জার্মানির স্বাধীন ও সম্পূর্ণরূপে প্রভাববিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জার্মান সরকারের উপর জার্মানির ঐক্য-সাধনের দায়িত্ব দিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা চলিবে না। ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার অনুযায়ী যে-কোন আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থা বা রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ লোকবল, অর্থ-নৈতিক বল ও শিল্পোৎপাদন ক্ষমতায় ক্ষমতাশীল পশ্চিম-জার্মানির ইচ্ছানুযায়ী

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পাল্টা প্রস্তাব

ঐক্যবদ্ধ জার্মানির রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হউক ইহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতানৈক্য ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করিল। জার্মানির সমস্যা লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসানকল্পে ব্রিটেন হইতে উহার সমাধানের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইল। এই প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানিকে 'পৃথকীকৃত অঞ্চল' (Disengaged zone)-এ পরিণত করিবার কথা বলা হইল। রাপাকি প্রস্তাব (Rapacki Proposal) নামে অনুরূপ আরও একটি প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানি এবং পোল্যাণ্ড-সহ মধ্য-ইওরোপের অঞ্চলটিকে 'পৃথকীকৃত ও আণবিক অস্ত্রবিহীন অঞ্চল' (Disengaged and Atom-free zone) বলিয়া ঘোষণার কথা বলা হইল। কিন্তু এই ধরনের প্রস্তাব কোন পক্ষের নিকট-ই গ্রহণযোগ্য হইল না।

পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মতানৈক্য

ব্রিটিশ প্রস্তাব : রাপাকি প্রস্তাব

বার্লিন সমস্যা (Berlin Problem) : জার্মানির সমস্যা কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে এমন নহে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহর এই সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। পশ্চিম-জার্মানির তুলনায় পূর্ব-জার্মানির অর্থ নৈতিক অপকর্ষতা স্বভাবতই পূর্ব-জার্মানির জনসাধারণকে পশ্চিম-জার্মানিতে চলিয়া যাইবার অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন নাৎসি জার্মানির প্রাধান্য লাভের কাল হইতে কমিউনিস্ট্ ও কমিউনিজমের প্রতি জার্মানদের যে ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পূর্ব-জার্মানির সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতি বহুলোকের স্বাভাবিক অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এজন্য বার্লিন শহরের পশ্চিমাংশে পূর্ব-জার্মানি হইতে অনেকেই চলিয়া আসিতে লাগিলে রাশিয়া এক কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। যাহা হউক, অবশেষে সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ শহর বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু এই প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশ্চভ্ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব-বার্লিনের শাসনভার সরাসরি নিজ দায়িত্বে আর রাখিবেন না; পূর্ব-বার্লিনকে

বার্লিন শহর-সংক্রান্ত সমস্যা

সোভিয়েত প্রস্তাব

পূর্ব-জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সমগ্র বার্লিন শহরকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ শহর হিসাবে স্থাপন করাই সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য এই কথাও ক্রুশ্চভ্ জানাইলেন। এবিষয় লইয়া পরবৎসর উভয়পক্ষের মন্ত্রিগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিল। কিন্তু পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ পশ্চিম-বার্লিনের শাসন অথবা নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্ববৎই রাখিতে চাহিলে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইল না।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পাল্টা প্রস্তাব

যাহা হউক, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা এবং পূর্ব-পশ্চিমী রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানকল্পে পৃথিবীর নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে এক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্বে মার্কিন বিমান U-2 সামরিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের ফটো লইবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করিলে রুশ সরকারের আদেশে উহাকে ভূপাতিত করা হইল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল প্রধানত উহার জন্যই শীর্ষ সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। শীর্ষ সম্মেলন ক্রুশ্চভের U-2 ঘটনা-সংক্রান্ত আক্রমণাত্মক বক্তৃতার পরই ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে, বার্লিন সমস্যা বা জার্মানির সমস্যা পূর্ববৎই রহিয়া গেল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক পূর্ব-জার্মানির অধিবাসীদের পশ্চিম-জার্মানিতে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিবার ফলে সাময়িকভাবে পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের রাষ্ট্রনায়কদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল উহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পুনরায় শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রয়োজন—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহা ভিন্ন নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চভ্কে অবহিত করিবার এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত সরাসরি আলোচনায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইতে নেহরু ও নক্রুমা রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ ও ম্যালির প্রেসিডেণ্ট

শীর্ষ সম্মেলন —U-2 ঘটনা— শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা

ঠাণ্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার আশঙ্কা

নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

মোভিকো কিইতো কেনেডিকে ক্রুশ্চভের সহিত সরাসরি আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পৃথিবীর শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এই চেষ্টার ফলে সাময়িকভাবে যে যুদ্ধের ছায়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা অপসৃত হইল। ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডি উভয়েই নীতিগতভাবে আণবিক নিরস্ত্রীকরণ, জার্মানির তথা বার্লিন সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও অসহিষ্ণুতা এই দুই পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছিল। আণবিক বিস্ফোরণ নিরোধ চুক্তি (**Moscow Treaty**) স্বাক্ষরের পরে ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডি উভয়েই যে আন্তরিক-ভাবে শান্তিকামী তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। তথাপি আণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও জার্মানির ঐক্য প্রভৃতি সম্পর্কে এখনও নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতেছে।

মধ্য-প্রাচ্য (The Middle East) : মধ্য-প্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও উহার খনিজ তৈল-সম্পদ উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থল হিসাবে মধ্য-প্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব যেমন অপরাপর বহু অঞ্চল অপেক্ষা অধিক, তেমনি পৃথিবীর খনিজ তৈল-সম্পদের মোট ৪২ শতাংশের উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবেও উহার প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহের লোলুপতা অত্যধিক। তদুপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংযোগপথ হিসাবে সুয়েজ খালের সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই সকল কারণে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহ মধ্য-প্রাচ্যের দিকে চিরকাল স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ ও আরব জাতির মধ্যে ঐক্যস্পৃহা ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি বিদ্বেষভাব মধ্য-প্রাচ্যের রাজ-নৈতিক সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ঔপনিবেশিক অধিকারমুক্ত মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে বর্তমানে যে জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে তাহার অন্যতম প্রকাশ ইওরোপীয় দেশসমূহের অর্থে গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। সর্বোপরি, মধ্য-প্রাচ্যের

মধ্য-প্রাচ্যের গুরুত্ব

মধ্য-প্রাচ্যের রাজ-নৈতিক জটিলতার কারণ

অধিবাসিবৃন্দের দারিদ্র্য এবং আরব-ইহুদি বিবাদে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের ইস্‌রায়েল-এর ইহুদিদের পক্ষ সমর্থন এই অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে তিন প্রকার পররাষ্ট্র-নীতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইরাণ বা পারস্য এবং তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্কে পশ্চিমী-রাষ্ট্রপ্রীতি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটে যোগদানের মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মিশর এবং মিশরের নেতৃত্বে অপরাপর আরব দেশ পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া এক নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক শান্তিকামী এবং আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নীতি অনুসরণে প্রয়াস পাইতেছে। আবার আলজিরিয়া এবং ইদানীং ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও শত্রুতাও পরিলক্ষিত হইতেছে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও পন্থা অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রধানত খনিজ তৈলের উৎস হিসাবে মধ্য-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কের পার্থক্য

মিশর (Egypt): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের মিশরীয় ইতিহাসে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই জেনারেল নগুইব কর্ণেল নাসের-এর নেতৃত্বে মিশরের রাজা ফারুক-এর বিরুদ্ধে এক বিপ্লব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশরীয় সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মচারিবৃন্দের জাতীয়তাবোধ এবং রাজা ফারুক-এর জনকল্যাণ-সাধনে ঔদাসীন্য রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। নগুইব ও নাসের-এর সামরিক বিপ্লব জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিলে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নগুইবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া গামাল আবদুল নাসের মিশরের শাসনক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। মিশরীয়দের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনা করা ই নাসের তাঁহার কর্মপন্থার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদিকে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে কমিউনিস্ট্-বিরোধী আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠনে তৎপর হইয়া উঠিল। প্রথমে ইরাক ও তুরস্ক নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইল (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫), কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের নিরাপত্তায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গের নিকট এই মৈত্রী-চুক্তি উন্মুক্ত রাখা হইলে ব্রিটেন, পাকিস্তান ও ইরান এই চুক্তিতে যোগদান করিল। এই চুক্তি বাগদাদ চুক্তি (Bagdad Pact or CENTO) নামে পরিচিত। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও ইহার সহিত সর্বপ্রকার সংযোগ রক্ষা করিতে লাগিল। বাগদাদ চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিশরের স্বভাবতই ভীতির উদ্রেক হইলে এই সামরিক রাষ্ট্রজোটের সম্ভাব্য শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে মিশরের নেতা নাসের রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট্ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিলেন। এদিকে নাসের মিশরের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন। কিন্তু মার্কিন সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আকস্মিকভাবে সেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলে নাসের স্যুয়েজ ক্যানাল কোম্পানিতে (Suez Canal Company) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যাবতীয় অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া উহার জাতীয়করণ করিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে এই বিরাট ক্ষতি স্বীকার করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই এই দুই দেশের সরকার সামরিক শক্তিবলে স্যুয়েজ খালের উপর দাবি কার্যকরী করিতে চাহিলেন। ইস্রায়েল গোপনে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়কে সাহায্যদান করিতে স্বীকৃত হইল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের সামরিক উপায়ে স্যুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির ব্যাপারটির সমাধানের বিরোধিতা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইঙ্গ-ফরাসী ও ইস্রায়েলী সৈন্য মিশর আক্রমণ করিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর মাধ্যমে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়া হইল। তদুপরি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর স্যুয়েজ আক্রমণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার প্রভাবও ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের পক্ষে এড়ান সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই অসাফল্য যেমন ব্রিটিশ ও ফরাসী কূটনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহা এই দুই রাষ্ট্রের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। পক্ষান্তরে নাসের-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং মিশরীয়দের জাতীয় জীবনের ঐক্য বহুল

বাগদাদ চুক্তি (বর্তমান CENTO)

ইঙ্গ-ফরাসী-মিশরীয় মনোমালিন্য

অস্ওয়ান বাঁধ নির্মাণে মার্কিন সাহায্যের আশা ভঙ্গ

স্যুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির জাতীয়করণ

ইঙ্গ-ফরাসী-ইস্রায়েলী আক্রমণ

ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ ও জনমতের চাপ—যুদ্ধ-বিরতি

দেশ ইরাণে সোভিয়েত রাশিয়ার কোনপ্রকার প্রভাব বা স্বার্থ যাহাতে বৃদ্ধি না পাইতে পারে সেইজন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরি-উক্ত নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইরাণীয় সরকারের পক্ষে তৈল উত্তোলন ও পরিস্রবণের কাজ পরিচালনা করা সহজ হইল না। ফলে, তৈল উৎপাদনের পরিমাণ যেমন হ্রাস পাইতে লাগিল তেমনি দেশের আর্থিক অবস্থারও অবনতি দেখা দিল। এমতাবস্থায় ইরাণে এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হইলে জেনারেল জাহেদী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। মোসাদ্দেককে কারারুদ্ধ করা হইল। নবগঠিত ইরাণীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে মার্কিন সরকার ৪৫ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য দান করিলেন এবং তৈলখনির কাজ পূর্ণমাত্রায় চালাইবার জন্য বিশেষজ্ঞ ও কারিগর ইরাণে প্রেরণ করিলেন। ইরাণীয় তৈল বিক্রয় সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী ওলন্দাজদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ২৫ বৎসরের জন্য ইরাণীয় সরকারের সহিত এক তৈল চুক্তি (**Oil Agreement**) স্বাক্ষরিত হইল (১৯৫৪)। এই চুক্তি ২৫ বৎসরের পর পাঁচ বৎসর করিয়া আরও তিন দফায় ১৫ বৎসর কাল চালু থাকিবে একথাও স্থির হইল। ইহার শর্তানুসারে **AIOC**-কে অর্থাৎ ব্রিটিশ বণিকদের ২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দানে ইরাণীয় সরকার সম্মত হইলেন। ইরাণের জাতীয় তৈল কোম্পানির উৎপন্ন তৈল ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও ওলন্দাজদের লইয়া গঠিত একটি বিক্রয়-সংস্থা কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। এই তৈল হইতে লব্ধ মোট লাভের ৫০ শতাংশ ইরাণীয় তৈল কোম্পানি এবং অপর ৫০ শতাংশ বিক্রয়-সংস্থার সদস্যগণ পাইবে স্থির হইল। এইভাবে ইরাণে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা কতকটা হ্রাস পাইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইরাণের বাগদাদ চুক্তির সদস্যভুক্তি ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাগদাদ চুক্তি বর্তমানে **Central Treaty Organisation** (**CENTO**) নামে পরিচিত। ইরাণীয় সরকারের পশ্চিমী ব্লক বা রাষ্ট্রজোটের প্রতি অনুরাগ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ইরাণীয়-মার্কিন পরস্পর আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন সাহায্য-সহায়তা

ইরাণে সামরিক বিপ্লব

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক নীতি অনুসরণ—ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন-ওলন্দাজ—তৈল বিক্রয়-সংস্থা গঠন

ইরাণের সহিত বিক্রয়-সংস্থার তৈল-চুক্তি

ইরাণের বাগদাদ চুক্তিতে (বর্তমান CENTO) যোগদান

কমিউনিস্ট্ দেশ রাশিয়ার প্রতি ইরাণের চিরাচরিত ভীতিও ইরাণীয় পররাষ্ট্র সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্‌পন্থী 'টুডে পার্টি' (Tudeh Party)-কে অবৈধ ঘোষণা করিবার মধ্যেও ইরাণের কমিউনিজম্ বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়।

ইরাণের কমিউনিজম্-বিরোধিতা

প্যালেস্টাইন সমস্যা (Palestine Problem): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানের দিকে কতক অগ্রসর হইয়াছিল এবং বৎসরে মোট দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিবে না এই শর্তও গৃহীত হইয়াছিল (২৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব হইল না। এদিকে আরব জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের মধ্যে সংগ্রামশীলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, এই দুই বিবদমান জাতির পরস্পর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরব-ইহুদি সমস্যাও সেজন্য জটিলতর হইয়া পড়িল। আরব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইওরোপে বাস্তহীন ইহুদিদের এক বিরাট সংখ্যা প্যালেস্টাইনে আশ্রয় লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় এক ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি (Anglo-American Committee) আরব-ইহুদি সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দেশের জন্য নিযুক্ত হইল। এই কমিটি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিল। এই রিপোর্ট-এর সুপারিশের প্রধান কথা-ই ছিল প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া। আরবদিগকে ইহুদিদের উপর বা ইহুদিগণকে আরবদের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য দান করা হইবে না, ইস্‌লাম, খ্রীষ্টীয় বা ইহুদি কোন জাতি বা ধর্মের লোকের স্বার্থ কোনভাবে বিনাশ করা হইবে না এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর তত্ত্বাবধানে আরব-ইহুদি বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার পূর্বাবধি প্যালেস্টাইন ম্যাণ্ডেট হিসাবেই পরিচালিত হইবে—এই সকল সুপারিশ ইঙ্গ-মার্কিন কমিটির রিপোর্টে করা হইয়াছিল। এই রিপোর্টে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 'শ্বেতপত্রে' (White Paper) আরব-ইহুদি সমস্যার সমাধানের যে নীতি বিশ্লেষিত হইয়াছিল তাহা বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া ইহুদিদের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে, এই কারণে আরবদের মধ্যে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে আরব-ইহুদি সমস্যার জটিলতা

(১) 'ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি'র সুপারিশ

দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। তাহারা ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান এবং প্যালেস্টাইন হইতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারণ দাবি করিল। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন সরকার উচ্চতর পর্যায়ের একটি দ্বিতীয় ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন (Anglo-American Commission) নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশন প্যালেস্টাইনে ইহুদি ও আরব অঞ্চল লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের এবং ইহুদি ও আরব অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারদানের সুপারিশ করিল। ইহা ভিন্ন প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রবেশ আরব-ইহুদিদের সম্মতির উপর নির্ভরশীল হইবে, এই নীতি গ্রহণেরও সুপারিশ করিল। এই সকল সুপারিশ কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদিদের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন লণ্ডন শহরে আহ্বান করিলেন। কিন্তু এদিকে অসংখ্য ইহুদি গোপনে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার এমতাবস্থায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্টের পর যে সকল ইহুদি প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে সাময়িকভাবে সাইপ্রাস দ্বীপে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে ইহুদিগণ (Zionists) উহার তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। আরবগণ পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ও ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান দাবি করিতেছিল। এমতাবস্থায় আরব বা ইহুদি কোন দলই লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এ যোগদান করিল না। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ইহুদি এবং আরব উভয় পক্ষেরই সমর্থন হারাইলে ইহুদি সন্ত্রাস-বাদিগণ প্যালেস্টাইনে কর্মরত ব্রিটিশ কর্মচারীদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ইহুদি-আরব সংঘর্ষের ফলে প্যালেস্টাইনে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ইহুদি-আরব সমস্যার কোন সমাধান করিতে অসমর্থ ব্রিটিশ সরকার ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর নিকট এবিষয়ে মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক নিযুক্ত এক বিশেষ কমিটি (Special Committee) প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়া ইহুদি-আরব সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন। এই কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিও ছিলেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদ-ই একমাত্র পন্থা বলিয়া জানাইলেন। ভারত ও অপর কয়েকটি দেশের সদস্যগণ—যাঁহারা সংখ্যালঘু ছিলেন—তাঁহাদের সুপারিশ ছিল প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদি অঞ্চলের একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন

(২) 'ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনের' সুপারিশ

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স-এর অসাফল্য

ইহুদি-আরব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

করা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর ইউনাইটেড ন্যাশনস্ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ ভিন্ন এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ইহুদি বা আরবদের কেহই এই সিদ্ধান্তানুসারে প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদে সম্মত ছিল না। অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখ হইতে প্যালেস্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর মাধ্যমে প্যালেস্টাইন সমস্যার মীমাংসার উপর খুঁজিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি বা জিওনিস্ট (**Zionist**) নেতৃবর্গ ইস্‌রায়েলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই রাষ্ট্রের সীমা ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির সুপারিশে যে রাজ্যাংশ ইহুদি অঞ্চলাধীন রাখিবার কথা বলা হইয়াছিল ঠিক সেই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ইস্‌রায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান উহাকে স্বীকৃতি দান করিলেন। ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অপরাপর রাষ্ট্র ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইলে প্যালেস্টাইন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। মধ্য-প্রাচ্যের রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের অনুগত মিত্র দেশ তুরস্ক ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইলে, ইরাণ প্রথমে ইহার ঘোর বিরোধী ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও অন্তত কার্যকরিভাবে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করিল।* আরব রাষ্ট্রবর্গ অবশ্য ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল না, উপরন্তু প্যালেস্টাইনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল। কিন্তু এই যুদ্ধে আরব রাষ্টবর্গ ক্রমেই পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে এই যুদ্ধের বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে (১৯৪৯) প্যালেস্টাইনের প্রায় তিন-

প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের সুপারিশ

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্যালেস্টাইন ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগের সংকল্প

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্যালেস্টাইন ত্যাগ (১৪ই মে, ১৯৪৮)— ইস্‌রায়েল-এর স্বাধীনতা ঘোষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান

Vide, Lenczowski :** ***The Middle East and the World Affairs, **345ff.**

চতুর্থাংশ ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। মধ্য এবং পূর্বাংশ এবং গাজা ভূখণ্ড (Gaza strip) আরবদের অধিকারে রহিল।

ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং উন্নয়নের পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স কর্তৃক প্যালেস্টাইনের ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায়ই গৃহীত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে ইস্‌রায়েলী নেতৃবৃন্দ ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে বিশাল পরিমাণ অর্থ সাহায্য দান করিয়া এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্‌রায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Point Four Agreement অনুযায়ী নানাপ্রকার সাহায্যদান করিয়া উহার উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ ইহুদি সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ইহুদি সন্ত্রাসবাদীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বহু ব্রিটিশ পরিবারকে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিতে হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্ ত্যাগও ইহুদি-ব্রিটিশ সম্পর্কের তিক্ততারই ফল বিশেষ। আরব ও ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য নেগো অঞ্চল আরবদের দিবার প্রস্তাব ব্রিটেন সমর্থন করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইস্‌রায়েল-এর ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটেনের ঔদাসীন্য প্রভৃতি ব্রিটেন-ইস্‌রায়েল সম্পর্কের তিক্ততার পরিচায়ক। কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন ইস্‌রায়েল কর্তৃক ইঙ্গ-ফরাসী সরকারকে সাহায্য দানের মধ্যে ইস্‌রায়েল-এর পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পুনরুজ্জীবিত অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইস্‌রায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ইস্‌রায়েল-ব্রিটিশ সম্পর্ক

রাশিয়ার নিকট ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ঋণ প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য হইবার পূর্বাবধি ইস্‌রায়েলের নিরপেক্ষ নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল বটে, কিন্তু ঋণলাভে অকৃতকার্য হইবার পর ইস্‌রায়েল-এর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রুশ-ইস্‌রায়েল সম্পর্ক

ইস্‌রায়েল ও আরব রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি (১৯৪৯) স্বাক্ষরিত হইলেও পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহুদি-আরব সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। পরস্পর

পরস্পরের রাষ্ট্রসীমা লঙ্ঘন বা রাষ্ট্রসীমায় হানা দেওয়া ইহুদি-আরব সম্পর্কের এক অপরিহার্য নীতিতে পরিণত হইয়াছে। আরব রাষ্ট্রবর্গ ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এযাবৎ স্বীকার করেন নাই। ফলে, ইহুদি-আরব দ্বন্দ্বের সাময়িক বিরতি ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে, এই দুই জাতির মধ্যে শান্তিস্থাপন সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়।

ইহুদি-আরব সমস্যা

তুরস্ক (Turkey) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে **lend-lease** নীতি অনুসারে বহু অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অর্থ নৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষ তাহাদের সাহার্য্যার্থে তুরস্ককে যুদ্ধে নামাইবার জন্য চাপ দিতে থাকিলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্ক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। **Lenczowski**-র মতে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ স্থানলাভের আশায় তুরস্ক শেষ মুহূর্তে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। যাহা হউক, তুরস্কের পররাষ্ট্র সম্পর্কের অন্যতম প্রধান নীতিই ছিল রুশ ভীতি এবং পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আনুগত্য। রাশিয়া কর্তৃক বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজ্‌-এর মধ্য দিয়া অবাধভাবে যাতায়াতের দাবি তুরস্কের ভয়ের কারণ ছিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ফ্রান্স তুরস্কের বিমানঘাঁটি হইতে রাশিয়ার বাকু অঞ্চলে বোমা নিক্ষেপের জন্য তুরস্কের অনুমতিলাভ করিয়াছিল এই তথ্য রাশিয়ার নিকট অবিদিত ছিল না। ফলে, রুশ-তুর্কী সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাশিয়ার প্রত্যক্ষ শত্রুতার আশঙ্কায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তুরস্ক সরকার বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজ্‌ জলপথ রাশিয়ার জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হইলেও রুশ-তুর্কী সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটিল না। ঐ বৎসরই রাশিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত রুশ-তুর্কী মৈত্রী চুক্তির পরিবর্তন দাবি করিল। এই পরিবর্তনের শর্তাদির মধ্যে রাশিয়া কার্‌স, আর্দাহান নামক স্থানদ্বয়, বোস্‌ফরাস ও দার্দানেলিজের সন্নিকটে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার, মণ্টরিও চুক্তি (**Montreux Convention**) পরিবর্তন, বুলগেরিয়ার সপক্ষে থ্রেসের রাজ্যসীমা পরিবর্তন দাবি করিল। কিন্তু তুরস্ক

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরক্ত তুরস্ক

রুশ-তুর্কী বিদ্বেষ

তুরস্কের উপর রুশ দাবি

রাশিয়ার চাপ সত্ত্বেও রুশ দাবিসমূহ মানিয়া লইতে রাজী হইল না। ফলে, রুশ-তুর্কী সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই তিক্ততা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। সেই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান তাঁহার 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন্' অনুসারে সোভিয়েত আক্রমণের ভীতি হইতে গ্রীস ও তুরস্ককে রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করিলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট তুরস্ক বোস্-ফরাস ও দার্দানেলিজ্ অঞ্চলে রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার স্বীকার করিতে রাজী নহে এই ঘোষণা করিল। রুশ-তুর্কী তিক্ততার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ-ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুরস্কের মিত্রতা বৃদ্ধি পাইল। তুরস্কের NATO, বাগদাদ চুক্তি তথা CENTO-তে যোগদান তুরস্ক ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মিত্রতার যেমন পরিচায়ক তেমনি রুশ-তুর্কী তিক্ততার নির্দেশক। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের প্রধান-মন্ত্রী মেণ্ডেরিস গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারে পরিণত করিতেছেন, এই কারণে সামরিক কর্মচারী কেমাল গুর্‌সেল তুরস্কে এক সামরিক বিপ্লব সংঘঠিত করেন। মেণ্ডেরিস ও তাঁহার সহকর্মীদের অনেককে কিছুকাল পূর্বে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তুরস্কের বর্তমান সরকার পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পূর্ব-অনুসৃত নীতির কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ব-নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধতা ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।

রুশ-তুর্কী সম্পর্কের অবনতি—রুশ আক্রমণের আশঙ্কা

'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন'

তুরস্কের NATO, CENTO প্রভৃতিতে যোগদান

তুরস্কের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

ইরাক (Iraq): ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জনের পর হইতে ইরাকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের উত্থান পরিলক্ষিত হয়। এই দুইয়ের একটি ব্রিটিশ সরকারের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী এবং অপরটি ছিল ব্রিটিশের সহিত মৈত্রীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দলাদলি যখন চলিতেছিল সেই সময়ে বেক্‌র সিদ্‌কি নামে ইরাকী সমর-অধিনায়ক বলপূর্বক ইয়াসিন-এল-হাসিমীর মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া বেক্‌র সিদ্‌কির সুহৃদ হিকমৎ সুলেমানকে প্রধানমন্ত্রি-পদে স্থাপন করিলেন (১৯৩৬)। বস্তুত, হিকমৎ সুলেমানের মন্ত্রিসভা বেক্‌র সিদ্‌কির সম্পূর্ণ নির্দেশাধীন ছিল।

ব্রিটিশ-বিরোধী ও ব্রিটিশ-সমর্থক পরস্পর-বিরোধী দল

বেক্‌র সিদ্‌কির সামরিক শক্তি প্রয়োগে শাসনক্ষমতা হস্তগতকরণ

কিন্তু শীঘ্রই বেক্‌র-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হইতে লাগিল। বেক্‌র ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন না বলিয়া ব্রিটিশ সরকার তাঁহার নির্দেশাধীন ইরাকী সরকারের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া ক্রমবর্ধমান জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার বেক্‌র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দান করিলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরই বেক্‌র আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিক্‌মৎ স্থলেমানের মন্ত্রিসভারও পতন ঘটিল। ইহার পর জামিল মাদফাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বেক্‌র-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী বলপূর্বক ইয়াসিন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া এবং হিক্‌মৎ স্থলেমানের মন্ত্রিসভার উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া স্বভাবতই ক্ষমতালোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী নেতার চেষ্টায় জামিল মাদফাই-এর স্থলে মুরি-এস্‌-সৈদ প্রধান-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। মুরি-এস্‌-সৈদ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অত্যধিক মিত্রভাবাপন্ন। এজন্য অপর একদল মুরি-এস্‌-সৈদকে পদ্যচুত করিবার চেষ্টা শুরু করিল। এমন সময় (১৯৩৯) ইরাকী রাজা গাজী এক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইলে ইরাকীদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইল। জার্মানি ও ইতালির ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যও অবশ্য এজন্য কতক পরিমাণে দায়ী ছিল। যাহা হউক, গাজীর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় ফৈসল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুরি-এস্‌-সৈদ প্রধানমন্ত্রিপদে আসীন রহিলেন। ঐ বৎসরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ব্রিটিশ ও ইরাকী সরকারের মিত্রতা চুক্তির শর্তানুসারে মুরি-এস্‌-সৈদ জার্মানির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। কিন্তু পরবৎসরই (১৯৪০) রসিদ আলি নামে জনৈক ব্রিটিশ-বিরোধী জননেতা ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে কতকটা নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে অক্ষ-শক্তিবর্গের হস্তে ব্রিটেনের পরাজয় ইরাকীদের মধ্যে অধিকতর ব্রিটিশ বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। কিন্তু ইরাকী রাজ-নীতিক্ষেত্রের চরম অব্যবস্থা এবং ইরাকীদের অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে রসিদ আলি পদচ্যুত হইলেন। কিন্তু তিনি সামরিক সহায়তায় পুনরায় বলপূর্বক প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রসিদ আলি ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে

হিক্‌মৎ স্থলেমানের প্রধানমন্ত্রিত্ব

ব্রিটিশের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন মুরি এস্‌-সৈদ-এর মন্ত্রিত্ব

গাজীর মৃত্যু—দ্বিতীয় ফৈসলের সিংহাসন লাভ

ইরাকবাসীদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ

স্বাক্ষরিত মৈত্রী-চুক্তির শর্তাদি মানিয়া চলিবেন, একথা বলা সত্ত্বেও ব্রিটেন রসিদ আলিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে সরাইতে দৃঢ়সংকল্প করিল। ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটেন একদল সৈন্য বস্‌রা নামক স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফা সৈন্য বস্‌রায় উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকী সৈন্য ও ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। রসিদ আলি বহু চেষ্টায়ও জার্মানির নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইলেন না, কারণ সেই সময়ে হিট্‌লার রাশিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাহা হউক, কয়েকখানি জার্মান যুদ্ধবিমান ইরাকের মসুল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সাময়িকভাবে মসুল জার্মানির অধিকারে চলিয়া গেল। কিন্তু ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্দান হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়া রসিদ আলির সেনাবাহিনীকে ফলুজার যুদ্ধে পরাজিত করিল। রসিদ আলি দেশ হইতে পলাইয়া গিয়া জার্মানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন জামিল মাদফাই হইলেন প্রধানমন্ত্রী। অল্পকালের মধ্যে নুরি-এস্‌-সৈদ জামিল মাদফাইর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তিনি এইবার ১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত রহিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পদত্যাগের পর ইরাকের প্রধান-মন্ত্রীর পদে পর পর কয়েকজন নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী তোফিক ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির পরিবর্তন করিয়া ব্রিটিশ প্রভাবের পূর্ণ অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। এদিকে বাগদাদে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাস হইতে কমিউনিজম্‌ প্রচারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইরাক সরকার এবিষয়ে অবহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে ইরাকের বিপদ আসিতে পারে উপলব্ধি করিয়া ব্রিটেনের সহিত নূতন মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৯৪৮)। এই চুক্তির শর্তানুসারে যুদ্ধকালে ব্রিটেন ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করিবার অধিকার লাভ করিল। ইরাকে ব্রিটিশ বিমানঘাঁটিগুলি ইরাক সরকারকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সেগুলিতে ব্রিটিশ বিমান অবতরণে কোন বাধা রহিল না। ব্রিটেন ইরাকের সেনা-বাহিনীকে সমর উপকরণে সজ্জিত করিবার ও আধুনিক যুদ্ধ শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদি সমস্যার সমাধানকল্পে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধা-ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এ গৃহীত হইলে ইরাকে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও মারা-

জার্মানির সাহায্য লাভ

ব্রিটেন-ইরাক যুদ্ধ

ইঙ্গ ইরাক চুক্তির অবসান দাবি

নূতন ইঙ্গ-ইরাক মিত্রতা চুক্তি

মারি শুরু হইল। এমতাবস্থায় ইরাক সরকার ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি (১৯৪৮) অনুমোদন করিতে সাহস পাইলেন না। এদিকে ইরাণে এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির জাতীয়করণের দৃষ্টান্ত ইরাকীদের মধ্যে **Iraq Petroleum Company**-র জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিল। ফলে, ইরাক সরকার **Iraq Petroleum Company**-কে নূতন শর্তে আবদ্ধ হইতে এবং ইরাককে আরও উচ্চহারে রাজস্বদানে বাধ্য করিলেন।

জনসাধারণ কর্তৃক চুক্তির বিরোধিতা

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইরাক রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছিল। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, কমিউনিস্ট্‌দের প্রচারকার্য ও অনুপ্রবেশ, ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের প্রতি বিরোধিতা সব কিছু ইরাকে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। এদিকে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব যাহাতে মধ্য-প্রাচ্যে বিস্তারলাভ না করিতে পারে সেজন্য 'বাগদাদ চুক্তি' (বর্তমান **Central Treaty Organisation** = **CENTO**) নামে এক আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠন করিল। ইরাক ইহার অন্যতম প্রধান সদস্য। ফলে, মার্কিন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও আর্থিক সাহায্য ইরাক পাইল।

কমিউনিস্ট্ ভীতি ও কমিউনিস্ট্ অনুপ্রবেশ

এই সময়কার ইরাক সরকারের নীতি ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিয়া কমিউনিস্ট্ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা লাভ করা এবং একমাত্র ব্রিটেনের সহিত জড়িত হইয়া থাকিবার নীতি পরিত্যাগ করা। মিশর পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি এবং বিশেষভাবে কোন সামরিক শক্তিজোটে যোগদান না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। ইরাককে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করান যায় কিনা সে বিষয়ে মিশর খুবই তৎপর ছিল, কিন্তু ইরাক এবিষয়ে অবিচলিত রহিল। আরব লীগের মাধ্যমে ইরাকের উপর চাপ দিয়াও কোন ফল হইল না। ইরাক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি অনুরক্ত তুরস্কের সহিত বিশেষভাবে মিত্রতায় আবদ্ধ হইল (১৯৫৫) এইভাবে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটেন এই চুক্তিতে যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রত্যক্ষ সদস্য না হইলেও সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে সাহায্য-সহায়তা দানে কার্পণ্য করে নাই।

বাগদাদ চুক্তি

ইংলণ্ড কর্তৃক বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের সামরিক কর্মচারিবৃন্দ ব্রিগেডিয়ার আব্দুল করিম কাসেমের নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিয়া ইরাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতি-

সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে অপসরণ করে (১৯৫৯, মার্চ)। এই পরিবর্তনের ফল হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে সামরিক সরঞ্জাম, অর্থ প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। এইভাবে কাসেমের নেতৃত্বে ইরাক পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য ইরাক ও ব্রিটেনের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আব্দুল কাসেম কর্তৃক সামরিক শক্তিবলে শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে আব্দুল কাসেমের বিরুদ্ধে এক সামরিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহে কাসেম নিহত হন। জেনারেল আরিফ হইলেন এই বিদ্রোহের নেতা। ইরাক অল্পকালের মধ্যেই UAR-এ যোগদানে সম্মত হয়।

সউদি আরব (Saudi Arab): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সউদি আরবের ইব্‌ন্ সউদ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গই জয়ী হইবে। তাঁহার মন্ত্রীদের অনেকেই অবশ্য অক্ষ-শক্তিবর্গ যুদ্ধে জয়লাভ করিবে এই ধারণা পোষণ করিতেন। যাহা হউক, নিরপেক্ষ থাকিলেও ইব্‌ন্ সউদি পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু থাকা অবস্থায়-ই মার্কিন-সউদি আরব সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিলে সউদি আরবের ইতিহাসে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। মার্কিন তৈল কোম্পানি সউদি আরবের খনিজ তৈল উত্তোলন কার্য যুদ্ধকালীন নানাপ্রকার অসুবিধা হেতু বাধাপ্রাপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধে যোগদান করে নাই। অক্ষশক্তিবর্গের প্রাথমিক সাফল্যে ব্রিটেন তখন এক দারুণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায়ও ইব্‌ন্ সউদ ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের কোনপ্রকার বিরোধিতা না করিয়া যুদ্ধ হেতু আর্থিক অবস্থার অবনতি এবং মার্কিন তৈল কোম্পানি হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস হেতু আর্থিক অনটন হইতে আত্মরক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের নিকট ৩০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ব্রিটেন ও আমেরিকা সউদি আরবকে অর্থ সাহায্য দান করিয়া আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Lend-Lease পরিকল্পনা অনুযায়ী সউদি আরবকে আরও অর্থ-সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিল। এইরূপ অর্থসাহায্য গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সউদি আরবের নিরপেক্ষতার নীতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল। সেই সময়ে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সুবিধার্থ মধ্য-প্রাচ্যে আরও একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। ইরাণের আবাদান নামক স্থানে একটি বিমানঘাঁটি ছিল বটে, কিন্তু মধ্য-প্রাচ্য ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক গোপনীয়তা সহকারে সউদি আরবের সঙ্গে ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার-সম্বলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বাহ্যত নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিলেও ইব্‌ন্ সউদ গোপনে ইঙ্গ-মার্কিন, বিশেষভাবে মার্কিন সরকারকে এইভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। দাহরান নামক স্থানে একটি প্রথম পর্যায়ের মার্কিন বিমানঘাঁটি নির্মিত হইল। সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মিত্রতা ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স হইতে ফিরিবার পথে গ্রেট বিটার লেক (Great Bitter Lake)-এ একটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে ইব্‌ন্ সউদের সহিত সৌহার্দ্যসূচক আলাপ-আলোচনা করিলেন। এই মিত্রতার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ইব্‌ন্ সউদ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অধিবেশনে সউদি আরবের প্রতিনিধি স্বভাবতই যথাযোগ্য আসন লাভ করিলেন।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমানঘাঁটি নির্মাণের অধিকার দান : গোপনে নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ

প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট ও ইব্‌ন্ সউদের সাক্ষাৎকার

সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রতা কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই প্রসারিত হইল। মার্কিন সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিয়া মধ্য-প্রাচ্যাঞ্চলে ইব্‌ন্ সউদকে নির্ভরশীল মিত্র হিসাবে লাভ করিলেন। কিন্তু ইহুদি-আরব সমস্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের পক্ষ অবলম্বন এই সৌহার্দ্য সাময়িককালের জন্য কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। ইহার ফলে সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্ক অবশ্য তেমন তিক্ত হয় নাই। যাহা হউক,

ইহুদি-আরব সমস্যা : সউদি আরব মার্কিন সম্পর্কের সাময়িক অবনতি

ইব্‌ন্‌ সউদের পুত্র আমীর সউদের যুক্তরাষ্ট্র সফর (১৯৪৬), মার্কিন কারিগরদের তৎপরতায় সউদি আরবের খনিজ তৈল উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৯৪৯-৫০), মার্কিন সাহায্যে সউদি আরবের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি ও সামরিক শিক্ষালাভ প্রভৃতি এই দুই দেশের সৌহার্দ্যের পরিচায়ক।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্‌ সউদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সউদ ইব্‌ন্‌ আব্দুল আজিজ সউদি আরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আমলে সউদি আরবের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান সূত্র হইল আরবের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা এবং আরব তথা ইস্‌লামীয় জগতে সউদি আরবের নেতৃত্ব স্থাপন করা। সউদের আমলে স্বভাবতই পররাষ্ট্র সম্পর্কের এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। সউদি আরব মিশরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল, সউদ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলেন এবং ইহুদি-আরব সমস্যায় আরবদের স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সর্বোপরি সউদের অধীনে সউদি আরব বাগদাদ চুক্তির অন্যতম প্রধান শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সউদ ইব্‌ন্‌ আব্দুল আজিজের সিংহাসনারোহণ

বুরাইমি মরু-উদ্যান ও মাস্কট-ওমান প্রভৃতি স্থানের অধিকার লইয়া সউদি আরব ও ব্রিটেনের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইল। ব্রিটেনের বাগদাদ চুক্তি সমর্থন, ইরাক ও জর্দানে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি ব্রিটেন ও সউদি আরবের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করিয়া তুলিল। সউদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও কতক পরিমাণে তিক্ততা দেখা দিল বটে, কিন্তু ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এইভাবে সউদের অধীনে সউদি আরবের পশ্চিমী-রাষ্ট্র-প্রীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া এক নিরপেক্ষ, স্বাধীন আরব জাতির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসৃত হইতেছে।

ব্রিটেনের সহিত মনোমালিন্য

নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র এবং আরব স্বার্থকামী পররাষ্ট্র-নীতি

ইয়েমেন (Yemen): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এক দশকের মধ্যে ইয়েমেনের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুইটি বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। অবশ্য এগুলির ফলে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা তেমন ব্যাপক ছিল না। রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা এই দুই বিদ্রোহের ফলে ক্ষমতাচ্যুত না হইলেও ইয়েমেনের জনসাধারণ যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফলে, রক্ষণশীল শাসকবর্গ কতক কতক উদারনৈতিক সংস্কার,

কারিগরি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়েমেনের পররাষ্ট্র সম্পর্কের প্রধান নীতিই হইল নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলা। ব্রিটেনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবও ইয়েমেনের পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম সূত্র। ইয়েমেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া উভয় দেশের সহিত মিত্রতামূলক সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা—ব্রিটেনের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব, মার্কিন ও সোভিয়েত দেশের সহিত সৌহার্দ্য

সিরিয়া ও লেবানন (Syria and Lebanon) : ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্য-গলের স্বাধীন ফরাসী সরকার (Free French Govt.) সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেও ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য এই দুই দেশে মোতায়েন রহিল। স্বাধীন রাষ্ট্রহিসাবে সিরিয়া ও লেবাননের স্বীকৃতিলাভে অবশ্য আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব হইল। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল। পরবৎসর সিরিয়া ও লেবানন আরব লীগে যোগদান করিল (২২শে মার্চ, ১৯৪৫)। ঐ বৎসরই ইয়াল্টা কনফারেন্স-এর সিদ্ধান্তানুসারে সিরিয়া ও লেবানন জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে উহার পুরস্কারস্বরূপই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সে এই দুই দেশের প্রতিনিধি যথাযোগ্য আসন লাভ করিলেন। এইভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হইলেও বিদেশী সৈন্যের অপসারণের সমস্যা সিরিয়া-লেবাননের এক দারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার ক্রমপর্যায়ে তাঁহাদের সৈন্য অপসারণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলে সিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন (১৯৪৬)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ সৈন্য অপসারণে রাজী হইলেন। ঐ বৎসরের-ই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন হইতে অপসারিত হইল। বস্তুত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতেই সিরিয়া ও লেবানন প্রকৃত সার্বভৌমত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিল বলা চলে।

ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যের অবস্থান সিরিয়া-লেবাননের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট অভিযোগ

ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য অপসারণ—সিরিয়া ও লেবাননের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব লাভ

লেবানন (Lebanon): লেবাননের পররাষ্ট্র সম্পর্কে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নীতি হইল পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ লেবাননের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সহায়ক হইয়াছে বলা বাহুল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সউদি আরব হইতে তৈলবাহী পাইপ লাইন লেবাননের সইদা বা সিদন পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছে। ফলে, লেবাননের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লেবাননের পরস্পর মিত্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের প্রতি লেবাননের বিদ্বেষভাব নানাবিধ আর্থিক লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি লেবাননের পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা নীতি মোটামুটিভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি লেবাননের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক না হইলেও রুশ-লেবানন কূটনৈতিক সম্পর্কে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। তথাপি লেবানন নীতিগতভাবে কমিউনিজম্-বিরোধী একথা কোরিয়ার যুদ্ধের কালে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর প্রস্তাবে উত্তর-কোরিয়াকে যে 'কমিউনিস্ট্‌পন্থী এবং আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, লেবানন কর্তৃক তাহার আন্তরিক সমর্থন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ—বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সৌহার্দ্য

ফ্রান্সের প্রতি বিদ্বেষ ভাব

সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরোধিতা

আরব জাতির ঐক্য ও নিরাপত্তার প্রতি লেবাননের আন্তরিকতা প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কিন সরকারের ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রের সমর্থন লেবাননে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত লেবাননে ইস্‌রায়েল রাষ্ট্রকে মানিয়া লইবার যে মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ডক্টর মালিকের ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের বেইরুট বক্তৃতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

আরব ঐক্য ও নিরাপত্তার আন্তরিক সমর্থন

মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে লেবানন আরব জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদী মনোভাব লেবাননকে নিজ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে নাই। আরব-লীগের সদস্য রাষ্ট্রবর্গের প্রত্যেকটিরই স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব

লেবানন ও মধ্য-প্রাচ্য

পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা-ই লেবাননের আরব দেশসমূহের সহিত সম্পর্কের অন্যতম মূলনীতি।

লেবাননের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ কোন-প্রকার রক্তক্ষয় না করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল।* লেবাননের নূতন শাসনব্যবস্থাও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি মিত্রতা-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। ইস্‌রায়েল-এর প্রতি লেবাননের বর্তমান সম্পর্ক মিত্রতাপূর্ণ না হইলেও প্রত্যক্ষ শত্রুতায় রূপান্তরিত হয় নাই। কিন্তু সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্‌রায়েলী আক্রমণ (১৯৫৫) লেবানন, সিরিয়া ও মিশরের মধ্যে এক সামরিক ঐক্য স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। বলা বাহুল্য বাগদাদ চুক্তির বিপক্ষে লেবানন সিরিয়া ও মিশরের সহিত সংযুক্ত হইল (১৯৫৫, ডিসেম্বর)।

লেবানন সিরিয়া-মিশর-এর মধ্যে সামরিক ঐক্য স্থাপন (১৯৫৫)

সিরিয়া (Syria): সিরিয়ার স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাস পুনঃপুনঃ সামরিক বিপ্লবের ইতিহাস মাত্র। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কর্ণেল হুসেন জাইম কোন রক্তপাত না করিয়াই এক বিপ্লব সংঘটিত করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই আগস্ট মাসের ১৪ই তারিখে কর্ণেল হিনাওই হুসেন জাইম প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পদচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় বিপ্লব সংঘটিত করেন। হিনাওই কর্ণেল জাইম-এর আমলে অনুসৃত মিশর ও সউদি আরবের প্রীতিপূর্ণ নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ইরাক ও জর্দানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে তৎপর হইলেন। তিনি বৃহত্তর সিরিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইরাক ও সিরিয়ার সংযুক্তির চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু ইরাকের সহিত মৈত্রী-নীতি এবং হিনাওইর বৃহত্তর সিরিয়া পরিকল্পনা অপরাপর সামরিক নেতৃবর্গ সমর্থন করিলেন না। ফলে ঐ বৎসরই (১৯৪৯) লেফ্‌টেন্যাণ্ট শিশকলি তৃতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করিলেন। প্রথম দুই বৎসর শিশকলি বেসামরিক শাসকবর্গকেই সিরিয়ার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিলেন বটে, কিন্তু ১৯৫১ হইতে ১৯৫৪ পর্যন্ত চারি বৎসর তিনি শাসনদায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া এক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু রাখিলেন। কিন্তু ১৯৫৪

পুনঃপুনঃ সামরিক বিপ্লব

শিশকলির স্বৈরাচারী শাসন

*"......Bloodless revolution has since become known as the *Inkilab* (overturn)." Lenczowski, p. 278.

খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কর্ণেল মুস্তাফা হামদুন বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শিশকলি দেশ ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ইহার পর সিরিয়ায় পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। কিন্তু এদিকে মধ্য-প্রাচ্যে বাগদাদ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে সিরিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কতক পরিমাণে জটিল হইয়া উঠিল। বাগদাদ-চুক্তির প্রথম দুইটি স্বাক্ষরকারী দেশ—তুরস্ক ও ইরাক মধ্য-প্রাচ্যের অপরাপর দেশকেও সেই চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু সিরিয়ার জনমত ইরাক, তুরস্ক বা এই দুই রাষ্ট্রের পশ্চিমী-মিত্র-শক্তিবর্গের কাহারো সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইতে রাজী হইল না। মিশর কর্তৃক আরব-লীগের সমর্থন ও সহায়তা সিরিয়ায় খুবই উৎসাহের সৃষ্টি করিল। সিরিয়ার পররাষ্ট্র সম্পর্কে বাগদাদ-চুক্তির বিরোধিতা এবং মিশরের নেতৃত্বের উপর আস্থা—এই দুই নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই নীতির প্রয়োগ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (২০শে) মিশরের সহিত সিরিয়ার পরস্পর-সামরিক সাহায্য-সহায়তা চুক্তি এবং ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে সউদি আরবের সহিত অর্থ নৈতিক চুক্তিতে দেখা যায়। ইরাকের সহিত মিত্রতা-নীতি অনুসরণের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও ইরাক অথবা তুরস্ককে শত্রুতে পরিণত করা সিরিয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইস্রায়েল কর্তৃক সিরিয়া আক্রমণ পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি সিরিয়াবাসীদের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল তাহা পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মিত্রশক্তি ইরাকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মিশর, সিরিয়া ও সউদি আরবের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ভিন্ন সিরিয়া **United Arab Republic**-এ যোগদান করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় এক সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে, সিরিয়া **United Arab Republic** হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সিরিয়ার উপর মিশরের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এই যুক্তিই ছিল এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃস্থাপিত

আরব-লীগের সমর্থন

মিশর-সিরিয়া-সউদি আরব সামরিক চুক্তি

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় পুনরায় এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটে এবং উহার ফলে নূতন সরকার গঠিত হইবার পর সেই সরকার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে (U.A.R.) যোগদান করিয়াছে।

এশিয়া : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (Asia : South-East Asia) : চীন (China) : ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং নেতা চিয়াং-কাইশেকের পরাজয় এবং চীনে সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা এশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই। ৬০ কোটি লোক-অধ্যুষিত এক বিশাল ভূখণ্ডের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সাম্যবাদের প্রচলন চীনদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসকে যেমন এক নূতন রূপ দান করিয়াছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও এক অভিনব জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

নূতন চীনের অভ্যুত্থান

চীনে কমিউনিস্ট্ দল জয়যুক্ত হইলে 'জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' বলিয়া নূতন সাম্যবাদী চীনের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর পিকিং হইতে ঘোষণা করা হইল। এদিকে জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং-কাইশেক পরাজিত হইয়া ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চীনের নূতন সরকার পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চাহিলে কয়েকটি দেশ উহাকে স্বীকৃতি দান করিল। প্রথমেই যে সকল দেশ কমিউনিস্ট্ চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ৩২টি রাষ্ট্র নূতন চীনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিয়া সেই দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং-কাইশেককে কমিউনিস্টদের সহিত অন্তর্যুদ্ধকালে প্রচুর সাহায্য দান করিয়াছিল। তাঁহার পরাজয় এবং ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণের পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতির কোন পরিবর্তন করে নাই। ফরমোজা প্রতিনিধিই কিছুকাল পূর্বাবধি চীনের প্রতিনিধি হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদে আসীন ছিলেন আর কমিউনিস্ট্ চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতায় দীর্ঘকাল ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ইদানীং চীনকে ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর সদস্যভুক্ত করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিয়াং-কাইশেকের চীন-ফরমোজার পক্ষ সমর্থন

* ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল দেশ কমিউনিস্ট্ চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়াছে : (১) অষ্ট্রিয়া, (২) আলবানিয়া, (৩) আরব রিপাব্লিক, (৪) উত্তর-কোরিয়া, (৫) কাম্বোডিয়া, (৬) চেকোস্লোভাকিয়া, (৭) সিংহল, (৮) ভারত, (৯) ইংলণ্ড, (১০) সোভিয়েত ইউনিয়ন, (১১) উত্তর-ভিয়েৎনাম (১২) যুগোস্লাভিয়া, (১৩) ইয়েমেন, (১৪) ইরাক, (১৫) ইরাণ, (১৬) ইস্রায়েল, (১৭) রুমানিয়া, (১৮) পোল্যাণ্ড, (১৯) সুইডেন, (২০) নরওয়ে, (২১) সুইট্জারল্যাণ্ড, (২২) বহির্মঙ্গোলিয়া, (২৩) ফিন্ল্যাণ্ড, (২৪) পূর্ব-জার্মানি, (২৫) নেদারল্যাণ্ড, (২৬) নেপাল, (২৭) ইন্দোনেশিয়া, (২৮) ব্রহ্মদেশ, (২৯) বুলগেরিয়া, (৩০) ডেনমার্ক, (৩১) আফগানিস্তান ও (৩২) মিশর।

কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র হইল এশিয়া মহাদেশে কমিউনিস্ট্ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে কমিউনিজম্ যাহাতে বিস্তার-লাভ করে সেই চেষ্টা করা। কমিউনিস্ট্ চীনের নেতৃবর্গের উক্তি হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, চীনের পররাষ্ট্র-নীতি বা পররাষ্ট্র সম্পর্ক মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্টালিনের সুযৌক্তিক নীতিগুলির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্র-নীতির অপর সূত্র ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। নূতন চীনের অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েক বৎসর পিকিং সরকার সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সৌহার্দ্যমূলক নীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আদর্শগত পার্থক্য মানিয়া লইয়া সহ-অবস্থানের (co-existence) মাধ্যমে এক সুদৃঢ় ঐক্য সাধনে প্রয়াসী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট্ চীনের জন্মের অব্যবহিত পরেই (নভেম্বর, ১৯৪৯) মাও-সে-তুং-এর কার্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চীন দেশে যেমন কমিউনিস্ট্ সাফল্য সম্ভব হইয়াছে অনুরূপ পন্থায় এশিয়ার যে-কোন দেশে কমিউনিস্ট্ শাসন স্থাপনের কার্যে চীন সাহায্যদানে প্রস্তুত এই ঘোষণা করা হইল। কিন্তু এই পন্থা অনুসরণ করিয়া চীন কমিউনিজমের তেমন প্রসার সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। একমাত্র ভিয়েৎনাম ছিল ইহার ব্যতিক্রম। এমতাবস্থায় সহ-অবস্থানের নীতির উপরই চীন অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকে। কিন্তু এই সহ-অবস্থানের নীতিও চীন অধিক কাল অনুসরণ করিয়া চলিতে সক্ষম হইল না।

কমিউনিস্ট্ চীনের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র

চীনের কমিউনিস্ট্ দলের সাফল্যের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাহা নূতন চীনের সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সৌহার্দ্যের উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চীন দেশ রাশিয়ার নির্দেশাধীন, এরূপ কেহ কেহ মনে করিলেও বস্তুত তাহা সত্য নহে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরস্পর সম্পর্কে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অন্তরালে বহির্মঙ্গোলিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার, পৃথিবীর সাম্যবাদী অর্থাৎ কমিউনিস্ট্ দেশসমূহের নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই দেশে প্রতিযোগিতাও যে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর

চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক

প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার ভাব সত্ত্বেও পরস্পর সাহায্য-সহায়তা ও মৈত্রী

সাহায্য-সহায়তা ও সৌহার্দ্যমূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর এই চুক্তি চালু থাকিবে। চীনের উন্নয়নের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়া নানাভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে চীন দেশ রাশিয়ার সহিত যুগ্মভাবে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর বিরোধিতা করিয়াছে। অনুরূপ, ইন্দো-চীনের কমিউনিস্ট্‌গণকে সাহায্যদান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চ্যাংচুন রেলপথ চীন দেশকে ফিরাইয়া দিয়াছে। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৯৫৫) রাশিয়া পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরাইয়া দিয়াছে। চীন-সোভিয়েত যুগ্ম প্রচেষ্টায় বহু যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠান চীনে স্থাপিত হইয়াছে। চীন দেশকে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যভুক্ত করিবার ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার চেষ্টার অন্ত নাই। পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠনের বিরোধিতার ব্যাপারেও চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবাদ, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের কালে চীন-সোভিয়েত পরামর্শ প্রভৃতি এই দুই দেশের সৌহার্দ্যেরই পরিচায়ক। সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার ভাব থাকিলেও একে অপরের সহিত অপরিহার্য মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ একথা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের প্রতি চীন-সোভিয়েতের বিরুদ্ধ ভাব

নূতন চীনের জন্মের অল্পকালের মধ্যে ব্রিটেন কর্তৃক চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ফলে চীন-ব্রিটেন সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে হংকং-এর অধিকার লইয়া এই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা যে নাই, তাহা বলা যায় না। ব্রিটিশ বাণিজ্য-স্বার্থের ব্যাপারেও চীন দেশের সহিষ্ণু-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন দেশের চরম বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কমিউনিস্ট্ ও কুয়ো-মিং-তাং অন্তর্যুদ্ধে কুয়ো-মিং-তাং দলকে বিশাল পরিমাণ অর্থ ও সামরিক উপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। ইহাতে কমিউনিস্ট্‌দের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্বেষভাব যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল তেমনি চীনের কমিউনিস্ট্ দলেরও মার্কিন-প্রীতির কোন অবকাশ ছিল না। স্বভাবতই চীনে কমিউনিস্ট্ পক্ষ জয়লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে স্বীকৃতি দান করিল না। উপরন্তু ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয়-গ্রহণকারী কুয়ো-মিং-তাং অর্থাৎ চিয়াং-কাইশেকের সরকারকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরিয়া চীন দেশের বৈধ সরকার বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন। চীনের

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে তিক্ততা

ইউনাইটেড ন্যাশন্স-এর সভ্যপদভুক্তির ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুকাল পূর্বাবধি বিরোধিতা করিয়া চলিতেছিল। এদিকে কমিউনিস্ট্ চীন অর্থাৎ চীনের জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র ফরমোজা, কুয়েময়, মাৎসু, টান-টান, এহ্ র-টান, টেশেন প্রভৃতি চীনা দ্বীপ-সমূহ অধিকার করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুয়ো-মিং-তাং চীন অর্থাৎ ফরমোজায় অবস্থিত চিয়াং-কাইশেকের সরকার টেশেন দ্বীপটি ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন। ফলে, এই স্থানটি কমিউনিস্ট্ চীনের সহিত সংযুক্ত হয়। অপরাপর দ্বীপ লইয়া চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নানাপ্রকার সামরিক হুম্‌কি প্রদর্শিত হইলেও এই সকল স্থান অধিকারের জন্য কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করা চীন এযাবৎ যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। অবশ্য কুয়েময় দ্বীপে চীন বোমা নিক্ষেপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ আইসেনহাওয়ার ও পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস্-এর সতর্কবাণী এজন্য কতকটা দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে চীনদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্কের যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে।

আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের প্রতি চীনের প্রাথমিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার—বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত যোগাযোগ ও মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলা চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়াও প্রয়োজন। এজন্য আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের সহিত চীনের মৈত্রীস্পৃহা ও মিত্রতাপূর্ণ আচরণ খুবই স্বাভাবিক এবং আনন্দের বিষয় বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ চু-এন্-লাই-এর ভারত সফরের পর ভারত-চীন মৈত্রী বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চু-এন্-লাই ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারত ও চীনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের সম্পর্ক পাঁচটি মূল নীতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া এক যুগ্ম বিবৃতি দান করেন।

চীন-ভারত সৌহার্দ্য

এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি নীতি হইল: পরস্পর পরস্পরের রাজ্যের অখণ্ডতা স্বীকার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অনাক্রমণ, পরস্পর পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান ও সমমর্যাদা প্রদর্শন ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Peaceful co-existence)। সেই সময়ে চীন-ভারত মৈত্রী 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' ধ্বনিতে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবৎসর (১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) বান্দুং নামক স্থানে আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের প্রধানমন্ত্রিগণ এক

পঞ্চশীল

কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইলেন। এই কন্‌ফারেন্সে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন্-লাই তাঁহার সৌহার্দ্যমূলক এবং শান্তিকামী বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনায় সমবেত প্রতিনিধিবর্গের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন। ইহার সুফল পরবর্তী দুই-এক বৎসরের মধ্যে আরও বহু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রকর্তৃক চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু ইহার কিছুকাল পর হইতেই চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসার-নীতি অনুসরণ করিতে শুরু করিলে বান্দুং কন্‌ফারেন্সে চীন দেশের প্রতি যে মিত্রতার মনোভাব আফ্রো-এশীয় দেশসমূহে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রবর্গের সহিত চীনের সীমা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ভারতের উত্তর-সীমা অতিক্রম করিয়া চীনের রাজ্যবিস্তার চীন-ভারত সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'পঞ্চশীল' স্বাক্ষরের কয়েক মাসের মধ্যে চীন গাহ্‌ড়বাল অঞ্চলে এবং ক্রমে ভারতের উত্তর সীমান্ত দেশে কয়েক সহস্র বর্গমাইল অধিকার করিয়াছে। অনুরূপ নেপাল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতির সহিতও সীমান্ত-সমস্যা দেখা দিয়াছে। চীন ও নেপালের চুক্তি (২১শে মার্চ, ১৯৬০) এবং চীন-ব্রহ্মদেশ চুক্তি (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৬০) এই দুই দেশের সহিত চীনের সীমান্ত-সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব হইয়াছে। ইদানীং পাকিস্তান ভারতকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সামরিক সাহায্য দানে নিরস্ত করিবার উপায় হিসাবে চীনের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া নিজস্ব কোন নীতি যে পাকিস্তানের নাই, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ভারত-বিদ্বেষই হইল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র। চীন কর্তৃক ভারতের সীমার অন্তর্দেশে স্থান অধিকার লইয়া এক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর-সীমা অতিক্রম করিয়া বহু সহস্র বর্গমাইল বলপূর্বক দখল করিবার ফলে চীনের ভারত-প্রীতি যে নিছক মুখের কথা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে চীন কর্তৃক ভারত-আক্রমণ পৃথিবীর শান্তিকামী দেশ মাত্রেরই ঘৃণা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। পরে চীনা সৈন্য স্বেচ্ছায় অপসরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু নূতনভাবে সীমান্তব্যাপী সমরসজ্জা ও সৈন্য মোতায়েন চীনের ভারত-আক্রমণের ইচ্ছারই প্রকাশ বলা যাইতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার সামরিক প্রস্তুতির দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। (বিশদ আলোচনা ভারতের পররাষ্ট্র-নীতিতে দ্রষ্টব্য)।

আফ্রো-এশীয় কন্‌ফারেন্স

চীনের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—প্রসার-নীতির অনুসরণ

সীমান্ত দ্বন্দ্ব

চীন-ভারত বিরোধ

কমিউনিস্ট্‌ চীনের প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই তিব্বত চীনের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া চীন দাবি করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই (২২শে মে, ১৯৫০) চীন তিব্বতের 'মুক্তি' সাধন করিতে দৃঢ়সংকল্প একথা ঘোষণা করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই (২৮শে অক্টোবর, ১৯৫০) চীনাসৈন্য তিব্বতের সীমা অতিক্রম করিয়া তিব্বত আক্রমণ করিলে ভারত স্বভাবতই ইহাতে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু চীন সরকার তিব্বতকে চীনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলিয়া দাবি করিলেন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত অথবা অপর কোন বহিঃরাষ্ট্রের কোন প্রতিবাদের অবকাশ নাই, একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল। দীর্ঘকাল পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের আইনগত আধিপত্য ছিল একথা স্বীকার করিলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে তিব্বত চীন হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া যায়। তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় চীনের কোনপ্রকার আধিপত্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বিদ্যমান ছিল না। যাহা হউক, চীনের আক্রমণের পর তিব্বতের দলাই লামা ও পঞ্চেন লামা বাধ্য হইয়া পিকিং সরকারের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৯৫১)। এই চুক্তি অনুসারে তিব্বত চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। পক্ষান্তরে পিকিং সরকার অর্থাৎ কমিউনিস্ট্‌ সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসনকে উন্নত করিয়া দেশের জনসাধারণকে পশ্চাদ্‌পদ কুসংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিবেন স্থির হইল। দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার ক্ষমতা বা অধিকার, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভৃতিতে পিকিং সরকার কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, একথাও স্থিরীকৃত হইল।

চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণ (১৯৫০)

চীন-তিব্বত চুক্তি (১৯৫১)

কিন্তু কমিউনিস্ট্‌ চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন তিব্বতের জনসাধারণ ক্রমেই চীনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। চীন সরকার বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া তিব্বতকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিলেন। তিব্বতের বিরুদ্ধে চীনের আক্রমণ (১৯৫০) এবং ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বলপ্রয়োগে বিদ্রোহ দমন পৃথিবীর স্বাধীনতা ও শান্তিকামী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রমাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু চীন

তিব্বতের অধিবাসীদের উপর চীনের কঠোর শাসন

তিব্বত-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া ঘোষণা করিলে শেষ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীন যখন তিব্বত আক্রমণ করিয়া দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চু-এন-লাই ভারত সফরে আসিলে জওহরলাল নেহরু তাঁহার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন উহার শর্তানুসারে ভারত তিব্বতের উপর চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। উপরন্তু তিব্বতে ভারত যে-সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিত সেগুলিও ত্যাগ করিল। এমতাবস্থায় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন যখন তিব্বতের বিদ্রোহ দমন করিয়া শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ-ভাবে হস্তগত করিল তখন কেবলমাত্র প্রতিবাদ করা ভিন্ন ভারতের আর কোন কিছুই করণীয় রহিল না।

তিব্বতের বিদ্রোহ

ভারত সরকারের ব্যর্থ প্রতিবাদ

তিব্বতের স্বাধীনতা বিলোপের ব্যাপারে নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করা হইয়াছে। তিব্বতের সপক্ষে এই যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার দলাই লামা ও পঞ্চেন লামার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহাতে তিব্বতকে চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই একথা প্রমাণিত হয় যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বাবধি তিব্বত প্রকৃত স্বাধীনতাই ভোগ করিতেছিল।

চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাসের আইনগত আলোচনা

আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌দের একটি কমিশন (International Commission of Jurists) তিব্বত সম্পর্কে আইনগত বিচার-বিবেচনার পর একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিব্বত-ঘটনা চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া ঘোষণার কোন আইনসিদ্ধ যুক্তি নাই। ইহা ভিন্ন, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন-তিব্বত চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিয়াও চীন সরকার নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছিলেন। তদুপরি এক বিরাট সংখ্যক তিব্বতীয়ের প্রাণনাশ করিয়া চীন সরকার মানবিকতা, নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবহার—এই তিনেরই অবমাননা করিয়াছিলেন।

'আন্তর্জাতিক আইন-বিদ্ কমিশন'-এর মন্তব্য

মানবিকতা, নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক ব্যবহারের অবমাননা

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীয় বিদ্রোহের পর দলাই লামা তিব্বত ত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রয় দানে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার বহু সংখ্যক তীব্বতীয় অনুচরকে উদ্‌বাস্তু শিবির নির্মাণ করিয়া আশ্রয় দান করেন। ইহার ফলে চীন-ভারত সম্পর্কের তিক্ততা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে চীন কাশ্মীরের লাদাক অঞ্চলে বহু স্থান অধিকার করিয়া লয়। সীমারেখা-সংক্রান্ত চীন-ভারত বিবাদের মীমাংসা এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। ('সাম্প্রতিক প্রসঙ্গসমূহ' শীর্ষক অধ্যায়ে চীন-ভারত সংঘর্ষের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

ভারত কর্তৃক দলাই লামাকে আশ্রয় দান—চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি

জাপান (Japan): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দীর্ঘ সাত বৎসর কাল মার্কিন সামরিক অধিকারে থাকিবার পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সামরিক ক্ষেত্রে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। জাপানকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিবার পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এশিয়া মহাদেশে একটি বিরুদ্ধবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারদ্বয়ের ঐক্য হেতু এশিয়া মহাদেশে সাম্যবাদের প্রসারের যে সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে সাম্যবাদ-বিরোধী একটি শক্তিকে দণ্ডায়মান করাই হইল মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে রাশিয়ার সীমাহীনভাবে শক্তিবৃদ্ধি এবং চীনের সাম্যবাদী সরকারের শক্তি-সঞ্চয় জাপানকে যুদ্ধ-নীতি তথা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হইবার নীতি পরিত্যাগ করিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রকাশ জাপানীদের প্রকাশ্য মার্কিন-বিরোধিতায় পরিলক্ষিত হইয়া উঠে। জাপান নিজ পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ক্রমেই নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের পুনরুজ্জীবনে মার্কিন আগ্রহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

নিরপেক্ষ নীতির দিকে জাপানের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ

ইন্দো-চীন (Indo-China): কোচিন-চীন, লাওস, কম্বোজ, আনাম,

টং-কিং—এই কয়েকটি অঞ্চল লইয়া ইন্দো-চীন গঠিত। ফরাসী প্রাধান্যাধীন এই অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান ইন্দো-চীন অধিকার করিয়া লইয়া এই অঞ্চলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সূত্রে আনাম-এর সম্রাট বাওদাই, কম্বোজের ও লাওসের রাজগণ নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'ভিয়েৎমিন লীগের' নেতা হো-চি-মিন টং-কিং-এর সাতটি প্রদেশ নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিলেন এবং তদুপরি জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে হানই নামক স্থানটিও অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে যুদ্ধাবসানের পর ফ্রান্স কম্বোজের ও লাওসের রাজগণের মধ্যে এক চুক্তি দ্বারা এই দুই দেশে দুইজন ফরাসী নিয়ামক স্থাপিত হইবে এবং কম্বোজ ও লাওসের রাজগণ তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবেন স্থির হইল। হানই-এর ভিয়েৎনাম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সহিতও ফ্রান্সের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো-চীন যুক্তরাষ্ট্রের (Indo-Chinese Federation) একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রকে বিবেচনা করা হইল। কোচিন-চীন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করিবে কিনা তাহা সেই দেশের জনসাধারণের গণভোটে স্থিরীকৃত হইবে, একথাও স্বীকৃত হইল। কিন্তু এই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্স কোচিন-চীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিলে কোচিন-চীনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ইহার পর হইতে ইন্দো-চীন, কম্বোজ, কোচিন-চীন, আনাম, লাওস প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। ফ্রান্স এই সকল দেশের প্রতিনিধিদের সহিত মীমাংসার জন্য একাধিক কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েৎনামবাসীরা টং-কিং ও আনামে অবস্থিত ফরাসী সেনানিবাস আক্রমণ করিলে এই অঞ্চলে এক যুদ্ধ শুরু হইল। ভিয়েৎনামের নেতা হো-চি-মিন একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার শর্তে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনে রাজী এই কথা ঘোষণা করিলেন (মার্চ ২৪, ১৯৪৭)। কিন্তু ভিয়েৎনাম অঞ্চল ফরাসী ইউনিয়নের

ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা ঘোষণা

ফরাসী অধিকার পুনঃস্বীকৃত

ইন্দো-চীন ফেডারেশন পরিকল্পনা

ভিয়েৎনাম কর্তৃক ফরাসী সেনানিবাস আক্রমণ—যুদ্ধ শুরু

অবিচ্ছেদ্য অংশ ফ্রান্স এই যুক্তিতে এই অঞ্চলে তাহার অধিকার রক্ষা করিয়া চলিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিল। হো-চি-মিন-এর কমিউনিস্ট্ মতবাদে বিশ্বাসও ফ্রান্সের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক, ভিয়েৎনাম সরকার কোচিন-চীন, আনাম, টং-কিং এই তিনটি ভিয়েৎনাম ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের এবং পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা ও অধিকারসহ ফ্রান্স পরিকল্পিত ইন্দো-চীন ফেডারেশন এবং ফরাসী ইউনিয়নের সদস্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর নিকট এক আবেদন করিলেন। এদিকে ফরাসী সরকার সম্রাট বাওদাইকে আনাম, কোচিন-চীন ও টং-কিং অঞ্চলের একটি সংযুক্ত 'ফরাসী ডোমিনিয়ন' (**French Dominion**)-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন (১৯৪৯, ৮ই মার্চ)। হো-চি-মিন ফরাসী সেনাবাহিনীর সহিত তখনও যুদ্ধ করিয়া চলিতেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করিলে চীন সরকার হো-চি-মিন-এর সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিলেন (৯ই জানুয়ারি, ১৯৫০)। রাশিয়া ও রুশ প্রভাবাধীন রাষ্ট্রবর্গও হো-চি-মিন-এর সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। পক্ষান্তরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ফরাসী ডোমিনিয়ন'-এর বাওদাই গঠিত শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইল। এইভাবে 'ঠাণ্ডা লড়াই' এই সকল অঞ্চলেও বিস্তৃত হইল।

হো-চি-মিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ

বাওদাই ফরাসী ডোমিনিয়ন-এর শাসক নিযুক্ত

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর এবং বিশাল পরিমাণ অর্থ ও ফরাসী সৈন্যক্ষয় করিয়াও যখন হো-চি-মিনকে পরাজিত করা সম্ভব হইল না, তখন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা কন্‌ফারেন্সে (**Geneva Conference**) এক চুক্তি দ্বারা এই অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ১৭° অক্ষরেখার উত্তরাংশ ভিয়েৎমিন সরকারের অধীনে এবং উহার দক্ষিণাংশ ভিয়েৎনাম সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল। লাওস ও কম্বোজকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লাওসে কমিউনিস্ট্ ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোট সাহায্যপুষ্ট দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিমী অর্থাৎ কমিউনিস্ট্ ও কমিউনিস্ট্-বিরোধী দলের 'ঠাণ্ডা লড়াই' এই অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছে।

ইন্দো-চীন ব্যবচ্ছেদ: ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের উৎপত্তি

লাওস অঞ্চলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' প্রসারিত

উত্তর বনাম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম (North vs. South Vietnam): ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১৭° অক্ষরেখা ধরিয়া দুই রাজ্যাংশে বিভক্ত হইয়া যাইবার পর হইতে এই অঞ্চলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম মার্কিন সাহায্যপুষ্ট এবং অপর দিকে উত্তর ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট্—বিশেষভাবে চীন কমিউনিস্ট্ সাহায্যপুষ্ট। ফলে, এই দুই অঞ্চলে ঠাণ্ডা লড়াই ক্রমেই প্রকাশ্য সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট্‌গণ 'দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তির জন্য জাতীয় বাহিনী' (National Front for the Liberation of South Vietnam) নামে এক বাহিনী গঠন করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দেরই শেষদিকে ২০ হাজার গেরিলা যোদ্ধা ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। এমতাবস্থায় মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করিবার জন্য কেনেডি সরকার স্বভাবতই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেইলর-এর নেতৃত্বাধীনে কেনেডি সরকার এক মিশন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রেরণ করিলেন। টেইলর মিশনের রিপোর্ট গোপন করিয়া রাখা হইলেও একথা প্রকাশ পাইল যে, টেইলর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দিয়েম (Diem)-এর সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সামরিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে মার্কিন সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: ঠাণ্ডা লড়াই

'দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌গণ কর্তৃক গেরিলা আক্রমণ শুরু, ১৯৬১

ম্যাক্সওয়েল টেইলর মিশন

টেইলর মিশনের সুপারিশ

টেইলর মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল হারকিন্স্ (General Harkins)-এর অধীনে এক মার্কিন বাহিনী গঠিত হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই উহার সংখ্যা ১৫,০০০ দাঁড়াইল। ক্রমেই এই বাহিনীও উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণের বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। ফলে মার্কিন সৈন্যও হতাহত হইতে লাগিল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিনবাহিনী গঠন

এদিকে প্রেসিডেণ্ট দিয়েম ও মার্কিনদের সম্পর্কে কতকটা তিক্ততা দেখা দিতে লাগিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌ওয়েল টেইলর যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আসেন

তখন তিনি দিয়েম-এর সঙ্গে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পত্রিকাসমূহ সরকারী কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এক সংবাদ প্রকাশ করিল যে, টেইলর দিয়েম সরকারকে দমননীতি ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইভাবে দিয়েম সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই কতক গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৌদ্ধদের সহিত দিয়েম সরকারের দারুণ গোলযোগ দেখা দিল। বৌদ্ধগণ রোমান ক্যাথলিক প্রভাবিত দিয়েম সরকার খ্রীষ্টানদের প্রতি অহেতুক উদারতা প্রদর্শক করিতেছেন এই অভিযোগ করিল। এই সূত্রে কয়েকজন বৌদ্ধ নিজ গায়ে পেট্রোল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া প্রকাশ্যে আত্মহত্যা করিলেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে দিয়েম সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি জাগ্রত হইল। সর্বত্র পত্রিকার মাধ্যমে এই সহানুভূতি দিয়েম সরকারের নিন্দাবাদে প্রকাশ পাইল। বৌদ্ধদের প্রতি অনুদার নীতি প্রভৃতির জন্য মার্কিনদের সহিত দিয়েম সরকারের সম্পর্ক আরও তিক্ত হইয়া পড়িল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম সরকারের বিরোধিতা

বৌদ্ধদের সহিত দিয়েম সরকারের বিরোধ

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও মার্কিন সরকারের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি

এইরূপ পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাক্‌নামারা ও জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেইলর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিয়েম সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ভিয়েৎনাম-মার্কিন তিক্ততা প্রশমিত হইল না। ম্যাক্‌নামারা ও টেইলর-এর রিপোর্ট পাইয়া মার্কিন সরকার দিয়েম সরকারকে সাহায্যদানের নীতি ত্যাগ করিলেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হইয়া জেনারেল ডুয়োং ভ্যান মিন্ (General Duong Van Minh) ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর দিয়েম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিলেন। সেই সময় দিয়েম ও নু'কে হত্যা করা হইল। এইভাবে মার্কিন সরকারের পছন্দসই লোক যাহাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা চলিল। এদিকে উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত মার্কিন সৈন্যগণ আরও গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িল। জেনারেল মিন্ অল্প কয়েক দিন পরই (৩০শে জানুয়ারি,

ম্যাক্‌নামারা-টেইলর মিশন

দিয়েম সরকারের পতন : দিয়েম ও নু'র প্রাণনাশ

জেনারেল মিন্-এর ক্ষমতালাভ

১৯৬৪) ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থলে জেনারেল মুয়েন কহ্‌ন (Nguyen Khanh) ক্ষমতায় আসীন হইলেন। কিন্তু তিনিও শাসনকার্য এবং উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত যুদ্ধ—এই উভয় দায়িত্ব পালনে তেমন তৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং ছাত্র-সম্প্রদায়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলনের চাপে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। পরে অবশ্য কতকগুলি শর্তাধীনভাবে তাঁহাকে সেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে হইল। এইভাবে যখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দেখা দিল সেই সুযোগে উত্তর ভিয়েৎনাম সৈন্য বা ভিয়েৎকং সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কতক স্থান অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইল। মার্কিন সরকার এমতাবস্থায়ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কারণ, ঔপনিবেশিকতার অবসান করা মার্কিন সরকারের আদর্শ, এই কথা মুখে আওড়াইয়া ঔপনিবেশিকতারই সমতুল্য কার্য করা মার্কিন সরকার সমীচীন মনে করিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতে থাকিলে উত্তর ভিয়েৎনামে চীনা সাহায্য এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। চীনের সুবিধা হইল এই যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকেই চীনা। যাহা হউক, যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক ঘাঁটির উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পৃথিবীর শান্তিকামী দেশসমূহ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিন সৈন্য অপসারণের প্রয়োজন একথা একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন শান্তি আলোচনা সাফল্যলাভ করিবে না একথা সকলেই বলিয়াছেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কমন্‌ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

জেনারেল মিন্ ক্ষমতাচ্যুত : জেনারেল কহ্‌ন-এর ক্ষমতালাভ

জেনারেল কহ্‌ন-এর অকর্মণ্যতা

উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক সাফল্য

উভয় পক্ষে তীব্র যুদ্ধ

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের শান্তি মিশন প্রেরণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি উত্তর ভিয়েৎনামের হাইপং ও হানয়-এর উপর বিমান আক্রমণ শুরু করে। ফলে, বহু সংখ্যক লোকের জীবনান্ত হইলে ভারতসহ সকল শান্তিকামী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান

দেশ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় না। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে Christmas উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট্ জনসন উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ এককভাবে স্থগিত রাখেন। উত্তর ভিয়েৎনামকে শান্তি স্থাপনের সুযোগ দানই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট্ হো-চি-মিন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওয়াইতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখান হইতে প্রেসিডেন্ট্ জনসন এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্শাল কাই ও প্রেসিডেন্ট্ নোগুয়েস উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণ প্রতিহত করিবার—অর্থাৎ উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট্ হো-চি-মিন্ তাহাতে ভীত না হইয়া মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন না, এই স্পষ্ট প্রত্যুত্তর দান করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ওমাহা নামক স্থানে প্রেসিডেন্ট্ জনসন উত্তর ভিয়েৎনামের অর্থাৎ ভিয়েৎকং-এর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মার্কিন উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির উপর নিজ মতামত চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবে বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকেন। অনুরূপ কোন অনিচ্ছুক দেশের বা জনগণের উপর বাহির হইতে কোন রাজনৈতিক মতবাদ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা সেই দেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহাতে নিশ্চয়ই বাধা দিবে। কিন্তু শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী এবং রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশ এই যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করিতেছে। চীন অবশ্য গোপনে উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্য দান করিতেছে। রাশিয়া উত্তর ভিয়েৎনামকে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে দিলে সেখান হইতে ব্যাপক যুদ্ধের সৃষ্টি হইতে পারে সেই আশংকা অনেকেই করিতেছেন। ভারত ও রাশিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিনী ফৌজ অপসারণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনপ্রকার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

সাময়িকভাবে বিমান আক্রমণ স্থগিত

হাওয়াই সম্মেলন

হো-চি-মিন্-এর দৃঢ়তা

মার্কিন যুক্তি

শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর শান্তির প্রয়াস

রাশিয়া ও ভারতের প্রস্তাব

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ দিকে (২৪, ২৫) ম্যানিলা শীর্ষ সম্মেলনে

প্রেসিডেন্ট্ জনসন, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট্ মারকস্, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট্ পার্ক চাং-হি, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট্ নোগুয়েন ভ্যান থিউ ও তথাকার প্রাধনমন্ত্রী কাই, থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থানম কিত্তিকাচরণ, নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কীথ্ হোলিওক, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হেরল্ড হল্ট্—অর্থাৎ আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড থাইল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সাতটি রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উপরি-উক্ত দেশসমূহ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে সামরিক সাহায্য তথা সেনাবাহিনী অপসারণ উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিবে। সুতরাং উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরতিতে রাজী না হইলে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসান ঘটার আশা খুবই ক্ষীণ। অথচ ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর শান্তির স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন।

ম্যানিলা শীর্ষ সম্মেলন (২৪শে, ২৫শে অক্টোবর ১৯৬৬)

ঘোষণা

ইতিমধ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরও জোরদার করিতে শুরু করে এবং হানয়-এ অবস্থিত তেলের ডিপোগুলির উপর বোমাবর্ষণ করে। ইহা ভিন্ন হাইপং বন্দরের উপরও আক্রমণ চালায়।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রসার

ওয়ারসো চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ যুদ্ধপ্রসার নীতির তীব্র নিন্দা করে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিন সেনাবাহিনী অপসারণের দাবি জানায়। ভিয়েৎনাম নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করুক এই ছিল ওয়ারসো চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের দাবির পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর অপরাপর দেশও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যাপসরণের দাবি জানাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ অবিরত চলিতে থাকে। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল উ-থাণ্ট্ ভিয়েৎনাম যুদ্ধাবসানকল্পে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনায় মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করা, উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সেনাবাহিনী প্রেরণ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সর্বপ্রকার সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রভৃতি একই সঙ্গে কার্যকর করিতে হইবে এবং

ওয়ারসো চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের নিন্দা

উ-থাণ্ট্ পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎনামের মধ্যে সরাসরি শান্তি স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিবার কথাও এই পরিকল্পনায় বলা হয়। এই দুই পক্ষে আলোচনা শুরু করিবার পর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎকং-এর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করা হইবে।

পরিকল্পনার শর্তাদি

আলোচনা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর ব্রিটেন, রাশিয়া, কানাডা, ভারত, পোল্যাণ্ড ও অপরাপর রাষ্ট্র তাহাতে যোগদান করিবে, চীনের যদি আলোচনায় যোগদানে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে চীনকেও আমন্ত্রণ জানাইবে। এইভাবে শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইলে পর জেনিভা কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়া যুদ্ধরত সকল পক্ষকে একটি শান্তি-চুক্তি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহাই ভিয়েৎনাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু উ-থাণ্ট পরিকল্পনা বা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসানের জন্য চেষ্টা কোন কিছুই ভিয়েৎনামের যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অবসানের চেষ্টা ব্যর্থ

অল্পকাল পূর্বে হানয় ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মার্কিন বোমা-বর্ষণ উ-থাণ্ট্ এবং অপরাপর শান্তিকামী সকলের তীব্র নিন্দা অর্জন করিয়াছে। এই যুদ্ধ যে-কোন সময় ব্যাপক যুদ্ধে রূপান্তরিত হইতে পারিত, বলা বাহুল্য। চীন, রাশিয়া প্রভৃতি উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থক। ফলে, ভিয়েৎনাম পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রবর্গের এক বিরোধের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যাপকতর যুদ্ধের আশংকা

এদিকে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নূতন সংবিধান অনুসারে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল থিউ চারি বৎসরের জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কর্ণধার নির্বাচিত হন। জেনারেল থিউ হানয় সরকার অর্থাৎ উত্তর ভিয়েৎনাম রাজী হইলে শান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনায় বসিতে রাজী আছেন ঘোষণা করেন এবং সেজন্য প্রয়োজনবোধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শান্তি-স্পৃহার প্রমাণস্বরূপ এক সপ্তাহকাল উত্তর ভিয়েৎনামের উপর কোনপ্রকার বোমা বর্ষণ করিবেন না এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত আছেন, একথা ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি স্থাপনের কোন আলোচনা শুরু করা সম্ভব হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট্ ইতিমধ্যে দুই-একবার শান্তির কথা বলিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতিও চালাইয়া যাইতেছিলেন। ভারত ও অপরাপর শান্তিকামী রাষ্ট্র শান্তি স্থাপনের প্রধান শর্ত এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মার্কিন সৈন্যের উত্তর ভিয়েৎনামের বোমাবর্ষণ ও মার্কিন সৈন্যের দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে

শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ

অপসারণ দাবি করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। উপরন্তু জনসন সরকার ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে অধিক পরিমাণ অর্থ ভিয়েৎ-নাম যুদ্ধের সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করেন এবং অধিকতর সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে (১৯৬৭) সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের মধ্যে জনসনের সহিত অনেকের মতানৈক্য ঘটিতেছে।

প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের ঘোষণা

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রেসিডেণ্ট্ জনসন ঘোষণা করেন যে, তিনি আসন্ন নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট্ পদপ্রার্থী হইবেন না। ইহার মূল কারণ হইল এই যে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিন নীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ চলা অবস্থায় নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন, কারণ এই যুদ্ধের পশ্চাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেরই সমর্থন নাই।

ভিয়েৎনাম শান্তি আলোচনা

এই ঘোষণার অব্যবহিত পরই ভারত উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। উভয় পক্ষেই শান্তি স্থাপনের আগ্রহ থাকায় কোথায় শান্তির আলোচনা শুরু হইবে সেবিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়। এক সময় দিল্লীতে এই আলোচনা শুরু হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত হানয় সরকার অর্থাৎ উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হইলে প্যারিস নগরীতে এই শান্তি সম্মেলন বসিবে স্থির হয়। উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের পক্ষে মিঃ কুয়ান থুই (**Mr. Kuan Thuy**) এবং মার্কিন সরকারের পক্ষে মিঃ এ্যাভারেল হ্যারিমান (**Mr. Averell Harriman**) দুই পক্ষের নেতা হিসাবে প্যারিসে উপস্থিত হইলে

প্যারিসে বৈঠক

১০ই মে, ১৯৬৮, শান্তির প্রাথমিক আলোচনা শুরু হইবে স্থির হয়। এদিকে ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই। উভয় পক্ষেই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৫ই মে, ১৯৬৮ শান্তির আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনা কালে দুই পক্ষের পরস্পর পরস্পরের এলাকায় বোমাবর্ষণ প্রভৃতি বন্ধ রাখিবার নানাপ্রকার প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা কোন পক্ষই গ্রহণে সম্মত হয় না। এদিকে প্যারিস শহরে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু হয়। কিন্তু শান্তির আলোচনা এই অবস্থায়ও চলিতে থাকে। শান্তির আলোচনা অবশ্য অগ্রসর হইতে পারে নাই উপরন্তু দুই পক্ষই পরস্পর

পরস্পরকে দোষী করিয়া বিবৃতি দেয়। এইভাবে শান্তি আলোচনায় এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হানয় বর্তমানে (জুন, ১৯৬৮) শান্তি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে ভিয়েৎনামে যুদ্ধের প্রাবল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছে। দীর্ঘকাল পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হানয় ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসানকল্পে প্যারিস শহরে সমবেত হইয়াছে ইহাই সুলক্ষণ, বলা বাহুল্য।

প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত শান্তি-আলোচনা প্রথম ছয় মাস কোনভাবেই অগ্রসর হইল না। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক গোপন চুক্তি দ্বারা ভিয়েৎনাম এবং অপরাপর যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ কতকটা হ্রাস পাইল। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে উত্তর ভিয়েৎনামের এক বিরাট সংখ্যক যুদ্ধরত সৈন্যকে অপসারণ করা হইল। প্যারিস শান্তি আলোচনায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন এই শর্তও উত্তর ভিয়েৎনাম মানিয়া লইল, পক্ষান্তরে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট্ (National Liberation Front)-এর প্রতিনিধিও ঐ আলোচনায় যোগদান করিবেন, স্থির হইল। এই প্রস্তুতিপর্ব শেষ হইলে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৮, প্রেসিডেন্ট্ জনসন উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমা নিক্ষেপ বন্ধের আদেশ দিলেন। সমুদ্র হইতে যুদ্ধ-জাহাজ উত্তর ভিয়েৎনামের উপর যে গোলাবর্ষণ করিতেছিল তাহাও বন্ধ করা হইল।

প্রাথমিক মতানৈক্যের অবসান

ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট্ প্যারিস আলোচনায় মিসেস নুয়েন থিই বিন্‌কে (Nguyen Thei Binh) প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিল। অবশ্য ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের পূর্বে এই পরিবর্ধিত আকারের আলোচনা সভার কাজ শুরু হইল না। ঐ তারিখে যখন শান্তি আলোচনা শুরু হইল তখন মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হেন্‌রি ক্যাবট লজ প্রস্তাব করিলেন যে, (১) উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে যাবতীয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য অপসারণ করা হউক, অনুরূপ দক্ষিণ ভিয়েৎ-নাম হইতে যাবতীয় উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য অপসারণ করা হউক। (২) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি সামরিক-নিরপেক্ষ অঞ্চল গঠন করা হউক। শান্তি আলোচনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার

নুয়েন থিই বিন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট্-এর প্রতিনিধি

মার্কিন প্রতিনিধি ক্যাবট লজের প্রস্তাব

বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন এই কথা হেন্‌রি ক্যাবট লজ উল্লেখ করিলেন।

উত্তর ভিয়েৎনাম ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধিবর্গ অবশ্য প্রস্তাব করিলেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিবাদ রহিয়াছে উহার সমাধান সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন এবং সেই-জন্য সাইগনে যে সরকার তখন ক্ষমতায় আসীন উহার পরিবর্তে 'শান্তি-সরকার' (Peace Cabinet) গঠন করা প্রয়োজন। এই নূতন সরকারই শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ

১৯৬৯, জুন মাসে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের নিকট মোট চারিটি শান্তিপ্রস্তাব পেশ করা হইল। একটি মার্কিন প্রতিনিধি কর্তৃক, অপর তিনটি উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পক্ষে। যে প্রশ্নে শান্তি আলোচনায় এখনও কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই উহা হইল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক একত্রী-করণ। নির্বাচনের মাধ্যমে কিভাবে এই দুই দেশকে একই সরকারের অধীনে স্থাপন করা সম্ভব হইবে সেই প্রশ্ন প্যারিস সম্মেলনের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট্ হো-চি-মিন পরলোকগমন করিয়াছেন। [পরবর্তী ঘটনাসমূহ সাম্প্রতিক প্রসঙ্গসমূহ শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

বর্তমান সমস্যা

ইন্দোনেশিয়া (Indonesia): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইন্দোনেশিয়ায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ শাসন হইতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের মধ্যে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী-অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইলেও জাতীয় ঐক্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। বিভিন্ন দলের পরস্পর প্রতিযোগিতা ও অসহিষ্ণুতার মনোবৃত্তি দেশের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অবস্থার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই প্রেসিডেন্ট্ সুকর্ণ (১৯৫৯) ইন্দোনেশীয় সংবিধান নাকচ করিয়া 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' (Guided Democracy)-এর প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই সময়ে ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল।

স্বাধীনতালাভ

প্রেসিডেন্ট্ সুকর্ণ কর্তৃক 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' প্রবর্তন

কিন্তু মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কাল হইতে (১৯৬৩) ফিলিপাইনস্ বিশেষভাবে ইন্দোনেশিয়া উহার শত্রুতা সাধন করিতে শুরু করে। ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইন্দোনেশীয় গেরিলা বাহিনী ও প্যারাসুট বাহিনী মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট্ চীন-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করিবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনে চীনা কমিউনিস্ট্‌গণ সিঙ্গাপুরের মালয়জাতির লোকেদের সহিত হাঙ্গামা শুরু করিলে পরিস্থিতি অত্যধিক জটিল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়ার টুঙ্কু আব্দুল রহমান ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর নিকট অভিযোগ করেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়াকে বহিরাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ যাহাতে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত না হইতে পারে এবং প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইলেও যাহাতে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক পদানত হইতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার চারিখানা যুদ্ধ জাহাজ ও উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে রাশিয়া প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল। কমিউনিস্ট্ চীন ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ লইয়া সেই অঞ্চলে কমিউনিস্ট্ চীনের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইল। এইভাবে মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া ক্রমেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবর্তে পড়িতে লাগিল। টুঙ্কু আব্দুল রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে সিকিউরিটি কাউন্সিল যখন ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে গেলেন তখন রাশিয়া ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া উহা নাকচ করিয়া দিল।

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক মালয়েশিয়ার বিরোধিতা

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক মালয়েশিয়া আক্রমণ

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা: রাশিয়া কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন

কমিউনিস্ট্ চীনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের প্রতিবাদের ব্যর্থ চেষ্টা

সিকিউরিটি কাউন্সিল ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছিল এজন্য প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইলে, তিনি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ করিলেন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ বহির্ভূত চীন ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ

সুকর্ণের ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদ ত্যাগ

আন্তরিকভাবে সমর্থন করিল। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট্ চীনের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ ইহাতে আরও সহজ হইল।

শুধু তাহাই নহে, সুকর্ণ চীনের সাহায্যপুষ্ট হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনি একটি দ্বিতীয় ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ স্থাপন করিবেন।

প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণের ব্যর্থতা

প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণের ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ হইতে অপসরণ এবং মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পাক-চীন-ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক আলজিয়ার্সে সুকর্ণ-আয়ুব-চু-এন-লাই নেতৃত্বাধীনে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহকে আনয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে সুকর্ণ মালয়েশিয়ার প্রতি পূর্বেকার বিধ্বংসী নীতি কতকটা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার

উন্‌টাং-এর সামরিক অভ্যুত্থান (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও খুবই দ্রুত ঘটিতে লাগিল। কয়েক মাসের মধ্যেই (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫) সমর অধিনায়ক উন্‌টাং এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করেন। এই সামরিক অভ্যুত্থানের পশ্চাতে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিওর গোপন সমর্থন ছিল। উন্‌টাং প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণকে

সুহার্তোর প্রতি-বিপ্লব (Counter Coup)

বন্দী করিয়া ক্ষমতায় আসীন হইবার তিন দিন অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমরনেতা সুহার্তো এক সামরিক প্রতি-বিপ্লব (Counter Coup) সংঘটিত করেন। উন্‌টাং-এর সামরিক অভ্যুত্থান

কনিউনিস্ট্ দমন

ছিল চীনের কমিউনিস্ট্ প্রভাবিত। কিন্তু সুহার্তো উন্‌টাং-এর সামরিক অভ্যুত্থান শুধু কঠোর হস্তে দমনই করিলেন, এমন নহে, কমিউনিস্ট্ প্রভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি চীনপন্থী তথা কমিউনিস্ট্‌গণকে কঠোর হস্তে দমন করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, সুহার্তো ইন্দোনেশীয়

সুকর্ণের প্রেসিডেণ্ট্‌পদের মেয়াদ হ্রাস

সংবিধানেরও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিলেন। পূর্বে সুকর্ণকে যাবজ্জীবন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট্ নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু সুহার্তো প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণকে দুই বৎসরের জন্য ঐ পদে বহাল রাখা হইবে, এই ঘোষণা করিলেন (জুলাই, ১৯৬৬)। প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেও, ইহার বিরোধিতা করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সুকর্ণের ক্ষমতা কতকটা আলংকারিক রূপ ধারণ করিল। প্রকৃত ক্ষমতা সমর-অধিনায়ক সুহার্তোর হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল।

এদিকে উন্টাং-এর সামরিক অভ্যুত্থানের পশ্চাতে গোপন সমর্থনের জন্য ভূত-পূর্ব-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিওর বিচার হয় এবং বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (অক্টোবর, ১৯৬৬)। অবশ্য তাঁহাকে এক মাসের মধ্যে প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রাণভিক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

সুবান্দ্রিওর বিচার

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ইন্দোনেশীয় কংগ্রেস জেনারেল সুহার্তোকে প্রেসিডেণ্ট্-পদে নিযুক্ত করে এবং প্রেসিডেণ্ট্ হিসাবে সুকর্ণকে পূর্বে যে-সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দেয়। এই সময় সুকর্ণ তাঁহার গ্রীষ্মকালীন নিবাস বগোর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। মার্চ মাসের শেষে তিনি জাকার্তায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত।

ইন্দোনেশিয়া পূর্বে যে-সকল রাষ্ট্রের সহিত শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল সুহার্তোর পরিচালনাধীনে সেগুলির সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতালাভে ভারতের সাহায্যের কথা বিস্মৃত হইয়া ভারতের সহিত শত্রুতা শুরু করিয়াছিলেন। এমন কি, ইন্দো-পাক যুদ্ধের কালে তিনি পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুহার্তো এই নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতের সহিত মিত্রতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। তিনি ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর সদস্যপদভুক্ত করিতে মনঃস্থির করিয়াছেন। ভারত-ইন্দোনেশিয়া সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও শুরু হইয়াছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কমিউনিস্ট্দের, বিশেষভাবে চীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত কমিউনিস্ট্দের প্রভাব ইন্দোনেশিয়ায় সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণের চেষ্টা চলিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক ভারত ও অপরাপর দেশের সহিত মিত্রতা-নীতির অনুসরণ

ইন্দোনেশিয়ার ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর সদস্যপদভুক্তির ইচ্ছা

অপর দিকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বহু কমিউনিস্ট্ মতাবলম্বীকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অনেককে কয়েদ করা হইয়াছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট্গণ প্রথমে সুদিশমান ও তাঁহার পর ওলোয়ান হুটাপিয়ার নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় "কমিউনিস্ট্ সরকার" নামকরণ করিয়া কমিউনিস্ট্গণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ

করিতে সচেষ্ট হইল। তাহারা চীনের অনুসরণে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ভূমি-বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। এই ব্যবস্থায় কৃষক ও মজুরদের নেতৃত্ব স্থাপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য। গোপন ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট্‌গণ সরকারী সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন দলগুলির উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাইতে লাগিল। মধ্য ও পূর্ব-জাভা, পশ্চিম-বোর্ণিও অঞ্চলে এই ধরনের সংঘর্ষ কতকটা ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৬৭-৬৮ –এক বৎসরব্যাপী এই ধরনের সংঘাত চলিতে থাকে। ফলে ব্যাপক ধরপাকড় ও সরকার পক্ষ হইতে গুলি বিনিময় চলে। কতক কতক সামরিক কর্মচারীকেও গোপনে কমিউনিস্ট্‌গণকে সমর্থন করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ইহাদের অনেকেরই প্রাণদণ্ড হয়। ইহা ভিন্ন সুকর্ণের সমর্থক বহু অ-কমিউনিস্ট্‌কে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীও ছিলেন। জেনারেল সুহার্তো এবং কতিপয় পদস্থ সরকারী কর্মচারীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।

সুহার্তো কর্তৃক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আনয়ন

আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল সুহার্তো বিদেশী মূলধনীদের ইন্দোনেশিয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে অবাধে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেগুলি সুহার্তোর পূর্ববর্তী কালে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল সেগুলি সবই ফেরৎ দেওয়া হইল। ফরাসী সরকারের সহযোগিতায় জাকার্তার ৮০ মাইল দক্ষিণে জাতিলুহুর (Djatiluhur) বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। মালয়েশিয়া এবং অপরাপর দেশের সহিত অর্থনৈতিক আদান-প্রদান শুরু করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি প্রেসিডেন্ট্‌ নিক্সন কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে সুহার্তোর সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিতে পারা যায়। এই আলোচনায় চীনের কমিউনিস্ট্‌ সম্প্রসারণ নীতি প্রাধান্য পায় (১৯৬৯, আগস্ট)।

আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন

পাকিস্তান (Pakistan): স্বাধীনতালাভের (১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট) পর হইতে দীর্ঘ এক দশক ধরিয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পাকিস্তান স্বতন্ত্র কোন পররাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের নীতি

স্থির করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত দেশ হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিদ্বেষভাব প্রথম হইতেই ছিল। আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে ভারতের দিক হইতে আক্রমণের ধুয়া তুলিয়া দেশের জনসাধারণকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার দিকে মনোযোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা ভিন্ন এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পাকিস্তান বহির্দেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনার সুযোগও সৃষ্টি করিয়াছে। কাশ্মীর-গ্রাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পাকিস্তান ভারতকে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে সর্বদাই সচেষ্ট। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ভারত কর্তৃক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণে রাজী না হওয়ার ফলে ভারত সরকার প্রতিশ্রুত গণভোট গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ পান নাই। কিন্তু ভারত কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভার উপর কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলে সেই সভা সর্বসম্মতিক্রমে ভারতভুক্তি অনুমোদন করে। ইহাতে গণভোটের প্রতিশ্রুতি পালন করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতা লাভ—স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতির অভাব

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ

কাশ্মীর সমস্যা

এদিকে পাকিস্তান কমিউনিস্ট্-বিরোধী দেশ হিসাবে ক্রমেই পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির কথা মুখে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্যলাভে কোন অসুবিধা যেমন ঘটে নাই, তেমনি প্রয়োজন-বোধে ভারতের বিরুদ্ধে সেই সকল সামরিক উপকরণ ব্যবহার করিবারও কোন অসুবিধা হয় নাই। এই সকল যুক্তিতে পাকিস্তান SEATO, CENTO (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতি এশিয়ায় পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক সংগঠিত সামরিক শক্তিজোটে যোগদান করিয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাক-মার্কিন পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য লাভ করিবে, স্থির হইয়াছে। এইভাবে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত মিত্রশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তান কর্তৃক ক্রমবর্ধমান হারে মার্কিন সামরিক সাহায্য লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ

মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য :

SEATO, CENTO প্রভৃতিতে যোগদান

পাক-ভারত সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি

নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ভারতের নিরাপত্তার সমস্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি পাক-ভারত সম্পর্কেও তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে যখন তখন পাক-নেতৃবর্গের উত্তেজনাপূর্ণ আস্ফালন এই তিক্ততা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের নীতি জেনারেল আয়ুব খাঁ কর্তৃক ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণের পরও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। রাশিয়ার নিকট হইতে কোন কোন ব্যাপারে কারিগরি সাহায্য গ্রহণ, সংযুক্ত-আরব রিপাব্লিকের সহিত সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার, চীনের সহিত সীমান্ত-সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-সম্পর্কের পরিবর্তনের পরিচায়ক হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে পাকিস্তানের মানসিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না।

রাশিয়া, সংযুক্ত-আরব, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস

বস্তুত পররাষ্ট্র-সম্পর্কের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পাকিস্তানের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে কোন কোন সময়ে পাকিস্তান পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের নিকট হইতে নিজ আনুগত্যের অনুপাতে সাহায্যলাভ করিতেছে না এই অভিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পন্থা অনুসরণ করিয়া পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অধিকতর সাহায্যলাভই হইল পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য। কেনেডির প্রেসিডেন্ট্-পদ লাভের পর জেনারেল আয়ুব খাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালের উক্তি এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। আফগানিস্তানের সহিত পাখতুনীস্তান গঠন সম্পর্কে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শেষ পরিণতি হিসাবে এই দুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৬১) ছিন্ন হইয়াছে। পাকিস্তানের পশ্চিমী সামরিক শক্তিজোটের সহিত যোগদানের ফলে 'ঠাণ্ডা লড়াই' ভারত উপ-মহাদেশেও প্রসারিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-প্রীতি পাকিস্তানের বিদ্বেষ ও ঈর্ষার কারণ

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিরোধ

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্ঘন করিয়া হানাদার প্রেরণ করিলে ভারত সরকার হানাদারদের কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উরি, টিথোওয়াল ও কারগিল অঞ্চলে পাকিস্তান অধিকৃত ঘাঁটি দখল করিতে বাধ্য হইয়াছে। [ইন্দো-পাক নীতি অন্যত্র দ্রষ্টব্য]।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই ভারতের গণপরিষদে জাতীয় পতাকা গ্রহণ-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু ভারত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র কি হইবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করেন। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, নবলব্ধ স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে ভারত যেন কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পোষণ না করে। কারণ, তাহা ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ-বিরোধী। তিনি স্পষ্টভাবে এই কথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কোন রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিতে রাজী হইবে না। ভারত নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা যথাসম্ভব শান্তির সহায়করূপেই বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা হইতে ভারত দূরে থাকিবে; রাজনৈতিক সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে উহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হইতে পারে, তথাপি ভারত এবিষয়ে যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই (২৩শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল) ভারতে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে আরব, মিশর, চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি মোট ২২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলন, ঔপনিবেশিক সমস্যা, অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমষ্টিগত উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে এই সম্মেলনে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির মৌলিক ঐক্য এবং পৃথিবীর অবিভাজ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা-প্রদর্শন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন।

এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া লাভ-লোকসানের খতিয়ানে ক্ষতিগ্রস্ত-ই হয়ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে নৈতিকতায় বিশ্বাসী দেশ ও জাতি মাত্রেই ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের

সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আকস্মিকভাবে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করে এবং তথাকার প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী হাতাকে গ্রেপ্তার করে। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু নূতন দিল্লীতে এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন হল্যাণ্ড কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত এইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নেতৃত্ব ভারত অপরাপর দেশের উপর চাপাইতে চাহে নাই বা চাহিতেছে না, তথাপি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে নেহরুর প্রতি যে আস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই ভারতের উপর এই নেতৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধি-বর্গের প্রতিবাদ ও জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা হল্যাণ্ড স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতের মৈত্রী ক্রমেই দৃঢ় ও দৃঢ়তর হইতেছিল এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ইন্দোনেশীয় মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধানে ভারতের নেতৃত্ব

কিন্তু মালয়েশিয়ার প্রতি ইন্দোনেশিয়ার শত্রুতামূলক ব্যবহার এবং সেই সূত্রে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ ত্যাগ ভারত-ইন্দোনেশীয় সম্প্রীতি কতক পরিমাণে ব্যাহত করিয়াছে। পাকিস্তানের সহিত ইন্দোনেশিয়ার মিত্রতাও সেজন্য আংশিকভাবে দায়ী। [৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভারত ও নেপাল ঃ ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালের রাণা অর্থাৎ বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীপরিবারের ষড়যন্ত্রে নেপালরাজ ত্রিভুবন সিংহাসন হইতে অপসারিত হইলে ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। নেপালে ইহাতে এক স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাণা মোহন সাম্‌শের জঙ্গ রাজা ত্রিভুবনের এক নাবালক পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বৈরাচারী রাণা পরিবারের এই অবৈধ কার্য ভারত সরকার সমর্থন না করায় শেষ পর্যন্ত রাজা ত্রিভুবন নেপালের সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন এবং ইহার পর ক্রমে রাণা পরিবারের বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রিত্বের স্থলে জনগণের প্রতিনিধিবর্গের নেতাকে প্রধান-

মন্ত্রিপদে নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। নেপালের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইদানীং নেপালের শাসনব্যবস্থা নেপালরাজ মহেন্দ্র স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ফলে গণতান্ত্রিকতা সাময়িকভাবে ব্যাহত হইলেও, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

নেপালের রাজনৈতিক সমস্যা-সমাধানে ভারতের সাহায্য-দান

ভারত ও তিব্বত: ভারতের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত তিব্বত আইনত চীনের অধীন হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই চলিতেছিল। ভারতের সহিত তিব্বতের দীর্ঘকাল ধরিয়াই বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিদ্যমান। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের কমিউনিস্ট সরকার তিব্বতের উপর অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে তিব্বতের বহুসংখ্যক অধিবাসী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার এই ব্যাপারে চীন সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার ফলে, চীন সরকার তাঁহাদের সামরিক অভিযান স্থগিত রাখেন এবং তিব্বতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তির শর্তানুসারে তিব্বত চীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। চীন সরকারও তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। অবশ্য তিব্বতের সামরিক বাহিনী চীনের সরাসরি অধীন হইবে এবং চীন সরকার তিব্বতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করিবেন এই দুইটি শর্তও ঐ চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমেই তিব্বতের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ কঠোর শাসনক্ষমতায় পর্যবসিত হইলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। চীন এই বিদ্রোহ দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া তিব্বতকে চীনের অংশে পরিণত করে। সেই সূত্রে ভারত চীনের নিকট প্রতিবাদ জানায় এবং দলাই লামা ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে চীন-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই তিক্ততা চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত দেশ আক্রমণ ও অধিকারের পরোক্ষ কারণসমূহের অন্যতম বলা যাইতে পারে।

চীন-তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের সাফল্য

ভারত ও কোরিয়া: ভারতের নিরপেক্ষতার নীতি বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা যে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার প্রমাণ হিসাবে কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি ব্যাপারেও

উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরস্পর যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ে ভারতের অংশ-গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় আত্মঘাতী যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে ভারতবর্ষ-ই ছিল প্রধান উদ্যোগী। ইহা ভিন্ন যুদ্ধবন্দী-বিনিময় ব্যাপারে ভারতের উপর যুদ্ধবন্দী-বিনিময় কমিশনের সভাপতিত্বের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। এই কমিশনের অপরাপর সদস্য দেশ ছিল সুইট্‌জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও সুইডেন। ভারতের পক্ষে জেনারেল থিমায়া এই কমিশনের সভাপতিত্ব করেন। নির্দিষ্ট কালের মধ্যে যুদ্ধবন্দী-বিনিময় সম্পন্ন না হওয়ায় যে-সকল বন্দী উত্তর বা দক্ষিণ কোরিয়ায় যাইতে রাজী ছিল না, তাহাদিগকে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইয়াছিল। ভারত হইতে কেহ কেহ অপরাপর দেশে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ আবার ভারতেই স্থায়িভাবে রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধবন্দী-বিনিময় কালে কমিউনিস্ট্ ও কমিউনিস্ট্-বিরোধী যুদ্ধবন্দীদের সহিত ধৈর্যসহকারে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে স্থিরভাবে কাজ করিয়া জেনারেল থিমায়া ও ভারতীয় সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি ও যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ে ভারতের সাহায্য

ভারত ও ইন্দো-চীন : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান পরাজিত হইলে ফ্রান্স পুনরায় ইন্দো-চীন নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চায় এবং ইন্দো-চীনের কাম্বোডিয়া, লাওস্ ও ভিয়েৎনাম-এর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করে। এই ব্যাপারেও ভারত সরকার ইন্দো-চীনের সমর্থন করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু অতিথি হিসাবে ফরাসী পার্লামেন্টে বক্তৃতাদান কালে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সেই অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনা-ই হইল একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি এই বক্তৃতায় ফরাসী পার্লামেন্ট ও ফরাসী জাতির নিকট বিশেষ আবেদন জানান। যাহা হউক ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই এই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ঘটে। এই বিষয়েও ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের চেষ্টায় যুদ্ধবিরতি-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে মতৈক্যের পথ সহজতর হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য তিনটি কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই তিনটির-ই চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতীয়। জে. এম. দেশাই, ডাঃ জে এন. খোস্‌লা ও জে. পার্থসারথি এই তিনটি কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

ইন্দো-চীনে যুদ্ধ-বিরতিতে ভারতের অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব সহকারে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালন ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের উপর সকলের শ্রদ্ধার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

ভারত ও চীন: ভারত যে কোন রাষ্ট্রজোটে-ই যোগদানের পক্ষপাতী নহে এবং সকল দেশের প্রতিই যে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত, তাহা এক দিকে কমিউনিস্ট্ চীন ও রাশিয়ার সহিত এবং অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী প্রভৃতি দেশের সহিত মৈত্রী চুক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। মহা-চীনে কমিউনিস্ট্ শাসন স্থাপিত হইলে মার্কিন-সাহায্যপুষ্ট চিয়াং-কাইশেকের ফরমোজা দ্বীপের প্রতিনিধিকে চীনদেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবার অযৌক্তিকতা সকলের নিকটই সুস্পষ্ট হইল। কিন্তু মার্কিন সরকারের এবিষয়ে বিরোধিতা কিছুকাল পূর্বাবধি অপরিবর্তিত ছিল। যাহা হউক ভারত সরকার, ব্রিটেন প্রভৃতি বহু দেশই কমিউনিস্ট্ চীনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। চীনদেশের সহিত সুদূর অতীত হইতেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত কর্তৃক কমিউনিস্ট্ চীন স্বীকৃত হইলে চীন-ভারত মৈত্রী দৃঢ়তর হইল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন্-লাই ভারত পরিদর্শনে আসিলে ভারত-চীন মৈত্রী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নেহরু-চু-এন্-লাই-এর যুগ্ম বিবৃতিতে ভারত ও চীনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারের আদর্শ বর্ণিত হয়। এই আদর্শ পাঁচটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা পৃথিবীর সর্বত্র 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। 'পঞ্চশীল' হইল: (১) পরস্পর পরস্পরের রাজ্যের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (mutual respect for territorial integrity and sovereignty), (২) অনাক্রমণ (non-aggression), (৩) পরস্পর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে না-হস্তক্ষেপ (non-intervention), (৪) পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান ও সম-মর্যাদা প্রদর্শন (equality and mutual assistance) ও (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (peaceful co-existence)। চীনদেশ ও ভারতের মৈত্রীর নিদর্শন হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরু চীন-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অল্প-কালের মধ্যেই চীন ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমানায় হানা দিলে এবং ক্রমে ভারতের কয়েক সহস্র বর্গমাইল অধিকার করিয়া লইলে চীন-ভারত সম্পর্ক তিক্ত

চীন-ভারত মৈত্রী

চু-এন্-লাই-এর ভারত পরিদর্শন

পঞ্চশীল

হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাস এবং দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দান প্রভৃতির ফলে এই তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন কর্তৃক নেফা ও লাদাক অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান ও বহু স্থান অধিকার চীন-ভারত সম্পর্ক প্রকাশ্য শত্রুতার পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। [বিশদ আলোচনা অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]।

ভারত ও রাশিয়া : রাশিয়ার সহিত ভারত মিত্রতামূলক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। অপর দেশের শাসনব্যবস্থা কি প্রকৃতির তাহার উপর সেই দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা-না-করা নির্ভরশীল নহে, এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত পৃথিবীর সমক্ষে 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (peaceful co-existence)-এর কার্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রমাণস্বরূপ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন্ ও রুশ কমিউনিস্ট্ দলের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ক্রুশ্চভ্ ভারত পরিদর্শনে আসেন। ভারতের জনসাধারণ রুশ নেতৃদ্বয়কে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। 'ভারত-ইতিহাসে, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বৈদেশিক নেতাকে এইরূপ সম্বর্ধনা কোন দেশ করে নাই।' রাশিয়ার সহিত ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। মার্শাল বুলগানিন্ ও ক্রুশ্চভ্ তাঁহাদের ভারত সফরকালে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ একথা অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পোর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান নির্লজ্জের মত তখনও দখল করিয়া থাকার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যে তাঁহারা খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি রুশ-ভারত সৌহার্দ্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাশিয়ার সাহায্য এই সৌহার্দ্যের পরিচায়ক। নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের পর (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১) প্রধানমন্ত্রী নেহরুর রাশিয়া সফরকালেও রুশ-ভারত আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রুশনেতা বুলগানিন্ ও ক্রুশ্চভের ভারত ভ্রমণ

ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিজিন ও অপরাপর রুশ নেতৃবর্গের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার রুশ-ভারত-মৈত্রীর গভীরতার পরিচায়ক বলা বাহুল্য।

ভারত ও মিশর : পররাষ্ট্রক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকিয়া শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারত মিশরের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাসের কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে যে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ ঘটিয়াছিল, উহার বিরোধিতায় ভারত অগ্রণী ছিল। অবশেষে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ মিশর হইতে সৈন্যাপসারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি কর্ণেল নাসেরের ভারত-পরিদর্শন, নেহরুর একাধিকবার কায়রোতে গমন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত নাসেরের সৌহার্দ্য, এবং সর্বোপরি ইদানীং যে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাতে ভারত কর্তৃক আরবসঙ্ঘের পক্ষ সমর্থন, মিশর ও ভারতের মধ্যে এক গভীর মৈত্রী সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারত-মিশর মৈত্রী

ভারত ও সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল : ভারতের মৈত্রী-নীতি সউদি আরব, আফগানিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিও পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইতেছে। সউদি আরবের রাজা এবং আফগানিস্তানের শাহ্ ভারত-পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। এই দুই দেশের সহিতও ভারতের মিত্রতা ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে। সিংহলে পূর্ববর্তী সরকারের সহিত সিংহল-প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা লইয়া সিংহল ও ভারতের মধ্যে কিছু মন-কষাকষি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বন্দরনায়ক এবং তাহার পর তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রধানমন্ত্রিত্বাধীনে ভারত-সিংহল-সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সৌহার্দ্য বর্তমানেও বজায় আছে বটে, কিন্তু সিংহলে ভারতীয়দের নাগরিকত্বের সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান এযাবৎ সম্ভব হয় নাই।

সউদি আরব, আফগানিস্তান ও সিংহলের সহিত ভারতের সৌহার্দ্য

ভারত ও পাকিস্তান : স্বাধীনতার পরবর্তী প্রায় তেইশ বৎসর ধরিয়া ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তেমন প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। প্রথম হইতেই পাকিস্তান সরকার ভারতকে শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রতি অপমানসূচক মন্তব্য করিতেও পাকিস্তানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই। কাশ্মীর আক্রমণ এবং পুনঃ-পুনঃ ভারতের সীমা লঙ্ঘন, পাকিস্তানী হানাদারদের ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যথেষ্ট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে,

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাকিস্তান সরকার ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের সাহায্য লইয়া ভারতের বিরোধিতা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ভারত কমিউনিস্ট্ পক্ষে যোগদান করিয়াছে, এই কথা প্রায়ই পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ, যথা প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূন, প্রকাশ্যে বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাতে ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষত মার্কিন সরকারের মনস্তুষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ব্যক্তিকেও এই উক্তির সত্যতা বুঝান সম্ভব হইবে না। যে-কোন অজুহাতে ভারতের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা ভারত সম্পর্কে কটূক্তি করা পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-নীতির মূল স্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন সামরিক সাহায্য লাভের এবং বাগদাদ চুক্তির পর পাকিস্তানের আস্ফালন কিছুদিন একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ জেহাদ প্রভৃতি উদ্ভট পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না, একথা মনে হয় উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য মার্কিন সরকারের সাহায্যদানে মর্মাহত হইয়া পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বিগত বাগদাদ চুক্তি-সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বৈঠকে উহার বিরোধিতা করিয়া বিফল হইয়াছেন। একই দেশ হইতে উদ্ভূত দুইটি রাজ্যের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত কারণে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এইরূপ তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে: (১) পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত কাশ্মীরের অঞ্চল ত্যাগে অসম্মতি, (২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নীতি, (৩) পাকিস্তান হইতে ভারতের সীমানায় হানা, (৪) ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের অপপ্রচার ও কটূক্তি প্রয়োগ, (৫) পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ও পুনঃপুনঃ জেহাদের উস্কানি এবং (৬) সেচখালের জলসরবরাহ সম্পর্কে পাকিস্তানের অন্যায্য দাবি। সেচখাল-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ইদানীং সম্ভব হইলেও ভারতের প্রতি পাকিস্তানী নেতৃবর্গের বিদ্বেষভাব ও ঈর্ষাপরায়ণতার অবসান ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না। চীনা আক্রমণকালে সামরিক দিক দিয়া অপ্রস্তুত ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়, বিশেষভাবে সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করায় এবং চীনের সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক প্রস্তুতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টায়ই পাকিস্তান অবৈধভাবে পাকিস্তান-অধিকৃত

ভারতের বিরোধিতা পাকিস্তানী পররাষ্ট্র-নীতির মূল স্বর

ভারত-পাকিস্তান সমস্যা

কাশ্মীরের একাংশ চীনকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং চীনের সহিত বাণিজ্য ও বিমান-চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানও ভারতের শত্রুদেশের প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে পাকিস্তান আকস্মিকভাবে কচ্ছের রাণ এলাকায় ভারতীয় ঘাঁটি দখল করিলে ভারত উহার পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের চেষ্টায় কচ্ছ এলাকায় সংঘর্ষ বন্ধ হয় এবং প্রথমত ভারত-পাক বৈঠকের মাধ্যমে ও তাহাতে সমাধান সম্ভব না হইলে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে কচ্ছ সীমান্তের বিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই বৈঠকে বসিবার পূর্বেই পাকিস্তান কাশ্মীরে হানাদার প্রেরণ করিয়া নাশকতা-মূলক কার্য শুরু করে। ফলে ভারত এই বৈঠক নাকচ করিয়াছিল। কাশ্মীরে হানাদারদের বিনাশ সাধনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫) ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী স্বভাবতই তৎপর হইয়া উঠে। এই সূত্রে হানাদারগণের অপরাপর দল যাহাতে ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কয়েকটি ঘাঁটি দখল করিতে বাধ্য হয়। ফলে পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়। তাসখেন্দ্-এর চুক্তি (জানুয়ারি ১০, ১৯৬৬) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু এই চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করার ব্যাপারে পাকিস্তানের মোটেই আগ্রহ ছিল না। উপরন্তু ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আধুনিক সমর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। [পরবর্তী ঘটনা "সাম্প্রতিক প্রসঙ্গসমূহ" শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

ভারত ও আমেরিকা, ইংলণ্ড : প্রায় তেইশ বৎসরের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে আশাজনক বলা চলে না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত ইঙ্গ-মার্কিন-এর প্রদর্শিত পথেই চলিবে এইরূপ বোধ করি মার্কিন নেতৃবর্গের আশা ছিল। অন্তত মার্কিন ইতিহাসে স্বাধীনতালাভের (১৭৭৬) পরবর্তী কিছুকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালিত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই। তদুপরি ভারতের রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট্ চীন-দেশের সহিত মিত্রতা, চীনদেশকে জাতিপুঞ্জের সংস্থায় স্থানদানে

ইঙ্গ-মার্কিন-ভারত সম্পর্ক

ভারতের প্রচেষ্টা প্রভৃতি ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতিকদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। পাছে ভারত কমিউনিস্ট্ রাষ্ট্রজোটের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এজন্য ব্রিটিশ, বিশেষভাবে আমেরিকার উদ্বেগও নেহাৎ কম নহে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমেরিকা কর্তৃক ভারতকে ১৪২ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণ-দান এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত যাহা আশা করিয়াছিল সেই তুলনায় অতি অল্প হইলেও কতক সাহায্যদানে স্বীকৃতি ভারতকে কমিউনিস্ট্ দেশগুলির সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে না-দেওয়ার মনোবৃত্তি-প্রসূত, একথা অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্যও ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান এবং কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রজোটের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ইঙ্গ-মার্কিন-ভারত সৌহার্দ্য কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। রুশ নেতৃবর্গের ভারত-পরিদর্শনের অব্যবহিত পরে মিঃ ডালেস কর্তৃক 'গোয়া পার্তুগালের প্রদেশস্বরূপ' এই ঘোষণা ভারতের উপর পরোক্ষভাবে চাপ দিবার চেষ্টা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বাগদাদ-চুক্তিতে আমেরিকার অংশগ্রহণ ভারত-বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। কেনেডির প্রেসিডেন্ট্-পদ লাভের পর ভারত-মার্কিন সৌহার্দ্য কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মার্কিন মনোভাব

সুয়েজ খাল আক্রমণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতের কার্যকলাপ ব্রিটিশ রক্ষণশীল-দলীয় সরকারের ক্রোধের সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল পরবর্তী নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনা কালে। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন-এর বক্তব্য শুনিবার পূর্বেই ব্রিটিশ প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শন তথা ভারতের সুয়েজ খাল অর্থাৎ মিশরীয় নীতির প্রত্যুত্তর হিসাবে নির্লজ্জ-ভাবে 'উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া ' এইরূপ ভাষা-সম্বলিত একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমনকি তখনও ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা দেওয়াই শুরু হয় নাই। এই সকল ব্যাপারে সেই সময়ে কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য ব্রিটেনের সহিত ভারতের মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। কমন্ওয়েল্থ-এর সদস্য হিসাবে ভারত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা-সমাধানে নিরপেক্ষতার নীতি আশা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ

কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব

ভারতের জনসাধারণের কমন্ওয়েল্থ ত্যাগ দাবি

বর্তমানে সেইরূপ বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি হারাইয়াছেন। ভারতের জনসাধারণ ভারতের কমন্‌ওয়েল্‌থ-ত্যাগের দাবি দীর্ঘকাল হইতেই জানাইয়া আসিতেছিল। এই দাবি সর্বকালের জন্যই উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না, একথা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলানের আমলে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের কতক পরিবর্তন ঘটে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে ব্রিটিশ সরকার অতি দ্রুত ভারতকে সামরিক সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ-মেয়াদী সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও ব্রিটেন ভারতকে সাহায্য করিয়াছে। ইদানীং ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক কতকটা প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে।

ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতার নীতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের প্রয়োগ পৃথিবীর শান্তিকামী দেশমাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের প্রতিবেশী সিংহল, ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলি—ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এবং চীন, মিশর, সিরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পঞ্চশীল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পঞ্চশীলের পরিপন্থী আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহাদের নিকট পঞ্চশীল মুখের কথায় পর্যবসিত হইয়াছে। পৃথিবীর জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ভারত কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্র-নীতিই যে একমাত্র অনুসরণের পন্থা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না। এই উদার-নীতির সুযোগ লইয়াই পাকিস্তান ভারতের প্রতি উদ্ধত আচরণে দ্বিধাবোধ করিত না, পক্ষান্তরে এই উদারনীতি অনুসরণ করিয়াই ভারত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতে পূর্বেকার ফরাসী-অধিকৃত স্থানসমূহ ফিরিয়া পাইয়াছে। এই নীতির ফলেই বিশ্বের দরবারে ভারতের তথা ভারতবাসীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরস্পর অসহিষ্ণু ও স্বার্থপর জগতে সর্বক্ষেত্রেই এই উদার-নীতির সাফল্য আশা করা ভুল হইবে, কিন্তু এই পন্থার বিকল্প পন্থাটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য কিনা সেকথা বিচার না করিয়া বর্তমান নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করা উচিত হইবে না। পৃথিবীর কোন কোন শক্তি যখন সামরিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোট গঠন করিতে প্রয়াসী—যথা, বাগদাদ চুক্তি (CENTO), সিয়েটো (SEATO,) ন্যাটো (NATO) প্রভৃতি—সেই সময়ে নিরপেক্ষ অঞ্চলগুলির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও শান্তির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও উন্নতিসাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির সার্থকতা

বোগোর (১৯৫৪) এবং বান্দুং-এর এশিয়া-আফ্রিকা মহাসম্মেলনে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন সমস্যা তথা পূর্ব ও পশ্চিম-বার্লিন সমস্যা লইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোমালিন্য যখন পৃথিবীর শান্তিনাশের আশঙ্কার সৃষ্টি করে তখন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের শীর্ষ সম্মেলন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)। এই সম্মেলনে ক্রুশ্চভ্ ও কেনেডির মধ্যে সাক্ষাৎকার ও সরাসরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলে এই দুই নেতাকে এক শীর্ষসম্মেলনে মিলিত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের মধ্যে মীমাংসার পন্থা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমাকে ক্রুশ্চভ্‌কে অনুরোধ করিবার জন্য রাশিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। ফলে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল তাহা কতকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ স্থগিত রাখা সম্পর্কে এবং রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী স্থাপনের পরিবেশ প্রস্তুত ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা শান্তিকামী দেশমাত্রেরই সমর্থন লাভ করিয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রুশ-মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ভূগর্ভ ব্যতীত অন্যত্র আণবিক বিস্ফোরণ নিরোধকল্পে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের শান্তিকামী নীতির জয়লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শান্তির পথই হইল বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির পথ, সামরিক জোট ধ্বংসের পথ—ইহাই ভারত বিশ্বাস করে।

নিরপেক্ষ শীর্ষসম্মেলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

শান্তি ও মৈত্রীর পথে ভারত

ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি (India's policy of non-alignment): পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতের জোট-নিরপেক্ষভাবে চলিবার নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা ভারতীয়দের এবং বিদেশীদের অনেকেই করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এই নীতির পূর্ণ সমর্থন ভারতে এবং বিদেশে সমপরিমাণেই পরিলক্ষিত হয়।

জোট-নিরপেক্ষতা নীতির সমালোচনা ও সমর্থন

স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং জোট-নিরপেক্ষতার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর স্বাধীন ভারত এমন কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে যাহার

ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি অপর কোন রাষ্ট্র বা শক্তির ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। জোটবদ্ধ হইবার অর্থই হইল অপর কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর আংশিকভাবে হইলেও নির্ভরশীল হইয়া পড়া। এই ধরনের নির্ভরশীলতার অর্থই হইল স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার কতক পরিমাণে ত্যাগ করা। ভারত এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে রাজী নহে, এজন্য জোটবদ্ধ হওয়া ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মৌল সূত্রের বিরোধী।

জোট-নিরপেক্ষতার যুক্তি: জোটবদ্ধ হওয়া স্বাধীনভাবে চলার পরিপন্থী

ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ। আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য ভারতকে উন্নত দেশ-সমূহের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে। কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবর্গের সহিত জোটবদ্ধ হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে অপর রাষ্ট্র-জোট বা বিরোধী শক্তি বা রাষ্ট্রের সমর্থন হারান। ভারত এ পন্থা অবলম্বন করিতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য সকল রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন—জোটবদ্ধ হওয়া ইহার পরিপন্থী

কেহ কেহ পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া একথা বলিয়া থাকেন যে, পাকিস্তান যেমন ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য এবং কমিউনিস্ট্ চীনের সমর্থন ও সাহায্য একই সঙ্গে লাভ করিতেছে, সেইরূপ ভারতের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বিনিময়ে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি (পেশোয়ারে) নির্মাণের অধিকার দান করিতে এবং মার্কিন সরকারের কোন কোন নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে চীনের ইচ্ছানুসারেও পাকিস্তানকে চলিতে হইতেছে। পাকিস্তানের শাসকগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি এবং ভারত-বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন বলিয়াই দেশের স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-জোটে আবদ্ধ হইয়াছেন।

পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত

কোন কোন লেখক ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি এশীয় জীবনাদর্শের মূল-নীতি—শান্তিপ্রিয়তার দ্বারাই প্রভাবিত বলিয়া মনে করেন।* বস্তুত, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শান্তিপ্রিয়তা ভারতের জীবনাদর্শের মূলসূত্র হইলেও

* "Indian foreign policy is imbued with a certain pacimism arising out of the Asian Philosophy of life". Hartmann : *The Relations of Nations*, p. 619.

সেই শান্তি যদি ভারতের সার্বভৌমত্বের কোনপ্রকার অবমাননা হয় তাহা হইলে ভারত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত থাকিবে। (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র-জোট গঠন করিয়া আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট। ভারত এই পন্থায় বিশ্বাসী নহে।) পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-জোট গঠনের ফলে পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে বলা বাহুল্য। কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া এই ধরনের জোটবদ্ধ হইলেও একই রূপ ফল দর্শাইবে।)

ভারতের শান্তিপ্রিয় জীবনাদর্শ নিরপেক্ষতার অন্যতম কারণ (?)

মরগ্যানথোর (Morgenthau) মতে ভারতের খাদ্যাভাব ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির দুর্বলতার কারণ। এই দুর্বলতার জন্যই ভারত কোন বিশেষ মত, আদর্শ বা রাষ্ট্র-জোটের সহিত মিলিত হইয়া চলিতে সমর্থ নহে। ভারতের খাদ্যসমস্যা সমাধানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র এবং সকল রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্রের সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন, কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারত কোন রাজনৈতিক শর্তাধীনে খাদ্য গ্রহণে রাজী নহে। ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভব হইলে পরও ভারত কোন রাষ্ট্র-জোটে আবদ্ধ হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিবে না।

খাদ্যাভাব হেতু ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি দুর্বল

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিগুলি পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এই দুই শিবির বা ব্লক হইল কমিউনিস্ট্ ব্লক ও পশ্চিমী ব্লক। এই দুই শিবিরের পারস্পরিক বিবাদের আবর্তে পড়িয়া ভারত নিজ সার্বভৌমত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। জোট-নিরপেক্ষতার নীতি পৃথিবীর সকল দেশের তথা সকল প্রকার আদর্শের সহিত সহাবস্থান নীতির পরিপূরক। এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে নিরপেক্ষ একটি তৃতীয় শক্তি (Third Force) গড়িয়া উঠিয়াছে। বিবদমান শিবিরের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রয়োজন এবং তাহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন এই জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তির দ্বারাই মিটিতে পারিবে। ভারত এই নীতির প্রবর্তক। জোট-নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের নেতৃত্ব স্বভাবতই ভারতের উপর বর্তাইয়াছে।

ভারত কমিউনিস্ট্ ব্লক ও পশ্চিমী ব্লকের মধ্যবর্তী তৃতীয় শক্তির নেতা

ষোড়শ অধ্যায়

আফ্রিকার জাগরণ

(Resurgence of Africa)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনাই হইল আফ্রিকার জাগরণ। দীর্ঘকালের সুষুপ্তি কাটাইয়া আফ্রিকা এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিবার ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী-রাষ্ট্রসমূহ এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, আফ্রিকাবাসীর জাতীয়তা-বোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে সাম্যবাদের প্রসার আফ্রিকার সমস্যাসমূহকে অত্যধিক জটিল করিয়া তুলিল। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ফলে আফ্রিকাবাসী দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতিতে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, এশিয়ার জাগরণ প্রভৃতি আফ্রিকাবাসীদিগকে শোষণমুক্তভাবে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনের আশায় আন্দোলন শুরু করিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এই বণ্টনের ফলে কোনপ্রকার ভৌগোলিক অথবা জাতিগত ঐক্যের কথা সাম্রাজ্যবাদীদের মোটেই স্মরণ ছিল না। আফ্রিকাবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔপনিবেশিক অংশে বিভক্ত রাখিবার ফলে উপদলীয় বা জাতিগত ঐক্যের স্থলে আফ্রিকাবাসীদের এক বৃহত্তর ঐক্যের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। আফ্রিকার যে-কোন অঞ্চলে কোনপ্রকার আন্দোলন স্বভাবতই সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাইজিরিয়ার অধিবাসী ডক্টর নামডি আজিকিউই, ঘানার ডক্টর কোয়ামি নক্রুমা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াটা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া 'প্যান-আফ্রিকান্' (Pan-African) আন্দোলন শুরু করিলে আফ্রিকাবাসী এক বৃহত্তর ঐক্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘানার রাজধানী আক্রা (Accra) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণের এক

জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ আফ্রিকাবাসী

আফ্রিকাবাসীদের ঐক্য আন্দোলন— Pan-African Movement

অধিবেশনে আলাপ-আলোচনায় সমগ্র আফ্রিকার অধিবাসিগণের ঐক্যবদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকা ভিন্ন অপর সকল রাষ্ট্রই এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। এই সম্মেলনে African Monroe Doctrine ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহা আফ্রিকার যে-কোন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী সর্বপ্রকার অধিকারের অবসান ঘটাইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রয়োজন হইলে আফ্রিকারই কোনও একটি রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার মাধ্যমে উহার মীমাংসা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রবর্গের সৌহার্দ্য ও শান্তি-নীতি এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মূল নীতিতে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আফ্রিকার জাগরণ আফ্রিকার বিভিন্নাংশের স্বাধীনতা-লাভ এবং স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমগ্র আফ্রিকায় মোট চারিটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু প্রায় সমগ্র আফ্রিকাই বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অপরাপর অংশেও যে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহা হইতে আশা করা যায় যে, অল্পকালের মধ্যেই আফ্রিকা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইবে।

'আফ্রিকার মনরো ডক্‌ট্রিন' (African Monroe Doctrine)

স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি

কঙ্গো সমস্যা (Congo Problem): ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেলজিয়ামের উপনিবেশ কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিল-এ এক ব্যাপক বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন শুরু হইলে বেলজিয়াম সরকার ছয় মাসের মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন। ঐ বৎসর জুন মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্গোর বিভিন্ন উপদলীয় নেতাদের মধ্যে এক তীব্র স্বার্থ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেই সুযোগে কঙ্গোর সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে স্বাধীন কঙ্গোর সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা সেনাবাহিনীর ন্যায্য দাবি মানিয়া লইয়া উহাকে স্বাধীন সরকারের বশে আনিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই সময়ে বেলজিয়ামের প্ররোচনা ও সাহায্যে কঙ্গোর অন্যতম প্রদেশ কাতাঙ্গা কঙ্গো সরকার হইতে স্বাধীন হইয়া গেল। বেলজিয়ামের সেনাবাহিনী তখনও কঙ্গো হইতে অপসারিত হয় নাই। সেই সকল সৈন্য কঙ্গো-কাতাঙ্গার গৃহবিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়া কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিল

কঙ্গো সমস্যা

স্বাধীন কঙ্গোয় অন্তর্যুদ্ধ

অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে কাতাঙ্গা হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কঙ্গোর অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইলে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল কঙ্গো-সমস্যার মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ বেলজিয়াম সরকারকে কঙ্গো হইতে নিজ সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দিলেন এবং সেক্রেটারী-জেনারেলকে প্রয়োজনবোধে কঙ্গো সরকারকে সামরিক সাহায্য প্রেরণের অনুমতিও দান করিলেন। তদানীন্তন সেক্রেটারি-জেনারেল হেমারশিল্ড্ বেলজিয়াম সৈন্য ও কঙ্গো সরকারের সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এবং কঙ্গো সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর পক্ষ হইতে একদল সৈন্য কঙ্গোয় প্রেরণ করিলেন। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতীয় সৈন্যও ছিল। কিন্তু কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই অত্যধিক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট্ কাসাবুবু ও প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে কাসাবুবু লুমুম্বাকে পদচ্যুত করিলেন, লুমুম্বাও প্রত্যুত্তরে কাসাবুবুকে পদচ্যুত করিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে কর্ণেল মোবোটু কঙ্গোর শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গ কঙ্গো পরিস্থিতির এইরূপ দ্রুত পরিবর্তনে কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় একবার মোবোটুকে, একবার লুমুম্বাকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি লুমুম্বার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের ভ্রম উপলব্ধি করিলেন। এদিকে কাতাঙ্গার নেতা শোম্বে কঙ্গোর বিরুদ্ধে যুঝিয়া চলিলেন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল হেমারশিল্ড্-এর ঐকান্তিকতায় কঙ্গো-কাতাঙ্গায় অন্তর্যুদ্ধের অবসানকল্পে এক যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবার জন্য তথায় পৌঁছিবার কালে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাতাঙ্গার ষড়যন্ত্রের ফলেই এই বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। কাতাঙ্গা-কঙ্গোর অন্তর্যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটিলে ইহার অল্পদিন পরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক কর্তৃপক্ষ ও শোম্বের মধ্যে এক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ইহার পরই শোম্বে এই চুক্তি অমান্য করেন।

কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ ও কঙ্গো-কাতাঙ্গা সমস্যা

লুমুম্বার নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কঙ্গো-কাতাঙ্গা সমস্যা এখনও অমীমাংসিত

ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে মোবোটু কাতাঙ্গা জয় করিয়া পুনরায় কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনিবার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। সেই সময়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশক্রমে কাতাঙ্গা কঙ্গো সরকারের অধীনে আনিবার চেষ্টা শুরু হয়। অবশেষে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শোম্বে কঙ্গো সরকারের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। কঙ্গোর সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ না হইলে কঙ্গো সমস্যার সমাধান হইয়াছে একথা বলা চলিবে না। এখনও কঙ্গোর জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে।

রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড লইয়া ব্রিটেন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা একপ্রকার সর্বাত্মকই ছিল। উত্তর-রোডেশিয়া, দক্ষিণ-রোডেশিয়া বা নিয়াসাল্যাণ্ড কোনটিই এই যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আস্থাবান নহে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে শ্বেতকায়দের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিল। যাহা হউক, এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করিলে ব্রিটেন মঙ্কটন কমিশন (Monkton Commission) নামে একটি কমিশনের উপর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ভার ন্যস্ত করে। মঙ্কটন কমিশন উত্তর-রোডেশিয়া, দক্ষিণ-রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সুপারিশ করিলেন। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র-নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে সেই সুপারিশও করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা রোডেশিয়া কিংবা নিয়াসাল্যাণ্ড-এর নিকট গ্রহণ-যোগ্য না হওয়ায় নিয়াসাল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ফলে, নানাপ্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্য এই অঞ্চলে চলিতেছে।

রোডেশিয়া-নিয়াসাল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র

রোডেশিয়া-নিয়াসা-ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-স্পৃহা

ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা (The French North Africa) আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া এই তিনটি অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ফরাসী সরকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার

আলজিরিয়া, মরক্কো ও টিউনিশিয়া

করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মরক্কো ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইয়াছে।

মরক্কোর স্বাধীনতালাভ

টিউনিশিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। উহার বাণিজ্য বন্দর বিজার্টা কেবল বন্দর হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নহে, নৌঘাঁটি হিসাবেও উহার গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই ফরাসী সরকার টিউনিশিয়ার উপর অধিকার ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে টিউনিশিয়ায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল উহার চাপে ফ্রান্স ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

টিউনিশিয়ার স্বাধীনতালাভ

আলজিরিয়ার সমস্যা (Algerian Problem) : আফ্রিকাস্থ আলজিরিয়া নামক ফরাসী উপনিবেশে আফ্রিকার অপরাপর অংশের ন্যায়ই জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করে। ফরাসী সরকার পুলিশী শাসনের ও দমন-নীতির মাধ্যমে আলজিরিয়াবাসীকে পদানত রাখিতে চাহিলেন। আলজিরিয়ার মোট লোকসংখ্যার এক-দশমাংশ ইওরোপীয় থাকায় ফরাসী সরকারের পক্ষে দমন-নীতি চালু করা তেমন কঠিন ছিল না। আলজিরিয়ায় ফরাসী স্বার্থরক্ষার জন্যই ইওরোপীয় তথা ফরাসী ঔপনিবেশিকদের হাতেই তথাকার শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ফরাসী সরকার কেবল দমন-নীতি দ্বারা আলজিরিয়াবাসীদিগকে পদানত রাখিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ফলে, ফরাসী অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও আলজিরিয়াবাসী জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘাতের ফলে আলজিরিয়া সমস্যা এক জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইল।

আলজিরিয়া সমস্যার উৎপত্তি

ফরাসী শোষণ ও দমন-নীতি—আলজিরিয়াবাসীর জাতীয়তাবোধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আলজিরিয়ায় এক তীব্র বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিষদের বা **Front de Liberation Nationale**-এর নেতৃত্বে ফরাসী পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উপর আলজিরিয়াবাসীরা পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালাইয়া ফরাসী সরকার তথা আলজিরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। একমাত্র ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই

ফরাসী পুলিশ ও শাসকবর্গের উপর মোট ৬০টি আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আল-জিরিয়াস্থ ফরাসী বাহিনীর উপর আলজিরিয়ার বিপ্লবিগণ আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফরাসী সরকারের আলজিরিয়া নিজ অধিকারে রাখিবার দৃঢ় সংকল্প, পক্ষান্তরে আলজিরিয়া-বাসীদের স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আলজিরিয়াকে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিল। আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহ আলজিরিয়ার পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এবং আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বলপূর্বক দমন করিবার জন্য ফরাসী সরকারের অত্যাচারী কার্য-কলাপ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানায়। ফরাসী সরকার আলজিরিয়া সমস্যা, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলিয়া দাবি করিলেন এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর এবিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই—এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দমন-নীতি অপ্রতিহতভাবে চালাইতে লাগিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আলজিরিয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আলজিরিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ আলজিরীয়দের দমন করিবার উদ্দেশ্যে Organisation Armee Secrete—O. A. S. নামে একটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গঠন করিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে দৃঢ়সংকল্প হইল। ফরাসী সরকারের আলজিরীয় নীতি আলজিরিয়াস্থ ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ মোটেই পছন্দ করিত না। নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং আলজিরীয়দের দমন করিবার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিকগণ একটি পৃথক স্থানীয় অর্থাৎ আলজিরীয় সরকার গঠন করিল। মাতৃদেশ ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর ঔপনিবেশিকগণ অনাস্থার প্রস্তাবও পাস করিল। এমতাবস্থায় ফরাসী জাতি জেনারেল দ্য গলকে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করিয়া তাঁহার হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করিল। দ্য গল রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই আলজিরিয়ার সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করিলেন। আলজিরীয়দিগকে স্বাধীনতা দান না করিয়া আলজিরীয় সমস্যার কোন সমাধানই সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া দ্য গল ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করিলেন যে, আলজিরিয়াবাসীদের গণভোটে আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। আলজিরিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গদের অপসারণের এক পরিকল্পনা তিনি কার্যকরী করিতে চাহিলেন।

আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা—ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ

আলজিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি

আলজিরিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিকদের ঔদ্ধত্য

জেনারেল দ্য গলের ক্ষমতালাভ

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাভিয়ান নামক স্থানে দ্য গল নিজ দেশবাসীদের অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও আলজিরীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। এই সকল নেতা ও ফরাসী সরকারের মধ্যে এ্যাভিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে ফরাসী সরকার আলজিরিয়ায় দমননীতি বন্ধ করিলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে আলজিরীয় নেতৃবর্গের হস্তে তথাকার শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হইল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এক গণভোটে আলজিরিয়াবাসীরা স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করিলে আলজিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল।

এ্যাভিয়ান বৈঠক ও এ্যাভিয়ান চুক্তি

গণভোট—স্বাধীনতা লাভ

সপ্তদশ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

(The United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর উৎপত্তি (Origin of the United Nations) : প্রত্যেক যুদ্ধেরই হত্যালীলা ও বীভৎসতা, ক্লান্তি ও হতাশা মানুষকে অন্তত সাময়িকভাবে শান্তিকামী করিয়া তোলে। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই মানুষ আবার রণমদে মত্ত হইয়া উঠে, এই কারণেই মানবজাতির ইতিহাসের শুরু হইতে এযাবৎ মানুষ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করাই মানবজাতির সর্বাধিক জটিল সমস্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুঝিবার পর ইওরোপীয় দেশগুলি যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অর্থ ও লোকবলহীন হইয়া পড়িয়াছিল তখনও আন্তর্জাতিক শান্তির এক ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার ফলেই ইওরোপীয় কন্সার্ট (Concert of Europe)-এর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখাই ছিল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি বলিতে অবশ্য ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের শান্তি বুঝাইত। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রায় চল্লিশ বৎসর দমনমূলক নীতির মাধ্যমে ইওরোপকে ব্যাপক যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ ত্যাগের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টধর্মের মূল-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত 'পবিত্র-চুক্তি' বা Holy Alliance-এর মাধ্যমে ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি হাস্যাস্পদই হইয়াছিলেন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিবর্গ জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মন রক্ষার জন্যই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নহে।

যুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলার ফলে শান্তির স্পৃহা

ইওরোপীয় কন্সার্ট

পবিত্র-চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলা যেমন পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তি-স্পৃহাও তেমনি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই শান্তি-স্পৃহা 'লীগ-অব-ন্যাশন্স্' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় রূপলাভ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-ই সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত

লীগ-অব-ন্যাশন্স্

হইয়াছিল। আন্তর্জাতিকতা যে ইওরোপ মহাদেশ ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছিল তাহা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর গঠন-পদ্ধতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে সমর্থ হইল না। ফলে, দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগকে শান্তির যুগ না বলিয়া যুদ্ধ-বিরতির যুগ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক হইবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা—ব্যাপক শান্তি-স্পৃহা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও মারণ ক্ষমতা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় এবং অগণিত সামরিক ও বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। নিশ্চিত এবং সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও শান্তি—এই দুই পন্থার একটি মানবজাতিকে বাছিয়া লইতে হইবে। এই কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর 'আটলান্টিক চার্টার' (**Atlantic Charter**) নামে একটি সনন্দ প্রচার করেন। পর বৎসর (১৯৪২) জানুয়ারি মাসে এই সনন্দটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সনন্দের মোট আটটি ধারায় কতকগুলি নীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, যথা: (১) কোন রাষ্ট্র কোনপ্রকার বিস্তারনীতি অনুসরণ করিবে না; (২) পররাষ্ট্রের সীমা-নির্ধারণে আটলান্টিক চার্টার-এর স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামত না লইয়া কিছু করিবে না; (৩) পরাধীন জাতিমাত্রেরই স্বাধীনতালাভের অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের নিজস্ব ইচ্ছামত শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার অধিকার আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরকারী দেশমাত্রেই স্বীকার করিবে; (৪) ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অপরাপর অর্থ নৈতিক বিষয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিজিত-বিজেতা সকল রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইবে; (৫) সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র

আটলান্টিক চার্টার

আটলান্টিক চার্টারের শর্তাদি

পরস্পর সহযোগিতা ও সমবায়-নীতি অনুসরণ করিবে; (৬) নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট্ শক্তির পরাজয়ের পর প্রত্যেক রাষ্ট্রই যাহাতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয়, অভাব-অনটন প্রভৃতি হইতে মুক্ত থাকিয়া উন্নততর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে সেইরূপ পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিতে সকলে সচেষ্ট থাকিবে; (৭) সমুদ্রপথ সকল রাষ্ট্রের নিকটই সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে; (৮) সকল রাষ্ট্রই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, নৌ, বিমান ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইবে।

আটলাণ্টিক চার্টার বা সনন্দের গুরুত্ব

উপরি-উক্ত মোট আটটি ধারার মধ্যে পাঁচটিই, যথা (১), (২), (৩), (৪) ও (৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে শান্তি-চুক্তির মূলনীতির ইঙ্গিত দিয়াছিল। অবশিষ্ট তিনটি, যথা (৫), (৬) ও (৮) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও আদর্শ-সংক্রান্ত নীতির ইঙ্গিত দান করিয়াছিল। ষষ্ঠ ধারায় পররাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণের ভীতিমুক্তভাবে উন্নততর জীবনাদর্শের অনুসরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার বা সনন্দের সপ্তম অধ্যায়ে রূপলাভ করিয়াছে। অনুরূপ পঞ্চম ধারার অন্তর্নিহিত নীতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের নবম ও দশম অধ্যায়ে রূপ পাইয়াছে এবং অষ্টম ধারাটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভিত্তি-স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আটলাণ্টিক চার্টারের ধারাগুলির গুরুত্ব আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানের ভিত্তি হিসাবেই উল্লেখযোগ্য।

৫৫টি দেশ কর্তৃক আটলাণ্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত

আটলাণ্টিক চার্টার প্রথমে ২৬টি দেশ এবং পরে আরও ২৯টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই মোট ৫৫টি স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম ছিল ভারত। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ লইয়াই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

মস্কো ঘোষণার বিভিন্ন ধারা, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৩

আটলাণ্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ব্রিটেন-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ মস্কো নগরীতে এক যুগ্ম ইস্তাহার বা ঘোষণা প্রকাশ করেন। ইহা মস্কো ইস্তাহার বা **Moscow Declaration** নামে পরিচিত। এই ঘোষণার প্রস্তাবনায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা করিয়া অযথা মানুষের শ্রম ও অর্থের অপচয় বন্ধ করিবার প্রয়োজনও স্বীকার করা হইয়াছিল। এই ঘোষণার চতুর্থ ধারায় যথাসম্ভব শীঘ্র পৃথিবীর শান্তিকামী রাষ্ট্র-

সমূহের পরস্পর সমতা ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা ভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের সমতা স্বীকার করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসাবে গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ ও সপ্তম ধারায় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (United Nations) নামটির উল্লেখ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরবর্তী কালে অস্ত্র-শস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা প্রভৃতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সাময়িক নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু মস্কো ঘোষণায় পৃথিবীর জনসাধারণের শ্রম ও অর্থের অপচয় হ্রাস করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা উভয় উদ্দেশ্যেই সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। ইহা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিল।

মস্কো ঘোষণার গুরুত্ব

অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

ঐ বৎসরই (১৯৪৩) ১লা ডিসেম্বর অর্থাৎ মস্কো ঘোষণার অল্পকালের মধ্যেই চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিন তেহ্‌রাণ হইতে যুদ্ধের ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য-সহায়তার পুনঃপ্রতিশ্রুতি দান করেন এবং যুদ্ধাবসানে পৃথিবীর জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপনের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন। পৃথিবীর ছোট-বড় সকল জাতির কার্যকরী সাহায্য-সহায়তা ও সমবায়ের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অত্যাচার, দাসত্ব, দমন-নীতি ও অসহিষ্ণুতার অবসান ঘটাইয়া পৃথিবীতে এক বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবার গঠনের সংকল্প তেহ্‌রাণ ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়।* আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর সৌহার্দ্য-সহায়তা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রয়োজনীয়তার পুনঃস্বীকৃতি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়।

তেহ্‌রাণ ঘোষণা ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৩

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ হইল ওয়াশিংটন-এর নিকট ডাম্বার্টন ওক্‌স্ (Dumberton Oaks) নামক স্থানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে

---

*"We shall seek the co-operation and active participation of all nations, large and small, whose peoples in heart and mind are dedicated, as our own peoples, to the elimination of tyranny and slavery, oppression and intolerance."—Tehran Declaration.

ব্রিটেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। এই আলোচনায় (আগস্ট ১৯৪৪—অক্টোবর ১৯৪৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সাধারণ সভা, একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি দপ্তর ও একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় থাকিবে স্থির হয়। এদিক দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও সামরিক স্টাফ্ কমিটি নামে আরও দুইটি নূতন সংস্থা ডাম্বার্টন ওক্স্ আলোচনার মাধ্যমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে যোগ করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভিটো (Veto) ক্ষমতা লইয়া এই আলোচনাকালে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এবিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

ডাম্বার্টন ওক্স্ আলোচনা (Dumberton Oaks Conversations, (Aug.-Oct. 1944)

ইহার পর ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নামক স্থানে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট্, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী স্টালিন এক কন্ফারেন্স-এ সমবেত হন। ডাম্বার্টন ওক্স্ আলোচনাকালে ভিটো-সংক্রান্ত যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল এই সম্মেলনে তাহার মীমাংসা হয়। এখানে স্থির হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়াদি ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রে বৃহৎ পাঁচটি রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের অর্থাৎ রাশিয়া, আমেরিকা, জাতীয়তাবাদী চীন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ একমত না হইলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে না। এই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের প্রত্যেকে সেজন্য 'ভিটো' (Veto) প্রদান করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দান করিতে পারিবেন।

ইয়াল্টা কন্ফারেন্স (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫)

ইয়াল্টা কন্ফারেন্সেই অছি পরিষদ (Trusteeship Council) পূর্বতন লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর অধীন ম্যাণ্ডেট্ দেশসমূহ, অক্ষ-শক্তিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাজ্যাংশ ও স্বেচ্ছায় অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে আসিতে ইচ্ছুক সেরূপ স্থানসমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অছি পরিষদ গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই কন্ফারেন্সেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন আমেরিকার সান্ফ্রান্সিস্কো শহরে আহ্বান করা স্থির হইল।

ইয়াল্টা কন্ফারেন্সের সিদ্ধান্তানুসারে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত সান্ফ্রান্সিস্কো শহরে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অধিবেশন চলিল।

এই কন্‌ফারেন্স-এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র ও কার্যকলাপ-সংক্রান্ত ধারাগুলির সংখ্যা বাড়াইয়া এবং সেগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া খসড়ায় যে-সকল অস্পষ্টতা ছিল তাহা দূর করা হয়। এই অধিবেশনে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার পঞ্চান্নটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই সনন্দ বা চার্টার স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ প্রকৃত কার্যকরী রূপলাভ করিল। এই চার্টারের প্রস্তাবনা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ধারা হইতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। মোট ১১১টি ধারা-সম্বলিত এই চার্টার বা সনন্দে চারিটি মৌলিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা: আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান করা ও শান্তি বজায় রাখা; প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপন করা; পৃথিবীর বিভিন্নাংশের মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা স্থাপন করা; এবং মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিয়া পৃথিবীর মানুষমাত্রকেই প্রকৃত মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা দান করা। এই সকল মৌলিক উদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার পন্থা হিসাবে জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিকেই 'জাতির মর্যাদা' দানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, আইন-কানুন মানিয়া চলা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইবার নীতি এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর মূল-নীতি ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌কে সাহায্যদানের কর্তব্য স্বীকৃত হইল। অপর কোন রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘন না-করা অথবা কোন রাষ্ট্রের উপর বল-প্রয়োগ না-করা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা—প্রভৃতি নীতিও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ মানিয়া লইল।

সানফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্স: ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ চার্টার (United Nations Charter)

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গী লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মূলত পৃথক ছিল। যেমন, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ লীগ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার কালে "The High Contracting Parties" বলিয়া নিজেদের উল্লেখ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর জনসাধারণকে উহার

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

অংশীদার করিবার কোন মনোবৃত্তি তাহাতে ছিল না। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দে 'আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জনগণ' ('We the Peoples of the United Nations')—এই কথা বলিয়া রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন। ফলে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পৃথিবীর জনসাধারণকে উহার মূলভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এদিক দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পূর্বগামী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে গণতান্ত্রিক ছিল বলা বাহুল্য।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মোট পঞ্চান্নটি দেশ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টার স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই পঞ্চান্নটি* 'Charter Members' ভিন্ন অপরাপর রাষ্ট্রকেও সদস্যভুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের (Security Council) সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার (General Assembly) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সমর্থিত হইলে যে-কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা চলিবে। কিন্তু ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদ-প্রার্থী রাষ্ট্রমাত্রকেই 'শান্তিপ্রিয়' (Peace loving) হইতে হইবে এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট নীতি মানিয়া চলিতে এবং সেজন্য যথাযথ দায়িত্বপালনে রাজী হইতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যবর্গের প্রধান পাঁচজনের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কুয়োমিং-তাং চীন-এর প্রতিনিধিবর্গ) প্রত্যেকেরই 'ভিটো' (Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে অর্থাৎ এই পাঁচজনের যে-কোন কেহ 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া কাউন্সিলের বিবেচনাধীন যে-কোন বিষয়কে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ফলে, এই পাঁচজনের মতৈক্য না থাকিলে কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রমর্যাদাচ্যুত হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে অপসরণ করে বা পুনঃপুনঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের শর্তাদি ভঙ্গ করে তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ সভা সেই সদস্যের সদস্যপদ নাকচ করিতে পারিবে।

নূতন সদস্যভুক্তির শর্ত ও পদ্ধতি : সদস্য-পদ লোপ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এগুলির অধীনে আবার নানাপ্রকার শাখা, উপশাখা আছে। প্রথম ছয়টি সংস্থা হইল : (১) সাধারণ সভা (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), (৩)

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সংগঠন

* বর্তমানে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর সদস্য সংখ্যা ১৩১।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা (Economic and Social Council), (৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council), (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), (৬) দপ্তর (Secretariat)।

(১) সাধারণ সভা (General Assembly) : ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সদস্য মাত্রেই এই সভার সদস্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে মোট পাঁচজন সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একাধিক ভোট থাকিবে না। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আহূত হইবে।

সাধারণ সভা (General Assembly)

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট যাবতীয় বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ সভায় করা চলিবে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যে-কোন সদস্য বা সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রতিনিধিও আলোচনা করিতে পারেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিসাধন ও আন্তর্জাতিক সমবায় ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা সাধারণ সভার কর্তব্যের অন্যতম।

অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তব্য

সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council)-এর অস্থায়ী সদস্য এবং অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)-এর সকল সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের ন্যায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা একটি পরিদর্শক, সমালোচক ও আলোচনা সভা।* নিরাপত্তা পরিষদ বা অপরাপর আন্তর্জাতিক সংস্থার বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা, সিকিউরিটি কাউন্সিল হইতে প্রেরিত বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাজেট আলোচনা ও পাস করা প্রভৃতি সাধারণ সভার কর্তব্য। সাধারণ সভা নিজ কার্যপদ্ধতি-সংক্রান্ত বিধি রচনা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি করিতে পারিবে।

সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সিকিউরিটি কাউন্সিল-এর নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারে। সামরিক নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত কোন নীতি সম্পর্কে সুপারিশ সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যবর্গ এবং

---

* 'a deliberative organ. an overseeing, reviewing and criticizing rgan'. Vide, Langsam, p. 701.

সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বা শান্তি-সংক্রান্ত কোন সমস্যা সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক আলোচনাকালে সাধারণ সভা সেবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবে। কিন্তু কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ অথবা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতে পারে, এই ধরনের কোন বিবাদ সম্পর্কে সিকিউরিটি কাউন্সিল যখন অনুসন্ধানে রত থাকিবে অথবা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশ করিবে এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় রত থাকিবে সেই সময়ে ঐ সকল বিষয়ে সাধারণ সভায় কোন আলোচনা করা চলিবে না। কেবলমাত্র সিকিউ-রিটি কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা সুপারিশ সাধারণ সভা করিতে পারিবে।* সাধারণ সভা কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা-কালে যদি কাউন্সিল কর্তৃক কোনপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে সাধারণ সভা সেবিষয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে জানাইতে পারিবে। সিকিউরিটি কাউন্সিল সাধারণ সভার নির্দেশমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পুনরায় সাধারণ সভাকে সংবাদ প্রেরণ করিবে।

সাধারণ সভা ও সিকিউরিটি কাউন্সিলের সম্পর্ক

সাধারণ সভা বনাম নিরাপত্তা পরিষদ (General Assembly Vs. Security Council) : লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সনন্দে লীগের সভা (Assembly) ও কাউন্সিল বা পরিষদকে (Council) একই ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। লীগের সনন্দের ৩নং ধারার ৩নং শর্তে যে ভাষায় লীগের সভার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষমতা যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল, ঠিক অনুরূপ ভাষায় ৪নং ধারার ৪নং শর্তে লীগ কাউন্সিলকে সম্পূর্ণরূপে একই ক্ষমতা দেওয়া হয়।† ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে লীগের সভা ও কাউন্সিল একই রূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ফলে লীগ যখন শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করিত তখন মুষ্টিমেয় সদস্য লইয়া গঠিত কাউন্সিল অপেক্ষা বহু সদস্যবিশিষ্ট এবং অধিকতর

লীগ এ্যাসেম্বলী বা সভা এবং লীগ কাউন্সিলের সম্পর্ক

---

* Vide Art. 34 U.N. Charter.

† Art. 3 (3) "The *Assembly* may deal, at its meetings, with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world"

cf. Art. 4 (4) "The *Council* may deal, at its meetings, with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world". (*Leage of Covenant*)

গণতান্ত্রিক সংগঠন সভার (Assembly) মতামতই প্রাধান্য লাভ করিত। লীগ কাউন্সিলের তুলনায় লীগের সভার ক্ষমতা ক্রমেই অধিকতর হইতে থাকায়, লীগের কাউন্সিলের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। এজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দে সিকিউরিটি কাউন্সিলের ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ সভার তুলনায় অধিক থাকে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লীগের সভার ন্যায়ই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) পারস্পরিক ক্ষমতা বিভাজন সত্ত্বেও সাধারণ সভার গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, ইহার কার্যাদিও ব্যাপকতর হইতেছে।*

নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশ

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ১২ (১) শর্তে যদিও বলা হইয়াছে যে, যখন নিরাপত্তা পরিষদ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর শর্তানুযায়ী কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা, পরিস্থিতি বা বিবাদ সম্পর্কে আলোচনারত থাকিবে অথবা উহার বিবেচনাধীন থাকিবে তখন সাধারণ সভা সেই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ ভিন্ন কোন প্রকার আলোচনা করিতে বা সুপারিশ করিতে পারিবে না, কিন্তু এই শর্তের ব্যতিক্রম নানা ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন বিষয়ে সাধারণ সভা উহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। এমন কি সনন্দের ২ (৭) শর্তে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেখানে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্‌কে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করা আছে, সেরূপ বিষয়েও সাধারণ সভা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ

অপরাপর কারণ

উপরি-উক্ত উদাহরণ ভিন্ন, নিরাপত্তা পরিষদের অত্যধিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থপরতা সাধারণ সভার আপেক্ষিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিষয়ে পাস করা সম্ভব না হইলে উহা সাধারণ সভায় উত্থাপন করিয়া সেখানে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাইয়াছে এরূপ বহু উদাহরণ আছে। বাংলাদেশের ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সদস্য পদভুক্তির প্রশ্নটিই অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য সাধারণ সভার মতামতের উপর সদস্যপদ লাভ করা সম্ভব না হইলেও পৃথিবীর জনমত তথা রাষ্ট্রসমূহের মনোভাব ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া

† "This organ—the General Assembly, has been growing in importance and changing in function". *The General Assembly or The United Nations XII*, Sydney Bailey.

উঠে। এই সকল নানা কারণে সাধারণ সভার গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে, বলা বাহুল্য।

নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর বিরোধ এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই দুই রাষ্ট্রের কোন না কোন রূপ স্বার্থ বা দায়িত্বের প্রসার নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত সকল বিষয়েই মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলে ভিটো (Veto) প্রয়োগ দ্বারা কোন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আকস্মিকভাবে এই দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মতৈক্য ঘটিলেই নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। সুয়েজ, ইন্দোনেশিয়া এবং কোরিয়ার যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে এই ধরনের ঐকমত্য দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এরূপ উদাহরণ নাই বলিলেই চলে। নিরাপত্তা পরিষদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাসের কারণ হিসাবে এই সকল কারণ দর্শান যাইতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতানৈক্য

নিরাপত্তা পরিষদের হ্রাসমান গুরুত্বের নিদর্শন হিসাবে উহার কার্যকলাপের মোট পরিমাণের তুলনায় সাধারণ সভার কার্যকলাপের পরিমাণের আধিক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই নিরাপত্তা পরিষদের ক্রম হ্রাসমান গুরুত্বের নিদর্শন লক্ষণীয়। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার মোট অধিবেশন সংখ্যা ও বিবেচ্য বিষয়ের সংখ্যার তুলনামূলক বিচারেও এই আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে নিরাপত্তা পরিষদ ৮৮টি অধিবেশনে বসিয়াছিল, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩৬শে দাঁড়াইয়াছিল। এজন্য Economist পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদ উহার পূর্বতন অবস্থার কঙ্কালে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্সের পটভূমিকার পশ্চাতে বিধ্বস্ত প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।*

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব হ্রাসের নিদর্শন

সাধারণ সভার প্রাধান্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধির পশ্চাতে প্রধানত দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমত, সংখ্যাধিক্যের ভোটে সাধারণ সভার কার্যাদি সম্পন্ন করিবার রীতি; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম বিবর্তন। এই দুই

সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি

* "The almost lifeless skeleton of the Council stands like a blasted rock in the background of the U. N. Scene". *Economist*, January, 18 1958. Vide, Mongenthau, p. 485.

কারণে সাধারণ সভার উপর পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের আস্থা ক্রম-বৃদ্ধির ফল স্বরূপ উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council) : এই পরিষদ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর কার্যনির্বাহক সমিতিস্বরূপ। পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও কুয়োমিং-তাং চীন হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। অপর ছয়টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি করিয়া প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই সকল অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের কার্যকাল দুই বৎসর মাত্র। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের কোনটির সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে সেই সম্পর্কে আলোচনায় ভোটদানের অধিকার উহার থাকিবে না। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছয়জনের স্থলে দশজন করা হইয়াছে। ফলে স্থায়ী পাঁচজন ও অস্থায়ী দশজন সদস্যসহ মোট পনরজন সদস্য লইয়া বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্যরাষ্ট্রই 'বড় পাঁচজন' (The Big Five) নামে অভিহিত। এই সকল স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। ভিটো প্রয়োগ দ্বারা ইহাদের যে-কোনওটি সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে-কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council)

'The Big Five'

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষাই হইল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব।* নিরাপত্তা পরিষদ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য-নির্বাহক সংস্থা। ইহার মাধ্যমেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য-কলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা হইল এই সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-কার্য কি হইবে তাহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

নিরাপত্তা পরিষদের কর্তব্য-কার্যাদি

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা

* "To the Security Council was entrusted "Primary responsibility for the maintenance of international peace and security." Vide, Langsam, p. 701.

নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনবোধে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, তদন্তের মাধ্যমে, মধ্যস্থতা বা বিবাদের কারণ দূর করিয়া মিটমাটের মাধ্যমে, বিচারালয়ের মাধ্যমে অথবা যে-কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিতে সাহায্য করিবে। নিরাপত্তা পরিষদ নিজেও কোন বিবাদ বা পরিস্থিতি, যাহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে পারে, সেরূপ বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে। কোন বিবাদের যে-কোন সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদ মিটমাটের জন্য যে-কোন সুপারিশ করিতে পারিবে। অবশ্য বিবদমান রাষ্ট্রগুলি বিবাদ মীমাংসার জন্য যদি কোন পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে সেই পন্থা কতদূর কার্যকরী হইয়াছে বা হইতে পারে সে বিষয়েও বিবেচনা করিবে। নিরাপত্তা পরিষদ ইহাও দেখিবে যে, কোন আইনগত বিবাদ যেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মাধ্যমে মীমাংসিত হয়।

মধ্যস্থতা, তদন্ত, মিটমাটের সুপারিশ প্রভৃতি করা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এরূপ কোন আশঙ্কা আছে কিনা তাহা নিরূপণ করিবে এবং কোন বিবাদ বা পরিস্থিতিতে যদি এরূপ আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে করে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কি কি পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য সেই সুপারিশ করিবে। সামরিক শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন অপর কোন ব্যবস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ অনুসরণ করিবে তাহাও নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করিবে। এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ, রেলপথ, সমুদ্রপথ, আন্তর্জাতিক ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাম, রেডিও বা অপরাপর যোগাযোগের মাধ্যম ছিন্ন করা, এমন কি, কূটরাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ প্রভৃতি যে-কোনটি নিরাপত্তা পরিষদ অনুসরণের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও অপরাপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অনুসারে সামরিক সাহায্য দান এবং সামরিক চলাচলের পথ বা সুযোগদানে স্বীকৃত থাকিবে। অবশ্য কোন রাষ্ট্রের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিলে, সেই রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামরিক সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বিমানবহর দিয়া সাহায্যদান করিতেও অনুরোধ করিতে পারে।

Military Staff Committee-র মত গ্রহণ করিয়া সামরিক পরিকল্পনা রচনা

কিন্তু এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, সামরিক সাহায্য চাহিবার পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদকে Military Staff Committee নামক একটি সামরিক সমিতির মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। কোন সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুতে বা সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সমরবাহিনী কিভাবে নিয়োজিত হইবে সে-বিষয়ে কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে নিরাপত্তা পরিষদ Military Staff Committee-র মতামত গ্রহণ করিবে।

অছি-সংক্রান্ত চুক্তির পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ক্ষমতা

নিরাপত্তা পরিষদ উহার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল অথবা কয়টি সদস্যরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিবে তাহা নিজেই স্থির করিবে। সামরিক দিক্ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে যে-কোন কাজ অথবা অছি-সংক্রান্ত চুক্তি (Trusteeship agreements) অনুমোদন বা উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অনুমোদন ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ চূড়ান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ

নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ রিপোর্ট পেশ করিবে। সাধারণ পরিষদের নিকট নিরাপত্তা পরিষদ যে-কোন বিষয় প্রেরণ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে সাধারণ সভা কর্তৃক প্রেরিত বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিল Military Staff Committee-র সাহায্য লইয়া প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তুত করিতে পারিবে।

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council): সদস্যরাষ্ট্রের কল্যাণ, স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সমবায়ের উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবসান, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব-অধিকারসমূহ' (Human Rights) কার্যকরী করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council) গঠিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায় ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্ক সাহায্যমূলক ও প্রীতিপূর্ণ করিতে পারিলেই আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের যেমন অবসান ঘটিবে, পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর উন্নতিও তেমনি সাধিত হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানবসমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বৈষম্য যদি দূর করা যায়, অর্থাৎ প্রতি রাষ্ট্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সকল রাষ্ট্রের জনসাধারণের অবস্থার যদি সমতা আনয়ন সম্ভব হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক শান্তির পথও তাহাতে প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দের দশম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (Economic and Social Council) গঠনতন্ত্র ও কার্যাদি বর্ণিত আছে। সাধারণ সভা (General Assembly) কর্তৃক নির্বাচিত মোট আঠারজন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইবে। এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বৎসর অন্তর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই পদে পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হইবেন। পদত্যাগী সদস্যগণও নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন। একই রাষ্ট্র হইতে একাধিক সদস্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। একজন সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং অধিকাংশ সদস্যের ভোটে যে-কোন প্রস্তাব পাস করা যাইবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠনতন্ত্র

এই পরিষদ আন্তর্জাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক যাবতীয় কিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ সাধারণ সভা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্র এবং এই সকল বিষয় সম্পর্কে যে-সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কার্যে রত আছে সেগুলির নিকট প্রেরণ কবার দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানব-অধিকার (Human Rights) মানিয়া চলা, মানুষ-মাত্রেরই মৌলিক স্বাধিকার মানিয়া চলা এবং এই ধরনের অধিকার যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে সেই চেষ্টা করা প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট Economic and Social Council সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভার নিকট গ্রহণের জন্য পেশ করিতে পারে অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিতে পারে। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনপ্রকার চুক্তির মাধ্যমে যদি

কার্যাদি :

রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও সুপারিশ প্রেরণ

মানব-অধিকার বৃদ্ধির ও পালনের ব্যবস্থা

চুক্তিপত্র প্রস্তুত ও সম্মেলন আহ্বান

কোন সংস্থা স্থাপিত হয় তাহা হইলে সেই সকল সংস্থার সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে। তবে এই ধরনের চুক্তি সাধারণ সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করাও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্য।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহিত চুক্তি

এই পরিষদের সুপারিশ কার্যকরী করা হইল কিনা সেই সম্পর্কে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের নিকট রিপোর্ট চাহিতে পারে এবং নিজ মন্তব্যসহ সাধারণ সভার নিকট তাহা পেশ করিতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজ কার্যকলাপ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইবে এবং নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবে।

বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র হইতে রিপোর্ট গ্রহণ

নিরাপত্তা পরিষদকে সংবাদ ও সাহায্যদান

সাধারণ সভার কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ পালন করিবে। সাধারণ সভার অনুমতিক্রমে এই পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিতে পারিবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনন্দে উল্লিখিত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য এই পরিষদ পালন করিবে।

সাধারণ সভার নির্দেশ পালন

খাদ্য ও কৃষি পরিষদ (Food and Agriculture Organization : FAO), আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund : IMF), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organization : ILO), ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) প্রভৃতি সংস্থা ও পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council) : ম্যাণ্ডেট্ রাজ্য-সমূহের এবং যে সকল অঞ্চল উহার অধীনে স্থাপন করা হইবে সেগুলির শাসন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইল অছি পরিষদ। রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি, ক্যামেরুন্স্, টোগোল্যাণ্ড, পশ্চিম-সেমোয়া প্রভৃতি অঞ্চল অছি পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) : এই বিচারালয়ের উপর আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক অধিকার, বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের আইনগত বিবাদ প্রভৃতির বিচারের ভার ন্যস্ত। মোট পনর জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য-রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গঠনকালে আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়। স্থায়ী বিচারালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও নিষ্পত্তির উপায় এই সময়েই প্রথম নির্ধারিত হয়। ইহার পূর্বে মধ্যস্থতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ছিল, যেমন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যস্থতার স্থায়ী বিচারালয় বা Permanent Court of Arbitration এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উহার কতক পরিবর্তন সাধন করিয়া মধ্যস্থতার জন্য বিচারালয় স্থাপন করা হইয়াছিল। মধ্যস্থতা ও বিচার—এই দুইয়ের মূল পার্থক্য হইল এই যে, মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ Permanent Court of Arbitration-এর ক্ষেত্রে, বাদী ও বিবাদী পক্ষ মনোনীত মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তির চেষ্টা করা, পক্ষান্তরে বিচারালয় স্থাপন করিলে উহার স্থায়ী বিচারপতিগণ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচার করা। মধ্যস্থতা, মূলত বিবদমান দেশগুলির মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে গৃহীত পন্থা। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় উহার সম্মুখে আনীত বিবাদ-বিসংবাদের বিচারে কোন এক বা দুই পক্ষের পরস্পর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নহে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার উন্নত সংস্করণ

সুতরাং লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ গঠনকালে যখন স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হইল তখন আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হইল বলা যাইতে পারে। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হওয়া মোটেই বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইলে ইহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি বাধ্য ছিল।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের গুরুত্ব

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ স্থাপনকালে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠনপদ্ধতির

কতক পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতা লীগের আমলের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতার অনুরূপ রহিয়া গিয়াছে। লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্ট্যাট্যুট (Statute)-এর ৩৬নং শর্তে উহার বিচার-ক্ষমতার পরিধি বর্ণনায় যাহা বলা হইয়াছে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার পরিধি বা jurisdiction-সংক্রান্ত ৩৬নং স্ট্যাট্যুট (Statute) সম্পূর্ণ একরূপ। (১) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতা সেই সকল ক্ষেত্রেই থাকিবে যে-সকল বিবাদ কোন এক বা একাধিক রাষ্ট্র উহার নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিবে। (২) কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় ঘোষণা দ্বারা, আন্তর্জাতিক কোন চুক্তি বা সন্ধি, আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত কোন বিবাদ, কোন রাষ্ট্রের কোন কাজ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের পরিপন্থী কিনা, কোন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের পরিপন্থী কোন কাজ কোন রাষ্ট্র করিয়া থাকিলে সেজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কিনা, প্রভৃতি সম্পর্কে বিচার করিবার ক্ষমতা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আছে, একথা মনিয়া লইতে পারিবে। (৩) এই ধরনের ঘোষণা নিঃশর্তভাবে বা শর্তাধীনভাবে করা যাইতে পারিবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত তিনটি ধারার দ্বিতীয়টি লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রে ৩৯টি রাষ্ট্র মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু শর্তাধীনভাবে এই ধারাটি মানিয়া লইবার ফলে এই ধারাটি যে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। যেমন, আমেরিকা উহার ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার ক্ষমতাধীন থাকিবে, কিন্তু (১) যে-সকল বিবাদ কোন পূর্ব-স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী অপর কোন সংস্থার মাধ্যমে মীমাংসার ব্যবস্থা আছে অথবা ভবিষ্যতে কোন চুক্তি দ্বারা যদি এই ধরনের ব্যবস্থা-অনুসরণের নীতি স্থির হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সেই বিবাদের বিচার করিতে পারিবে না। (২) যে সকল ব্যাপার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে সেগুলি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এবং (৩) বহু রাষ্ট্রের সহিত অর্থাৎ দুইটির অধিক রাষ্ট্রের সহিত স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি-

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক্ষমতা

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার প্রতিবন্ধক

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতার পরিধির স্বল্প-পরিসরতা

সংক্রান্ত বিবাদ স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রের মত না থাকিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচার করিতে পারিবে না; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বিশেষভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর বিচার-অধিকার অর্পণ না করে তাহা হইলে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের উপর উহার কোন বিচার-অধিকার থাকিবে না। সুতরাং, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার ক্ষমতা নানাভাবে এবং নানা দিক্ দিয়া গণ্ডিবদ্ধ একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর বিচারালয়ের ৩৬নং স্টাট্যুট যাহা **Optional clause** নামে পরিচিত উহা এমনভাবে রাষ্ট্রবর্গ গ্রহণ করিয়াছে যাহার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোন বাধ্যতামূলক বিচার-অধিকারের (**compulsory jurisdiction**) অধীনে কোন রাষ্ট্রকে আনা সম্ভব হয় নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিচারা-লয়ের অধিকার শর্তাধীনভাবে স্বীকার

Optional clause

ফলে লীগের আমলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কেবল কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারযোগ্য কিনা এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কাজই করিয়াছিল। কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোন বিচার করিবার সুযোগ পায় নাই। একমাত্র জার্মানি-অষ্ট্রিয়ার শুল্ক সঙ্ঘ (**German-Austrian Customs Union**)-সংক্রান্ত বিবাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিচারালয় লীগ সনন্দের ১৪নং শর্তের দ্বারা এই বিচারে লীগ কাউন্সিলকে নিজ বিচার-সিদ্ধ মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদে অথবা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-উত্তেজনা নিরসনে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোন কার্যকরী কিছু করিতে পারে নাই।

লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রকৃত বিচারকার্য সম্পাদনের অসুবিধা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত যাবতীয় মন্তব্য প্রযোজ্য। ইহার দুর্বলতাও লীগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দুর্বলতার অনুরূপ।

বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দুর্বলতা

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice under U. N.) : আন্তর্জাতিক বিচারালয় মোট পনরজন বিচার-পতি লইয়া গঠিত হইবে, কিন্তু কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি

নিয়োগ করা চলিবে না। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন এবং ব্যক্তিগতভাবে উচ্চতম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ হইতে বিচারক নিয়োগ করিতে হইবে। যে সকল দেশ হইতে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে সেই সকল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হইবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাঁহাদের থাকা চাই।

সংগঠন ও বিচারপতির যোগ্যতা

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। এই সকল বিচারপতি Permanent Court of Arbitration-এর অন্তর্ভুক্ত যে সকল জাতীয় প্রতিনিধি দল (national groups) আছে তাহাদের দ্বারা মনোনীত একটি নামের তালিকা হইতে নির্বাচিত হইবেন। অবশ্য কোন জাতীয় প্রতিনিধি দলই চারিটির বেশি নাম এই তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে না এবং কোন একটি দেশ হইতে দুইটির অধিক নাম দেওয়া চলিবে না। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্সের সেক্রেটারি এই তালিকা সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পেশ করিবেন। বিচারপতি নির্বাচনের অন্তত তিন মাস পূর্বে সেক্রেটারি সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদকে বিচারপতি নির্বাচনের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন। যে সকল ব্যক্তি সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারাই বিচারপতি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে। নির্বাচিত বিচারপতির কার্যকাল হইল নয় বৎসর, প্রত্যেক এক-তৃতীয়াংশ তিন বৎসর পর পর অবসর গ্রহণ করিবেন। এজন্য সর্বপ্রথম যখন বিচারালয় গঠিত হইবে তখন প্রথম তিন বৎসর পর কাহারা অবসর গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের নাম লটারী করিয়া নির্ধারিত হইবে। অনুরূপ প্রথম ছয় বৎসর পর আরও এক-তৃতীয়াংশ লটারী দ্বারা নির্ধারিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। একবার অবসর গ্রহণের পর পুনরায় নির্বাচনের কোন বাধা নাই।

বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক বিপদ বা যে বিবাদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে সেইরূপ বিবাদের মীমাংসা আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক মীমাংসিত হইতে পারে না। বস্তুত কোন রাষ্ট্রই

নিরঙ্কুশভাবে নিজ রাজনৈতিক বিবাদের বিচারভার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হস্তে দিতে সম্মত নহে। এমতাবস্থায় পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখিবার নির্দেশ অথবা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কোন-প্রকার অভিমত চাহিলে সেই অভিমত দেওয়া—এই ধরনের কাজই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর বর্তাইয়াছে। ইহার অধিক কিছু আন্তর্জাতিক বিচারালয় করিতে সক্ষম নহে। এই কারণে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইরাণী সরকার এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানির প্রচলিত চুক্তি উপেক্ষা করিয়া, উহা জাতীয়করণ করেন তখন ইংলণ্ড আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইলে এই বিচারালয় ইহার বিচার করিতে অসম্মত হয়। কারণ আন্তর্জাতিক বিচারালয় এই বিবাদে মীমাংসা করিতে গেলে স্বভাবতই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) বজায় রাখিবার অর্থাৎ এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানি ব্রিটেনের অধিকারে থাকিবে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত। অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইরাণ সরকারের পক্ষে এই তৈল কোম্পানি জাতীয়-করণের যুক্তি উপেক্ষা করিতে হইত। এই কারণে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এই বিবাদের বিচার করিতে অস্বীকৃত হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার স্বল্প-পরিসরতাই এজন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার পরিধি

এ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানি-সংক্রান্ত বিচারে অসম্মতি

আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিচার না করিয়া (১) ন্যায় এবং সততার ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকে। (২) পূর্বতন ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৩) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শমূলক অভিমত চাহিলে তাহা দিয়া থাকে। এগুলিই হইল আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কর্তব্যের সীমা। সুতরাং আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসায় আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে কার্যকরী কিছু করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রকৃত ক্ষমতা

(৬) দপ্তর (Secretariat): ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর একটি দপ্তর (Secretariat) আছে। এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারী এই দপ্তরের কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সেক্রেটারি-জেনারেল ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকরী করিয়া থাকেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর দপ্তর (U. N. Secretariat)

সুপারিশক্রমে জেনারেল এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারি-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এরূপ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারি-জেনারেল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। বৎসরে একবার করিয়া তিনি বাৎসরিক কার্যবিবরণী সাধারণ সভা বা জেনারেল এ্যাসেম্বলীর নিকট পেশ করিয়া থাকেন।

সেক্রেটারি-জেনারেল (Secretary-General)

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কার্যকলাপ (Work of the United Nations): ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে গিয়া স্বভাবতই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌কে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্যের মধ্যে প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ রাষ্ট্রবর্গের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স কাজ করে। যুদ্ধরত রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘটানও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অন্যতম কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তন যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে করা যাইতে পারে সেজন্য সাহায্য করাও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কর্তব্য। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সেগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং আন্ত-র্জাতিকক্ষেত্রে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রমাত্রেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসাধন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষমাত্রকেই মানুষের অধিকারে স্থাপন করিবার চেষ্টা, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর উন্নতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করাও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কর্তব্য-কার্যের মধ্যে গণ্য। চতুর্থত, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহ-অবস্থানের মনোভাব জাগাইয়া তোলাই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর দায়িত্ব।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কর্তব্য-কার্যাদি

এই সকল কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ গত ২৭ বৎসর যাবৎ কি কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর

কার্যকলাপ যদিও পূর্ণমাত্রায় সন্তোষজনক বলা যায় না, তথাপি উহার কার্যাদি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহু বিপদ দূর করিতে এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। (১) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ই জানুয়ারি) ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পরস্পর চুক্তি অনুযায়ী রুশসৈন্য ইরাণে মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানেও সেই সৈন্য অপসারিত না হওয়ায় ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে শেষ পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে এই বিবাদের অবসান ঘটে। ফলে সোভিয়েত সৈন্যও ইরাণ হইতে অপসরণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরাণের অভিযোগ

(২) সিরিয়া ও লেবাননে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। সেই সৈন্য অপসরণের জন্য সিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট আবেদন করিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য শীঘ্রই অপসারিত হউক সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয় নিজ নিজ সৈন্য অপসারণ করিয়া লইলেন।

সিরিয়া ও লেবানন

(৩) রাশিয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের পরোক্ষ পন্থাস্বরূপ। কিন্তু গ্রীক সরকার কর্তৃক আহূত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছে—এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইলে এবিষয়ে আর কোন কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করা হয় নাই।

গ্রীস

(৪) চেকোস্লোভাকিয়ার বিপ্লবের ফলে সরকার পরিবর্তিত হইলে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশ কমিউনিস্ট্‌গণ নানাপ্রকার গোলমাল সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার প্রতিকারকল্পে চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট অভিযোগ করে। সিকিউরিটি কাউন্সিল এবিষয়ে তদন্ত করিতে চাহিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাধাদানের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না।

চেকোস্লোভাকিয়া

(৫) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ওলন্দাজ সরকার শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লইয়া এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকরী রহিল না। ওলন্দাজ সরকার সামরিক সাহায্য লইয়া ইন্দোনেশীয়দের দমন করিতে চাহিলেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল উভয়পক্ষকে

যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আদেশ দিল। কিন্তু এই আদেশ কোন পক্ষই মানিল না। সিকিউরিটি কাউন্সিল তিনজন সদস্যের এক কমিটির উপর ইন্দোনেশিয়ার গোলযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভার অর্পণ করিল। এই কমিটি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে সম্মত করাইলে কিছু কাল ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু ওলন্দাজবাহিনী আকস্মিক-ভাবে ইন্দোনেশীয় নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিল। প্রেসিডেন্ট্ সুকর্ণও বাদ পড়িলেন না। এমতাবস্থায় সিকিউরিটি কাউন্সিল ওলন্দাজ সরকারকে ইন্দোনেশীয় প্রজা-তন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত করাইলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সদস্যপদভুক্ত হইল।

ইন্দোনেশিয়া

(৬) কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ব্যাপারে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দান করিয়া শেষপর্যন্ত পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে উহা হইতে সৈন্য অপসরণের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে নাই। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কোন স্তরেই ন্যায্য নীতি অনুসরণ করিয়াছে একথা বলা যায় না।

কাশ্মীর

(৭) কোরিয়ার যুদ্ধ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ (Korean War & the U. N): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক দশক পূর্ব হইতে কোরিয়া জাপানের অধীন ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো কন্‌ফারেন্সে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন স্থির করে যে, কোরিয়াকে জাপানের অধিকারমুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সোভিয়েত রাশিয়া যখন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কায়রো কন্‌ফারেন্স-এর সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সরকারও মানিয়া লইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্থির হইল যে, কোরিয়ার উত্তরাংশ অর্থাৎ ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার উত্তরের অংশ রাশিয়ার নিকট এবং উহার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ফলে যুদ্ধাবসানে কোরিয়া দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক এই দুই অংশের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা চলিল।

কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়ার উত্তরাংশের রাশিয়ার এবং দক্ষিণাংশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ

কিন্তু সেই বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারার ফলে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর নিকট পেশ করিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর জেনারেল এ্যাসেম্বলী একটি কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ায় এক নির্বাচনের মাধ্যমে কোরিয়ার সরকার গঠন করিবার এবং সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ প্রস্তাব করিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিশনের উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিল। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিশন কেবলমাত্র দক্ষিণ-কোরিয়ারই নির্বাচন সম্পন্ন করিল এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণ-কোরিয়াকে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদভুক্ত করা হইল। নবগঠিত দক্ষিণ-কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট্ হইলেন সিঙ্‌ম্যান রী। উহার রাজধানী হইল সিওল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-কোরিয়ায় 'গণ'-তান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democratic People's Republic) নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করিল। এইভাবে কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যুদ্ধের হুম্‌কি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুন উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ উত্তর-কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশ-সম্বলিত এক প্রস্তাব পাস করিল এবং সকল সদস্যরাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্য সাহায্যদানের অনুরোধ জানাইল। কিন্তু উত্তর-কোরিয়ার সেনাবাহিনী সহজেই দক্ষিণ-কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ও সদস্যরাষ্ট্রবর্গকে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে এবং শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রেরণের নির্দেশ দিলে মোট ষোলটি দেশ কোন-না-কোন প্রকার সামরিক সাহায্য প্রেরণ

কোরিয়ার ঐক্য সমস্যা

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার ঐক্যের প্রস্তাব—রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য

উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পৃথক শাসনব্যবস্থা

উত্তর-কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌ কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়াকে সাহায্যদান

করিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে আগত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু কমিউমিস্ট চীন উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। জেনারেল এ্যাসেম্ব্লী চীন দেশকে 'আক্রমণকারী' দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীন দেশে কোনপ্রকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ নিষিদ্ধ করিল। রাশিয়া অবশ্য উত্তর-কোরিয়াকে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করিতে দ্বিধা করিল না। যাহা হউক, দুই বৎসর যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক লোকক্ষয় ও নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা ঘটিলে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চলিল। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট্ সিঙ্ম্যান রী সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য এবং কমিউনিস্ট্-বিরোধী সরকার গঠনসম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া অস্ত্রত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং কমিউনিস্ট্ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে সিঙ্ম্যান রী যুদ্ধত্যাগে রাজী হইলেন। উত্তর-কোরিয়া কমিউনিস্ট চীন ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর মধ্যে ৫৭৫টি বৈঠকের পর পানমুন্জন নামক স্থানে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার লাইন ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার রাজ্যসীমা বিভক্ত হইল। উভয় পক্ষ যুদ্ধবন্দীদের ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৬০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে স্থির হইল। ভারতের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী-বিনিময়ের ভার ন্যস্ত হইল। এই কমিশনের সদস্য ছিল পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইট্জারল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া। এই কমিশনের কার্যাদি উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পরস্পর বিবাদের ফলে অত্যধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় এবং অপরাপর প্রতিনিধিবর্গের ধৈর্য এবং উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত বন্দী-বিনিময়ের কঠিন দায়িত্ব পালন সম্ভব হইয়াছিল।

উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীন দেশের যুদ্ধে যোগদান

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

বন্দী-বিনিময় সমস্যা

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতি-নিধিদের কন্ফারেন্সে কোরিয়ার সমস্যা সমাধান এবং বিদেশী সৈন্যের অপসারণের

কোরিয়ার যুদ্ধ
সোভিয়েত
ইউনিয়ন
ভ্লাডিভস্টক
মুক্‌ডেন
টাংহোয়া
উঃ কোরিয়া
সিনুইজু
হাংনাম
সিনানজু
পাইয়োংগাং
জাপান সাগর
৩৮°
৩৮°
পানমুনজম
ইন্‌চন
সিওল
দঃ কোরিয়া
তেইজন
পোহাং
কুসান
তেইগু
মাসান
চিনজু
পুসান

জেনিভা কন্‌ফারেন্স—কোরিয়ার সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা
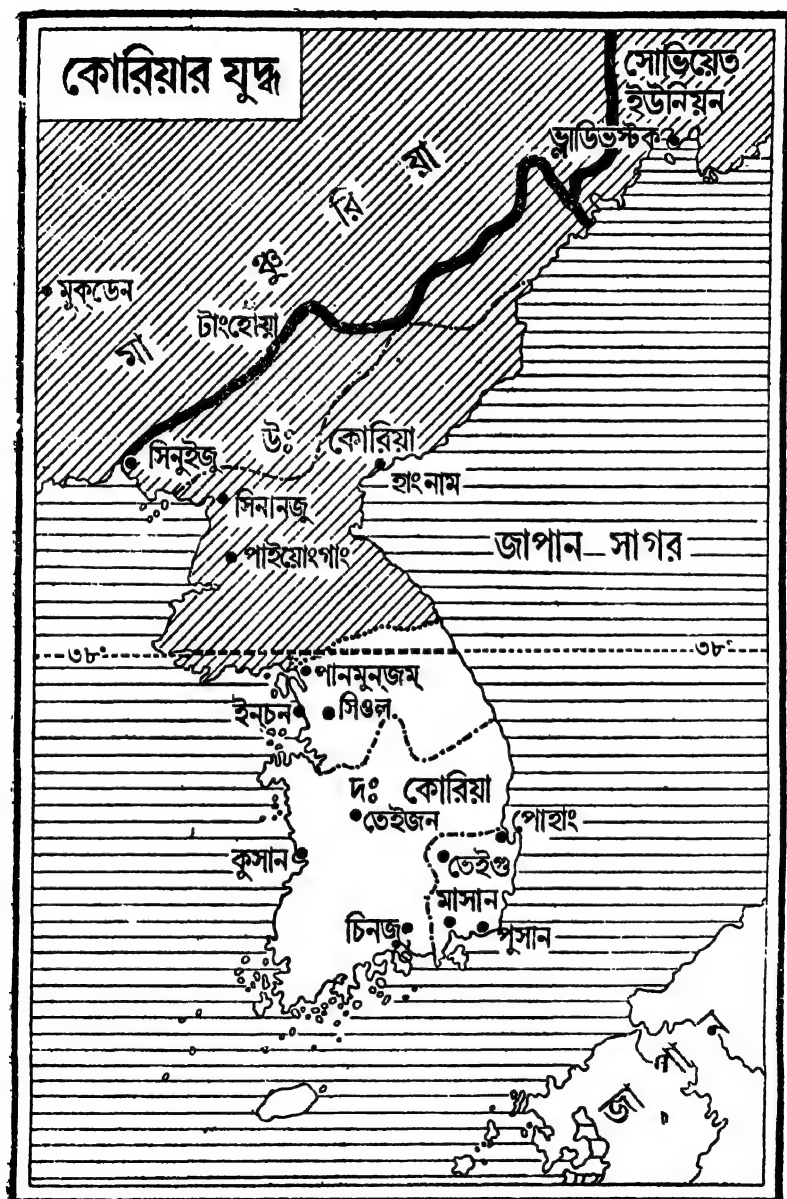
প্রশ্নের মীমাংসা হইবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই কন্‌ফারেন্স জেনিভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে কোরিয়ার ঐক্যের প্রশ্নের কোন সমাধান করা সম্ভব হইল না।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভাইলে এক ব্যাপক জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দিলে বেলজিয়াম সরকার ছয় মাসের মধ্যে কঙ্গো ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু জুন মাসে কঙ্গো স্বাধীন হইলে বিভিন্ন উপদলীয় নেতাদের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে বেলজিয়াম সৈন্যদলের যে-অংশ তখনও কঙ্গোয় অবস্থান করিতেছিল তাহাদের প্ররোচনায় কঙ্গোর অন্যতম প্রদেশ কাতাঙ্গা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ উহার সেক্রেটারি-জেনারেলকে প্রয়োজনবোধে কঙ্গো সরকারকে সামরিক সাহায্যদানে অগ্রসর হইতে ক্ষমতা দান করিল। এদিকে

কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা

কঙ্গো-কাতাঙ্গা অন্তর্দ্বন্দ্ব

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কার্যকলাপ

কঙ্গো-কাতাঙ্গা দ্বন্দ্বে বেলজিয়াম সৈন্য কাতাঙ্গার পক্ষ অবলম্বন করিল। সেক্রেটারি-জেনারেল হেমারশিল্ড্ বাধ্য হইয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর পক্ষে একদল নিরপেক্ষ সৈন্য কঙ্গোয় প্রেরণ করিলেন। ইহাতে ভারতীয় সৈন্যও ছিল। যাহা হউক, হেমারশিল্ড্-এর সনির্বন্ধতায় কঙ্গো ও বেলজিয়াম সৈন্যদের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা হইল। সেই সূত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে বিমানযোগে যাইবার কালে এক দুর্ঘটনায় হেমারশিল্ড্-এর মৃত্যু ঘটে। কাতাঙ্গা ইহার জন্য দায়ী ছিল বলিয়া মনে করা হয়। যাহা হউক, এদিকে কঙ্গো সরকার কাতাঙ্গার বিদ্রোহী নেতা শোম্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত আক্রোশীয় প্রতিনিধিবর্গের চেষ্টায় কাতাঙ্গার বিরুদ্ধে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ প্রেরিত সেনাবাহিনীকে কঙ্গো সরকারকে সাহায্যদানের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাতাঙ্গার নেতা শোম্বে কঙ্গো সরকারের সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে কঙ্গো-কাতাঙ্গা অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এই ব্যাপারে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সাহায্যে কঙ্গো-কাতাঙ্গার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কার্যকারিতা (Usefulness of the U.N.) : আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান জগতে

যে খুব বেশী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবী যখন সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা শান্তি ও নিরাপত্তা—এই দুই বিকল্প পন্থার সম্মুখীন তখন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের হস্তে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা দান করিয়া এবং অপরাপর রাষ্ট্রবর্গকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমাত্রেরই সমতার নীতির বিরোধিতা করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রের আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও কুয়োমিং-তাং চীনের, ইদানীং চীনের হস্তে, 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া এই কয়েকটি রাষ্ট্রের কোন একটির অমতে কোন সুযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ এর সদস্য মাত্রেই সার্বভৌম এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন—এই নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কোন দেশের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইতে পারে না। তদুপরি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ ত্যাগ করিয়া যাইবার পক্ষেও কোন বাধা নাই। এই সকল কারণে এবং সর্বোপরি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রাজনৈতিক স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত বিভেদ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স-এর দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ইহাকে দৃঢ়তর করিবার মধ্যেই আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় নিহিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনাই-টেড্ ন্যাশন্স্-এর কার্যকলাপে ত্রুটি থাকিলেও মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য

'ভিটো' ক্ষমতা

সমালোচনা

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ (The League of Nations & the U. N.): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর মধ্যে কতক পার্থক্য থাকিলেও এই দুই-ই একই ধরনের পরিস্থিতি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উভয়েরই সংগঠন, দোষ-ত্রুটি প্রভৃতির মধ্যে কতক কতক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এজন্য ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এরই অনুকরণ মাত্র।

সামঞ্জস্য ও পার্থক্য দুই-ই বিদ্যমান

সামঞ্জস্যের দিক দিয়া বিচার করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এ যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তেমনি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য রহিয়াছে। বস্তুত লীগ-অব ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ উভয়ই বিজয়ী শক্তি-বর্গের সমিতিস্বরূপ।

সামঞ্জস্য : উৎপত্তি

সংগঠনের দিক দিয়াও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। লীগের এ্যাসেম্‌ব্লী বা সভা, কাউন্সিল, দপ্তর, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভা, সিকিউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদ; দপ্তর ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি মোটামুটি একই ধরনের।

সংগঠন

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান ব্যাপারে অনুরোধ-উপরোধ, আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতার গুরুত্ব লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ উভয়ই স্বীকার করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর Trusteeship System লীগ্-অব-ন্যাশন্‌স্-এর ম্যাণ্ডেট পদ্ধতিরই অনুরূপ।

Trusteeship System and Mandate System

মূল আদর্শ—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা লীগ এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ উভয়েরই এক।

মূল আদর্শ

উপরি-উক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর মধ্যে নানাবিষয়ে পার্থক্য আছে। এই সকল পার্থক্যের কতকগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ অপেক্ষা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, আবার কতক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ হইতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অপকর্ষতা সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

পার্থক্য

(১) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র (Covenant) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ফলে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে লীগ্-অব-ন্যাশন্‌স্ এর চুক্তিপত্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও পবিত্রতা স্বভাবতই বিনষ্ট হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার কোন শান্তি-চুক্তির অংশ নহে। ইহা পৃথকভাবে রচিত ও গৃহীত। ফলে, শান্তি-চুক্তিসমূহের সহিত ইহার

স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব নির্ভরশীল নহে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনের স্বীকৃতি হিসাবেই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ গঠিত।

(২) ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর কার্যাদি বিভিন্ন সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকায় উহার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু লীগ-অব্-ন্যাশন্স্-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার এরূপ অকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হয় নাই।

(৩) লীগ-অব-ন্যাশন্স্ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে গঠিত হইলেও কোন একই সময়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ উহার সদস্যপদভুক্ত ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে নাই। রাশিয়াকে উহাতে দীর্ঘকাল স্থান দেওয়া হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ একমাত্র কমিউনিস্ট্ চীন ভিন্ন পৃথিবীর সকল বৃহৎ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হইতেই ইহার সদস্যপদভুক্তি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

(৪) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে পৃথিবীর ও 'মানবগোষ্ঠী'র উন্নতিসাধনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহা অধিকতর গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়াছে। জনসাধারণের সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকিলেও লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্রে যেমন বিভিন্ন 'সরকারের' কথা উল্লিখিত আছে, সেরূপ কোন উল্লেখ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে না থাকায় উহার প্রতি পৃথিবীর জনসাধারণের শ্রদ্ধা স্বভাবতই জাগিবার সুযোগ রহিয়াছে।

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ অপেক্ষা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর উৎকর্ষতা

(৫) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সাধারণ সভা ও অপরাপর সভা-সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য দান করিয়া দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নীতি লীগের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল।

(৬) লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর যুদ্ধ-নিরোধ-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং সদস্যরাষ্ট্রবর্গের এবিষয়ে দায়িত্ব বহুগুণে বেশি।

(৭) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে যুগ্ম-নিরাপত্তা নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অথবা যুদ্ধের ভীতির সৃষ্টি হইলেই ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ হস্তক্ষেপ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্ কেবল-

মাত্র আক্রমণের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপের অধিকার-প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপরও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে।

(৮) লীগ চুক্তিপত্রে (Covenant) লীগ-কাউন্সিল ও এ্যাসেম্ব্লীকে একই প্রকার ক্ষমতা দান করা হইয়াছিল। চুক্তিপত্র রচয়িতাগণ মনে করিয়াছিলেন যে, যেহেতু কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা কম সেহেতু প্রকৃতক্ষেত্রে কাউন্সিলই এ্যাসেম্ব্লী অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী সংস্থায় পরিণত হইবে। কিন্তু লীগের আমলে এ্যাসেম্ব্লীর ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কারণ উহা ছিল অধিকতর প্রতিনিধিমূলক। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ সাধারণ সভার ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রধানত নিরাপত্তা পরিষদের উপর দিয়াছে। ফলে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক সাধারণ সভার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

লীগের তুলনায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অপকর্ষতা

কোন কোন বিষয়ে লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অপকর্ষতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। (১) লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদভুক্তির পদ্ধতি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদভুক্তির পন্থা অপেক্ষা বহুগুণে উদার। নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইদানীং অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা দশ করা হইয়াছে। কিন্তু লীগ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লীগ এ্যাসেম্ব্লীকে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির এবং সদস্য মনোনয়নের পদ্ধতি-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।* (২) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সদস্য-রাষ্ট্রবর্গের দায়িত্ব যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত সেরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারে নাই। (৩) আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ তথা উহার সদস্যরাষ্ট্রের কোন কিছু করিবার নাই। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক বা না হউক, অর্থনৈতিক অবরোধ সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবার দায়িত্ব লীগের তথা সদস্যরাষ্ট্রবর্গের ছিল।

---

* **Vide Hartmann : The Relations of Nations, pp. 191-92.**

নীতির দিক দিয়াও লীগ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর মধ্যে কতক পার্থক্য আছে। লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর রচয়িতাগণ নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক দুর্বলতার কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। শান্তি রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের অপরিহার্যতা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এ স্বীকৃত নহে।

নীতিগত পার্থক্য

মানুষকে মানুষের অধিকারে স্থাপনের প্রয়াসও ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এ যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ ছিল না। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ স্বীকৃত 'মানব-অধিকার' (**Human Rights**) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ মূলত একই ধরনের প্রতিষ্ঠান। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর কার্য, ক্ষমতা, আদর্শ, গঠনতন্ত্রের অনেক কিছুতেই লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

লীগ-অব-ন্যাশন্স্ ও ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanctions under the League of Nations and United Nations) : শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা যখন সম্ভব হয় না তখন দোষী বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ৩৯—৫১ নং ধারায় বর্ণিত আছে।

লীগের ১৬ নং এবং ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ৩৯—৫১ নং শর্ত

লীগের ১৬ নং ধারা অনুসারে যে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয় অথবা লীগ কাউন্সিলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসায় রাজী না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, সেই রাষ্ট্রকে লীগের সকল সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিবার জন্য দায়ী করা হইবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেই রাষ্ট্রের সহিত লীগের অপরাপর সদস্যরাষ্ট্র আর্থিক, বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত কোনপ্রকার আদান-প্রদান হইতে বিরত থাকিবে। দোষী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সেই সিদ্ধান্ত লীগ কাউন্সিল গ্রহণ করিবে এবং সেজন্য কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনী দ্বারা সাহায্য দান করিবে তাহা লীগ কাউন্সিল স্থির করিবে। দোষী রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক ও আর্থিক আদান-প্রদান বন্ধ করিবার ফলে যাহাতে

লীগের চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সদস্যরাষ্ট্রের কোনটির অসুবিধা না ঘটে সেজন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরস্পর বাণিজ্যিক ও আর্থিক আদান-প্রদান ও সাহায্য-সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং লীগের সামরিক বাহিনীর সুবিধার্থে নিজেদের রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। লীগের চুক্তিপত্র (Covenant) ভঙ্গকারী দেশকে লীগের সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

লীগের চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারার ব্যাখ্যা* করিতে গিয়া যে-সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাতে কোন রাষ্ট্র লীগের চুক্তিপত্র ভঙ্গ করিয়াছে কি না তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, কোন্ রাষ্ট্র কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য দিবে তাহাও সেই সকল রাষ্ট্রই স্থির করিবে। ফলে লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব কেবলমাত্র সদস্যরাষ্ট্রবর্গের নিকট আবেদন করায় পর্যবসিত হইয়াছিল। স্বভাবতই ১৬ নং শর্তের কোন প্রকৃত মূল্য আর ছিল না। লীগ কাউন্সিলও একমাত্র ইতালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কালে ইতালির বিরুদ্ধে ১৬ নং শর্তানুযায়ী অর্থনৈতিক অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

১৬ নং ধারার বিশ্লেষণ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর সুনির্দিষ্ট, কার্যকরী এবং ব্যাপক। ৩৯ নং ধারায় কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে কি না তাহা নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করিবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবে। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে তাহা ৪১ ও ৪২নং ধারায় বর্ণিত আছে। ৪১নং ধারায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক, ডাক, তার, বিমান চলাচল, রেলপথের যোগাযোগ, রেডিও যোগাযোগ প্রভৃতি ছিন্ন করা যাইতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তি প্রয়োগও করা যাইতে পারিবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৪১নং ধারা অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকরী না হইলে জল, স্থল এবং বিমান পথে আক্রমণ, সামরিক অবরোধ প্রভৃতি করা চলিবে। এজন্য ইউনাইটেড্

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনন্দে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

---

* "The Second Assembly in 1921, had adopted a series of nineteen resolutions bearing upon Article 16, the effect of which was generally to weaken the provisions of the Covenant in regard to Sanctions." Gathorne Hardy, A Short History of International Affairs, pp. 66-67.

ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যরাষ্ট্রবর্গ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সামরিক সাহায্য, সামরিক বাহিনীর চলাচলের সুযোগ প্রভৃতি দানে রাজী থাকিবে। অবশ্য এই ব্যাপারে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র তাহাদের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিবে। (৪৩ নং শর্ত)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিরাপত্তা পরিষদ (১) কোন্ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা স্থির করিবে, এখানে লীগের সদস্যদের ন্যায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যগণের নিজস্ব কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই। (২) অর্থনৈতিক বা সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সদস্যরাষ্ট্রবর্গ তাহাদের চুক্তি অনুসারে সামরিক সাহায্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী দিতে প্রস্তুত থাকিবে। যে রাষ্ট্র যে ধরনের সামরিক সাহায্য দানে চুক্তি বা অঙ্গীকারাবদ্ধ সেই ধরনেব সামরিক, নৌ বা বিমান বহরের সাহায্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে দিবে। এইটুকু ভিন্ন, সদস্য-রাষ্ট্রবর্গের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিবার সুযোগ নাই। লীগের আমলে কাউন্সিলের ক্ষমতার যে ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছিল সেরূপ কিছু ইউনাই-টেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর অধীনে নাই।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেব ক্ষমতা

প্রকৃতক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রবর্গ নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চলিলে নিরাপত্তা পরিষদের কার্য ব্যাহত করিতে পারে, অবশ্য ইহা ঘটিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এব অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে। কোরিয়ার যুদ্ধে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ নিজ দায়িত্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করিবার পর যে রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতা সেখানে দেখা দিয়াছিল সেখানেও শান্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং সেই সূত্রে সামরিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর সামরিক বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল।

কোরিয়ায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর দায়িত্বে সৈন্য প্রেরণ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর ৫১নং ধারায় যে-কোন রাষ্ট্র নিজ নিরাপত্তা রক্ষার্থ উপযুক্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং সম্মিলিত বা সমবেতভাবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। এই বিষয়ে ইউ-নাইটেড্ ন্যাশন্‌স্‌-এর অপর কোন শর্তই বাধার সৃষ্টি করিবে না। এই ধারার ব্যাপক অর্থ করিলে 'সমবেত আত্মরক্ষা' (Collective defence)

শান্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক

কি রূপ গ্রহণ করিবে বলা কঠিন। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই শর্ত কতকটা প্রতিবন্ধকস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, লীগের ১৬নং ধারার তুলনায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর ৩৯—৪২নং ধারা অধিকতর কার্যকরী।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এ ভিটো প্রয়োগ (The Veto under the U. N.): ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর প্রস্তুতিপর্বে যে সকল ঘোষণা ও আলোচনা করা হইয়াছিল সেগুলির মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনন্দ রচিত হইয়াছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মস্কোতে রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রকেই সমান এবং সার্বভৌম মর্যাদায় স্থাপনের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু ডাম্বার্টন ওক্‌স্ কন্‌ফারেন্সে (১৯৪৪) যখন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনন্দ রচনার কাজ শুরু হয় তখন 'ভিটো'র প্রশ্ন ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে (১৯৪৫) শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সকলকে ভিটো (Veto) প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ভিটো ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিহাস

সুতরাং প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভিটো প্রয়োগ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যরাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌম সমতা (Sovereign equality) নীতির বিরোধী। ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা দিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই উহা দেওয়া উচিত ছিল। কেবলমাত্র পাঁচটি স্থায়ী সদস্যকে এই ক্ষমতা দিবার ফলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ কতকটা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইয়াছে।

ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনন্দে ২৭নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তমাত্রেই মোট সাতজন সদস্যের সম্মতির উপর নির্ভর করিবে। এই সাতজনের মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের—আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন—সম্মতি অবশ্যই থাকা চাই।

ভিটো প্রয়োগ পদ্ধতি

(১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার লড়াই বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ভিটো পদ্ধতি সেই ক্ষমতা-ই বিনাশ করিয়াছে। কারণ স্থায়ী সদস্যদের যে-কোন একটির কোনপ্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেই উহা ভিটো প্রদান করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। ফলে ক্ষমতার লড়াই নিরাপত্তা পরিষদের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোন স্থায়ী সদস্যের উপর কোনপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইলেও তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কারণ যে-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা যে-রাষ্ট্রের সমর্থকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা হইবে সেই রাষ্ট্র ভিটো দ্বারা সেই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিতে পারিবে।

সমালোচনা

স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বাধা

(২) নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকলাপ বস্তুত কেবলমাত্র মাঝারি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর কার্যকর হইতে পারিবে। এখানেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান জগতে রাষ্ট্রবর্গ প্রায়ই জোটবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, মাঝারি বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেগুলির সহায়ক স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র, অর্থাৎ রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স বা চীন, ভিটো প্রদান করিয়া ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনদ অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে।

মাঝারি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর কার্যকারিতা প্রায় বাধাপ্রাপ্ত

(৩) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সনদের ৫১নং ধারা অনুসারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ যতক্ষণ না এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে ততক্ষণ জোটবদ্ধ-ভাবে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে—এই নীতি স্বীকৃত। কিন্তু এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক রাষ্ট্রজোটে যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যোগদান করে তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলে সেই রাষ্ট্র ভিটো প্রয়োগ করিয়া তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারিবে। ফলে, নিরাপত্তা পরিষদের যে ক্ষমতা ৫১নং ধারায় স্বীকৃত তাহা অকার্যকর হইয়া পড়িবে।

৫১ নং ধারা বিরোধী

ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর স্থাপনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত ক্রমেই হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর অর্থাৎ

প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে ২৩ বার ভিটো প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী চার বৎসরে মোট ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ৪৮। পরবর্তী দশ বৎসরে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ছিল ৭৭। এইভাবে ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। হার্টম্যান-এর মতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অন্তঃস্থল হইল নিরাপত্তা পরিষদ। ইহার কার্য-কলাপ কেবলমাত্র অধিকাংশ ভোটের ভিত্তিতে নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এজন্য ভিটো প্রয়োগ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভিটো প্রয়োগের বিষয় এবং ক্ষেত্র যদি সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে ভিটো প্রথা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হইবে বলিয়া হার্টম্যান মনে করেন।

ভিটো প্রয়োগের সংখ্যা

হার্টম্যান-এর মত

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Problem of Disarmament): বিজ্ঞানের অবদানকে যুদ্ধের কাজে খাটাইতে গিয়া আজ সমগ্র পৃথিবী এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার তেজস্ক্রিয়তার কুফলে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর রাষ্ট্র-বর্গের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব, পরস্পর অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ আজ সমগ্র পৃথিবীকেই যেন এক বিরাট যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত করিয়াছে। যে কোন কারণে যুদ্ধের চাপের (War tension) সৃষ্টি হইতেছে। পৃথিবী আজ পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকে বিভক্ত। এই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর প্রয়োজনীয়তা এই কারণেই সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্রে যেমন নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-রক্ষার অপরিহার্য উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছিল সেরূপ কোন নীতি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বরঞ্চ প্রত্যেক রাষ্ট্রই সামরিক শক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি অর্জনে মনোনিবেশ করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের পরস্পর সন্দেহ, বিবাদ-বিসংবাদ সামরিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীকে সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের ফলে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আণবিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বীকার করিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবধর্মিগণ আণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণই পৃথিবীর নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে কার্যকরী করাই একমাত্র উপায় বিবেচনা করিয়া ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্-এর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬-এর জানুয়ারি মাসে 'পারমাণবিক শক্তি সংস্থা বা কমিশন' (Atomic Energy Commission) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করা হয়। সেই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবর্গের প্রত্যেকের একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং কানাডার একজন প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা কর্তৃক এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল : (১) শান্তির পরিপন্থী নহে এরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বিভিন্ন দেশকে সরবরাহ করা, (২) পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উহার কেবল শান্তিমূলক ব্যবহার যাহাতে সম্ভব হয় সেই ব্যবস্থা করা, (৩) প্রত্যেক রাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অপরাপর প্রধান প্রধান অস্ত্রশস্ত্র, যেগুলির মারণ-ক্ষমতা অত্যধিক সেগুলি সম্পূর্ণভাবে হ্রাস করা, (৪) কোন রাষ্ট্র যাহাতে গোপনভাবে পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি না করে সেজন্য পরিদর্শন এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

পারমাণবিক শক্তি কমিশন স্থাপন

ইহার তিনমাস পর অপরাপর যুদ্ধাস্ত্র যাহা বিভিন্ন দেশ প্রস্তুত করে এবং ব্যবহারের জন্য মজুত রাখে সেই সকল প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা 'প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন' (Conventional Armaments Commission) নামে একটি কমিশন স্থাপন করে।

প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন

ঐ বৎসরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে যে, যদি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ একক-ভাবে পারমাণবিক শক্তির যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ নিজ হস্তে গ্রহণ করে তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতের যাবতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দিবে এবং নিজ অধিকারে যে সকল বোমা আছে তাহা বিনাশ করিয়া দিবে। রাশিয়া পাল্টা প্রস্তাব করিল যে, আণবিক বোমা প্রস্তুত নিষিদ্ধ করা হউক এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সকল দেশ নিজ নিজ পারমাণবিক বোমা বিনাশ করুক। ইহা ভিন্ন কোন দেশ পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করিতেছে কিনা তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরি-দর্শনের ব্যবস্থা করা হউক। এই দুই প্রস্তাবের আলোচনায় নানাপ্রকার জটিলতা

মার্কিন ও রুশ প্রস্তাব

প্রকাশ পাইলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে স্থির হয়।

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট

ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন একাদিক্রমে তিনটি রিপোর্ট আন্ত-র্জাতিকভাবে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও উহার অন্যায়মূলক প্রসার নিরোধকল্পে পরিদর্শন সম্পর্কে সুপারিশ করিল। সাধারণ সভা পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে কাজ শুরু করিতে জানাইল। কিন্তু তদানীন্তন পবিস্থিতিতে এই কমিশনেব কাজে সাফল্য সম্পর্কে সকলেই সন্দিহান হইয়া উঠিল।

নূতন কমিশন

অল্পদিনের মধ্যেই (জানুয়ারি, ১৯৫২) প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যানের প্রস্তাবক্রমে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এব সাধারণ সভা 'পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন' এবং 'প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন'—এই দুইটি কমিশনকে একত্রিত কবে। এই নূতন কমিশন পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উভয কার্যই সম্পাদনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব

ঐ বৎসরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণেব এক প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে, (১) কোন্ দেশেব কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র (পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রসহ) আছে তাহার হিসাব মিলাইয়া দেখিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের অস্ত্র-শস্ত্রের সর্বোচ্চ পরিমাণ স্থির করিয়া উদ্‌বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিতে হইবে। (৩) পাবস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতেব পরিকল্পনা স্থির করিবে। (৪) কিভাবে নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করা হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে এবং (৫) নিরস্ত্রী-করণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়-তালিকা স্থির করিতে হইবে। রাশিয়া মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। পক্ষান্তরে একটি পাণ্টা প্রস্তাবে বীজাণুযুদ্ধ (Bacteriological Warfare) নিরোধকল্পে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপাবিশ করিল। সেই সময়ে কোরিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল। রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই যুদ্ধে জীবাণু ব্যবহারের দোষে দোষী করিল।

রুশ পাণ্টা প্রস্তাব

ঐ বৎসর (১৯৫২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করিল যে, চীন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ১,৫০০,০০০ অর্থাৎ পনর লক্ষ করুক।

ফ্রান্স ও ব্রিটেন যথাক্রমে আট লক্ষ ও সাত লক্ষ করুক। অপরাপর রাষ্ট্র তাহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিতে স্বীকৃত হউক। রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণের এই প্রস্তাবে পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর অনুপাত কি হইবে, অস্ত্রের ক্ষেত্রেই বা কি হইবে সেই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিল এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইল।

মার্কিন প্রস্তাব : রাশিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়া, উহার উপরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহিত গোপন আলোচনার মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব প্রস্তুত করিবার ভার দিল। এই সাব-কমিটির সদস্যসংখ্যা করা হইল পাঁচ। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত উনিশটি গোপন সভায় মিলিত হইল। পর বৎসরও (১৯৫৫) অনুরূপ বহু সভা হইল। এদিকে ঐ বৎসরই জুলাই মাসে জেনিভা শহরে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এক শীর্ষ সম্মেলন বসিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলে কোন কিছুই করা সম্ভব হইল না। শেষ পর্যন্ত এই শীর্ষ সম্মেলন নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যাবতীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন কার্যকরী কিছু করা সম্ভব কি না তাহা অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাইল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস ধরিয়া বৈঠকের পরও নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটি কোন উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইল না।

নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটি

নিরস্ত্রীকরণে ব্যর্থতা

এদিকে পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। স্বভাবতই পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি নিরোধকল্পে নানা চেষ্টা চলিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ আইসেনহাওয়ারের আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা (Atom for Peace) আণবিক শক্তিহ্রাসের কোন নূতন পন্থা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইল না, কারণ আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজন এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় নাই। আণবিক বোমা প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা অসম্ভব এবং নিছক প্রচারকার্য বলিয়াই রাশিয়া ধরিয়া লইল। এইভাবে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কোন সমাধান সম্ভব হইল না। যাহা হউক এবিষয়ে উভয়পক্ষ

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা

অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে থাকিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-নীতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। এমন কি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি হ্রাসের প্রস্তাবও উত্থাপন করিল। কিন্তু রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের ফলে এবিষয়ে কার্যকরী কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এইভাবে কোন পক্ষের প্রস্তাবই যখন অপর পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, তখন রাশিয়া সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ (Nuclear test) বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু আণবিক বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনও নিষিদ্ধ করা হউক সেই প্রস্তাব করিল। রাশিয়া এই পাল্টা প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইলে এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় রাশিয়া এককভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিতে রাজী হইল না (১৯৫৮)। ফলে, রাশিয়া অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিল। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও অনুরূপ ঘোষণা করিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে এই দুই দেশ স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। ইহার অল্প দিনের মধ্যেই (১৯৬০, মার্চ) জেনিভা শহরে পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের প্রতিনিধি-বর্গ আণবিক অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। আণবিক অস্ত্রাদি তৈয়ার নিষিদ্ধ করা, পরীক্ষামূলকভাবে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা এবং 'মিজাইল' (missiles) বা ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি শর্তসম্বলিত একটি প্রস্তাব এই সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। রুশ প্রতিনিধি মার্কিন প্রতিনিধির প্রস্তাবের একটি পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোট যদি আণবিক অস্ত্রাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে অর্থাৎ নিষিদ্ধ করে তাহা হইলে সোভিয়েত ইউনিয়নও আণবিক বোমা ও সংশ্লিষ্ট অস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ইহা ভিন্ন পর্যায়ক্রমে বৃহৎ পাঁচটি রাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকা,

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণসম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব

রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সাময়িক বিরতি

ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন (জাতীয়তাবাদী) সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবে এবং সামরিক ঘাঁটি মাত্রেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিরস্ত্রীকরণের শেষ পদক্ষেপ হিসাবে যাবতীয় আণবিক অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই পর্যায়ক্রমে নিরস্ত্রীকরণ মোট পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের পাল্টা একটি প্রস্তাব পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোট হইতে পেশ করা হইল। এই নূতন প্রস্তাবে বিভিন্ন ধরনের আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, গোপনে কোন দেশ কর্তৃক আণবিক অস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ, আণবিক অস্ত্র প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ, পরস্পর পরস্পরের সামরিক শক্তি, পদাতিক, বিমান, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন শর্ত সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু কোন পক্ষই অপর পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত না হইলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা পূর্ববৎ-ই রহিয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে বার্লিন সমস্যা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপ বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া পুনরায় আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়া মেগাটোন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শুরু করে। এই বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং মানুষের স্বাস্থ্যহানি হইবে সেজন্য বিভিন্ন দেশ উহার প্রতিবাদ জানায়। সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিয়াছিলেন যে, এই ধরনের বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল মানুষের মন এবং দেহ উভয়ই বিষাইয়া তুলিবে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট্ কেনেডি বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণের একমাত্র জবাব হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ বিস্ফোরণ শুরু করা।

জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (মার্চ, ১৯৬০)

রাশিয়া কর্তৃক মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণ

এদিকে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কিউবা-সংক্রান্ত বিবাদ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এক প্রকাশ্য সংঘর্ষের উপক্রম হইলে রুশ প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চভ্-এর দূরদর্শিতায় সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয়। তিনি কিউবা হইতে অস্ত্রনিক্ষেপক ঘাঁটি (Missile bases) উঠাইয়া লইয়া এই বিবাদের অবসান ঘটান। এই সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া যে যুদ্ধ চাহে না সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে এই দুই দেশের রাষ্ট্রনেতা প্রেসিডেণ্ট্ কেনেডি ও নিকিতা ক্রুশ্চভ্-এর মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। এই প্রীতির সূত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-

কিউবা-সঙ্কট: রুশ-মার্কিন প্রীতির সৃষ্টি

মূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক শীর্ষ সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বায়ুমণ্ডল, জল ও স্থলে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিয়া এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাম্যবাদী চীন ও ফ্রান্স বাদে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র এই প্রাথমিক সাফল্যকে অভিনন্দিত করিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গের অন্যতম। বর্তমানে আশা করা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রজোটের মধ্যে যেটুকু বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ক্রমে হয়ত সাফল্য লাভ করিবে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শীর্ষ সম্মেলন : পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের চুক্তি

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের দিকে তেমন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু ফ্রান্স ও চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর না করায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ এই দুই দেশ, বিশেষভাবে চীন চালাইয়া যাইতেছে। পর বৎসর (১৯৬৪) পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতকরণ নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বহুবার সম্মিলিত হইল। কিন্তু **NATO (North Atlantic Treaty Organisation)**-এর সদস্যবর্গ সেই সময়ে পারমাণবিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তাব লইয়া আলোচনায় রত ছিলেন বলিয়া রাশিয়া পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত নিরোধকল্পে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার জটিলতা

পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত নিরোধকরণ চুক্তি রাশিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের সহিত সামরিক জোটবদ্ধ দেশগুলিকে কোনপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য না করে বা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বা বোমা প্রস্তুতের তথ্যাদি দিয়া সাহায্য না করে সেজন্য একটি চুক্তির খসড়া লইয়া আলোচনা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র NATO-এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পারমাণবিক অস্ত্রাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে রাজী না হওয়ায় রাশিয়া এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। পর বৎসরও এই আলোচনা চলিতে থাকে এবং রাশিয়ার আপত্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তির খসড়ার কতক পরিবর্তন করা হয়। এদিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুতের ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হইবার কারণ

বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনিভা শহরে এক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ মোট আঠারটি রাষ্ট্র উহাতে যোগদান করে এবং পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার (Proliferation of nuclear weapons) রোধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের এক প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও প্রায় দশটি দেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতে সমর্থ এই আশংকাও প্রকাশ করা হয়। এই প্রস্তাবে সেইহেতু নূতন কোন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত বন্ধ করা, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সেগুলির প্রস্তুতির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে আরও কার্যকরী ও শক্তিশালী করিয়া তোলা প্রভৃতি প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের প্রস্তাবের মূল সূত্র ছিল।

জেনিভা সম্মেলন (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)

প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের প্রস্তাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে নূতনভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার অর্থই হইবে সেই দেশের জনসাধারণের খাদ্যের বিনিময়ে মারণাস্ত্র প্রস্তুত করা। অর্থাৎ দরিদ্র দেশ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিলে জনসাধারণের নিম্নতম প্রয়োজন মিটানও এই সকল দেশের পক্ষে সম্ভব হইবে না। অথচ অপরাপর দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের আওতায় থাকিবে, কিন্তু নিজেরা সেই সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিবে না এইরূপ পরিস্থিতি যেমন অবাস্তব তেমনি সমর্থনের অযোগ্য।

প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের যুক্তি

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফ্রান্সের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং ঐ বৎসরেই (শেষদিকে) চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পারমাণবিক নিক্ষেপক স্থাপন ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। এমতাবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের কার্যের কোন অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। অবশ্য চীনের সর্বশেষ বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে প্রেসিডেণ্ট্ জনসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, এশিয়ার কোন রাষ্ট্র পারমাণবিক আক্রমণের সম্মুখীন হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে। যাহা হউক, ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের নির্ভরশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা মোটেই অভিপ্রেত নহে।

চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ

প্রেসিডেণ্ট্ জনসনের ঘোষণা

আন্তর্জাতিক সংস্থার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিলেও যে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান ঘটিবে তাহা বলা যায় না, কারণ চীনের ন্যায় দেশ যদি আন্তর্জাতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহা হইলে নিরস্ত্রীকরণের আশা দুরাশায় পরিণত হইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে চীনকে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদভুক্ত করিবার যুক্তি স্বভাবতই জোর হইয়া উঠে। ইদানিং চীনকে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিবার ফলস্বরূপ চীনকে কুয়োমিংতাং চীনের পরিবর্তে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সদস্যপদে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত

যাহা হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুতির প্রসার নিষিদ্ধ-করণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত যে-সকল বিষয় লইয়া মতানৈক্য ঘটিতেছিল সেগুলি বাদ দিয়া এক চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সম্মুখে আগস্ট মাসের ২৪ তারিখে (১৯৬৭) এই খসড়া উপস্থিত করে। কিন্তু এই শর্তাদি অপরাপর দেশের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ এই চুক্তির খসড়ায় (১) পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বা সেগুলি নির্মাণ-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কোনপ্রকার তথ্য যে সকল দেশ এখনও পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুতে সমর্থ হয় নাই সেই সকল রাষ্ট্রকে সরবরাহ করিবে না। (২) পারমাণবিক শক্তি যে সকল দেশ প্রস্তুত করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই সেই সকল দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইবে যে, তাহারা অপর কোন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হইতে কোনপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে না, অথবা পারমাণবিক বোমা বা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবে না। (৩) শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পারমাণবিক গবেষণা কার্যাদি সকল দেশ অবশ্য চালাইতে পারিবে।

পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বা বোমাপ্রস্তুত প্রসার নিরোধ চুক্তি

বলা বাহুল্য উপরি-উক্ত চুক্তি ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং পারমাণবিক শক্তিহীন দেশসমূহের পারমাণবিক শক্তিধর দেশের আক্রমণ হইতে প্রতিরক্ষা প্রভৃতির কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকিলে ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশের পক্ষে এই চুক্তি মানিয়া লইয়া নিজের

ভারত, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের পক্ষে চুক্তি গ্রহণের বাধা

হস্তপদ বাঁধিয়া রাখা ঠিক হইবে না। তদুপরি সার্বভৌমত্বের দিক দিয়া এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করা অনুচিত।

পারমাণবিক শক্তি প্রসার নিরোধ চুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নহে দেখিয়া রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার শর্তগুলির সামান্য পরিবর্তন করিয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের পরও এই চুক্তি পারমাণবিক শক্তিহীন দেশগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের সন্নিকটে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবসম্পন্ন চীন ও চীনের দোসর পাকিস্তানের বিদ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগাইয়া অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনবোধে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। এমতাবস্থায় ভারত এই চুক্তি গ্রহণ করিতে পারে না।

পরিবর্তিত চুক্তি ভারতের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য নহে

ইদানিং (জুন, ১৯৬৮) ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ ভোটাধিক্যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্প্রসারণ নিরোধ চুক্তি অনুমোদন করিয়াছে। অবশ্য যে-সকল দেশের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নাই সেই দেশগুলির উপর পারমাণবিক কোন আক্রমণ ঘটিলে রাশিয়া, আমেরিকা—যে-সকল দেশ পারমাণবিক শক্তিধর সেই সকল দেশ সর্বপ্রকার সাহায্য দানে অগ্রসর হইবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতের পক্ষে এই ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করা সমীচীন হইবে বলিয়া ভারতবাসী মনে করে না। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্প্রসারণ নিরোধ চুক্তি চীন এবং রুশ-মার্কিন শক্তিবর্গকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় প্রাধান্য দান করিয়াছে। তথাপি এই নিরোধ চুক্তির সপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই পারমাণবিক শক্তিধর হইলে পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পাইবে। এদিক দিয়া এই নিরোধ চুক্তি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা এক অত্যধিক জটিল সমস্যা। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মানসিক পরিবর্তন না ঘটিলে এবং জগতের জনসাধারণের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতনতা না জন্মিলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান সহজ হইবে না।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ তথা শান্তি সুদূর-পরাহত

ইওরোপীয় সংহতি (European: Integration) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে ভবিষ্যৎ পুনরুজ্জীবন ও নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থা যাহা ঘটিয়াছিল সেগুলিকে পুনরায় গঠন করিয়া তোলা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু থাকা অবস্থায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, লাক্সেমবুর্গ, বেনেলাক্স* শুল্ক চুক্তি (Benelux Customs Convention) নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই শুল্ক চুক্তি অবশ্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্যকরী হয়। একাধিক রাষ্ট্র সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের সম-স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বেনেলাক্স শুল্ক চুক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের বিশেষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইলে ইওরোপের অপরাপর দেশসমূহের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। বেনেলাক্স শুল্ক চুক্তি উহারই পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে।

ইওরোপীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা

বেনেলাক্স শুল্ক চুক্তি (১৯৪৪)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ডানকার্ক মিত্রতাচুক্তি (Dunkirk Treaty of Alliance) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স সর্ববিষয়ে পরস্পর সাহায্য-সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের এই ধরনের চুক্তি ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কর্তৃক পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এ চার্টার বা সনন্দের ৫২ নং ধারায় এই ধরনের আঞ্চলিক সঙ্ঘবদ্ধতা স্বীকৃত ছিল। স্বভাবতই ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার জন্য আঞ্চলিক চুক্তি স্বাক্ষরে প্রবৃত্ত হইল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বেনেলাক্স চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ ব্রাসেল্স্ চুক্তি (Brussels Treaty) নামে অপর এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির

ডানকার্ক মিত্রতাচুক্তি (১৯৪৭)

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কর্তৃক আঞ্চলিক সংঘবদ্ধতা স্বীকৃত

---

*Benelux = Belgium (Be), Netherlands (Ne), Luxembourg (Lux) = Benelux.

শর্তানুসারে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি অর্থাৎ, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, লাক্সেমবুর্গ—পরস্পর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য-সহায়তা দানে পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল।

ব্রাসেল্‌স্ চুক্তি (১৯৪৮)

ঐ বৎসরই (১৯৪৮) Organisation for European Economic Co-operation (O. E. E. C.) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইল। ইহার কর্মকেন্দ্র হইল প্যারিস। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হইল নিজেদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মান (Standard) অপরিবর্তিত রাখা, শিল্পগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা, কৃষি উৎপাদনকে বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নত করা, বেকার সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মুদ্রাব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা যাহাতে থাকে সেই ব্যবস্থা করা। এই সংস্থা ইওরোপীয় দেশসমূহের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে কতক সাহায্য করিয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য। ইওরোপীয় দেশসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের সুবিধার জন্য এই সংস্থা European Payments Union (E. P. U.) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইওরোপীয় দেশসমূহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত O. E. E. C-এ অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড, ইতালি, নরওয়ে, পোর্তুগাল, সুইডেন, লাক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ট্রিয়েস্ট্, তুরস্ক ও ব্রিটেন সদস্য হিসাবে যোগদান করে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সংস্থার সহায়ক সদস্য হিসাবে যোগদানের অনুমতি লাভ করে।

O. E. E. C. ও উহার উদ্দেশ্য

O. E. E. C.-এর কার্যকারিতা

১৯৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সদস্যবর্গ

এইভাবে ইওরোপীয় দেশসমূহের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথাও উঠিল। ফলে, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটন শহরে North Atlantic Treaty Organisation (NATO) নামে একটি সামরিক সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। ইওরোপীয় সংহতির উদ্দেশ্যে গঠিত হইলেও এই সঙ্ঘ খুবই ব্যাপকতা লাভ করিল। এই সঙ্ঘে ব্রিটেন, ফ্রান্স্, বেলজিয়াম, ইতালি, আইসল্যাণ্ড,

NATO সঙ্ঘ স্থাপন (১৯৪৯)

লাক্সেমবুর্গ, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, পোর্তুগাল ভিন্ন কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করিল। পরে তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি দেশও ইঁহাতে যোগদান করিয়াছে। এই সঙ্ঘটি একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সঙ্ঘ। পরস্পর পরস্পরকে বহিরাক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার এবং বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে একে অপরকে সামরিক সাহায্য দান করিবার প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এই চুক্তি দ্বারা দিয়াছে। সমগ্র উত্তর-অতলান্তিক (North Atlantic) অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সঙ্ঘবদ্ধ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।

সদস্যরাষ্ট্রসমূহ

উদ্দেশ্য

ঐ বৎসর (১৯৪৯) 'কাউন্সিল অব ইউরোপ' (Council of Europe) নামে অপর একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। NATO'র সদস্যবর্গকে লইয়াই এই কাউন্সিল গঠিত হয়, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও পোর্তুগাল এই সংস্থার সদস্যপদভুক্ত হয় নাই। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই এই সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছিল, সামাজিক নিরাপত্তা এই সংস্থার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত ছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, NATO যেমন সামরিক নিরাপত্তা ও সামরিক নিরাপত্তা-বিষয়ক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত, তেমনি Council of Europe ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত। স্বভাবতই এই দুইটি সংস্থা—NATO ও Council of Europe ছিল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। Council of Europe-এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি Committee of Ministers ও একটি Consultative Assembly স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন স্ট্রাসবুর্গ শহরে এই সংস্থার একটি দপ্তরও স্থাপিত হইয়াছে। এই সংস্থা ইওরোপীয় দেশসমূহকে ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে একথা বলা চলে না। তথাপি সংহতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত এবং সংহতির প্রয়োজনীতার স্বীকৃতি হিসাবে এই সংস্থার পরোক্ষ প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

Council of Europe (১৯৪৯): উদ্দেশ্য

Council of Europe-এর সংগঠন ও কার্যকারিতা

ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সংহতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুম্যান রচিত 'সুম্যান প্রকল্প' (Schuman Plan) যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সুম্যান প্রকল্পের ভিত্তিতে European Coal and

Steel Community=E. C. S. C. স্থাপিত হয়। বেল্‌জিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্‌, লাক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম-জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্য হয়। এই সংস্থার 'উদ্দেশ্য ছিল কয়লা ও ইস্পাতের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে কোন-প্রকার আমদানি বা রপ্তানি শুল্ক স্থাপন, অথবা কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর এই সকল উদ্দেশ্য যাহাতে কার্যকরী হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। চুক্তিভঙ্গকারী দেশকে জরিমানা করিবার ক্ষমতাও এই পরিষদকে দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন মোট ৭৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সাধারণ সভাকে কার্যনির্বাহক পরিষদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা করিবার এবং উহার সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। Council of Ministers বা মন্ত্রিসভা নামে একটি ক্ষুদ্র পরিষদের উপর কার্যনির্বাহক পরিষদ ও সদস্যরাষ্ট্রবর্গের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের কাজ দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Consultative Committee)-এর উপর কয়লা ও ইস্পাতের উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যনির্বাহক পরিষদকে উপদেশ দানের ভার অর্পণ করা হয়। E. C. S. C.-এর প্রধান কর্মকেন্দ্র হইল লাক্সেমবুর্গ শহর। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কয়লা ও ইস্পাতের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় ঐক্যবদ্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র E. C. S. C.-এর সদস্য না হইয়াও উহার সহিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যদূত নিয়োগ করিয়াছে।

E. C. S. C. :
উহার সদস্যবর্গ :
উদ্দেশ্য
কার্যনির্বাহক
সাধারণ সভা
মন্ত্রিসভা
উপদেষ্টা পরিষদ

ইওরোপীয় সংহতির ব্যাপারে সামরিক নিরাপত্তার সমস্যাই যে অন্যতম প্রধান ইহা E. C. S. C.-র ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের এক প্রস্তাব হইতেই উপলব্ধি করা যায়। ঐ বৎসর E. C. S. C.-এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহ প্যারিস নগরীতে সমবেত হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের জন্য একটি সামরিক নিরাপত্তার সংস্থা স্থাপন করে। ইহা European Defence Community (E. D. C.) নামে পরিচিত। এই সংস্থাটি NATO-এর অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সকল সদস্যরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য লইয়া একটি

যুগ্ম সেনাবাহিনী গঠন করা হইবে স্থির হয়। এই নূতন সংস্থার শর্তানুসারে কোন সদস্যরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বিশেষ দায়িত্ব পালন কিংবা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পৌঁছিতে হয় এরূপ রাজ্যাংশের রক্ষণাবেক্ষণের অথবা কোন আন্তর্জাতিক মিশন-এর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য ভিন্ন নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী রাখিবে না। E. D. C.-এর যুগ্ম সেনাবাহিনীর পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতি একইরূপ হইবে। সদস্যরাষ্ট্রবর্গের সম্মতি লইয়া নয়জন সদস্যের এক Commissariat—E. D. C.-এর কার্যনির্বাহক পরিষদের কাজ করিবে। সদস্যরাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি মন্ত্রণাসভা বা Council of Ministers E. D. C.-এর নীতি নির্ধারণ করিবে এবং Commissariat-কে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ দান করিবে। কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হইলে উহার বিচারের জন্য একটি বিচারালয়ও স্থাপিত হইবে। E. C. S. C.-এর সাধারণ সভা E. D. C.-এর কার্যকলাপের সমালোচনা করিবে, নূতন কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে পরামর্শ দিবে এবং E. D. C.-এর বাজেট পাস করিবে। এমন কি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সমর্থিত হইলে E. D. C. পরিচালনার নিন্দাসূচক প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে পারিবে।

E. D. C.

E. D. C.-এর শর্তাদি

E. D. C. পরিচালন-ব্যবস্থা

E. D. C.-এর মূল উদ্দেশ্য হইল ঐক্যবদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রবর্গের নিরাপত্তা বিধান করা। ঐক্যবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থা এবং যুগ্ম সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালন করিতে সর্বপ্রথমই প্রয়োজন একই প্রকার পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করা। কিন্তু পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে E. C. S. C. তথা E. D. C.-এর সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। ফলে E. D. C.-এর উদ্দেশ্য সাফল্য লাভের প্রধান বাধাই দূরীভূত হয় নাই। ইহা ভিন্ন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে E. C. S. C.-এর সাধারণ সভাকে European Political Community (E. P. C.) নামে আরও একটি সংস্থার গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কার্যকরী করা এযাবৎ সম্ভব হয় নাই।

একই প্রকার পররাষ্ট্র-নীতির অভাবে E. D. C.-এর উদ্দেশ্যের সাফল্যলাভে বাধা

E. P. C.

ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সংহতি বা ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি

গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, E. C. S. C. ভিন্ন অপরাপর সংশ্লিষ্ট সংস্থা তেমন কার্যকরী হয় নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। NATO-এর দিক্ দিয়া বিচার করিলে একথা উল্লেখ করিতে হইবে যে, NATO-কে যথাযথভাবে কার্যকরী করিতে হইলে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের সমতা, আণবিক মারণাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সদস্য-রাষ্ট্র মাত্রকেই দান করা, একটি স্থায়ী NATO সামরিক বাহিনী গঠন করা, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল মেয়াদী সামরিক পরিকল্পনা রচনা প্রভৃতি নানাপ্রকার সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই সকল দিক দিয়া পূর্ণমাত্রায় ঐক্যবদ্ধতা এযাবৎ সৃষ্টি হয় নাই।

ইওরোপীয় সংহতির সমস্যা

NATO-এর অসুবিধা বা সমস্যা

একমাত্র E. C. S. C. বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অর্থ নৈতিক সংস্থার সাফল্য সামরিক ঐক্যবদ্ধতার দিকে সদস্যরাষ্ট্রবর্গকে স্বভাবতই অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিল। E. D. C. এই ঐক্যবদ্ধতার ইচ্ছারই প্রকাশ। অবশ্য ইহা NATO-এর অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হইবে স্থির হয়। কিন্তু E. D. C.-এর আদর্শ সফল করিয়া তুলিতে পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে যতদূর একতার প্রয়োজন ততদূর একতা এযাবৎ গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। European Political Community গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে হয়ত এই উদ্দেশ্য সফল করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে এযাবৎ খুব বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধোত্তর যুগের দুরবস্থা ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে একইভাবে ভাবিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী কোন কালে এইরূপ ভাবধারার ঐক্য ইওরোপে পরিলক্ষিত হয় নাই।

E. C. S. C.-এর সাফল্য

E. D. C.-র সাফল্যের পথে বাধা

E. D. C. পরিকল্পনা ঐক্যবদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

সম্পূর্ণ সাফল্যলাভে সমর্থ না হইলেও ইওরোপীয় সংহতি বহুদূর অগ্রসর

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ৫২ নং ধারায় আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রজোট গঠনের সম্মতি রহিয়াছে। কিন্তু এই ধরনের রাষ্ট্রজোট গঠন ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর গুরুত্ব যে কতকটা হ্রাস করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। E. D. C.-এর গঠনতন্ত্র আলোচনা করিলে উহাই যেন একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনাইটেড্

উপসংহার

ন্যাশন্‌স্ বলিয়া মনে হয়। সর্বজাগতিক সংহতির দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা সার্থক হওয়া কতদূর কাম্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

আঙ্ক্‌টাড্ (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development): ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত আট্‌লান্টিক চার্টারের উপর ভিত্তি করিয়া 'আঙ্ক্‌টাড্' অর্থাৎ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন সর্বপ্রথম ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ হইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত জেনিভা শহরে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। আটলান্টিক চার্টারের শর্তগুলির অন্যতম ছিল ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিজয়ী-বিজিত রাষ্ট্র-নির্বিশেষে এই চার্টার বা সনন্দে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, কাঁচামালের সরবরাহ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক যোগা-যোগের মাধ্যমে মানবজাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

আঙ্ক্‌টাড্-এর উৎপত্তি

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে। মোট ১৯টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লণ্ডন এবং পর বৎসর (১৯৪৭) এপ্রিল মাসে জেনিভা শহরে এই কমিটির অধিবেশন বসে। জেনিভা শহরে এই কমিটি General Agreement on Tariff and Trade (GATT) নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হয়। তখন সকল দেশের প্রতিনিধিই আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি শুল্ক ও বাণিজ্য চুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু GATT ধনী দেশগুলির একটি ক্লাবে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। ফলে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা (Economic and Social Council) এক প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে, পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং উন্নয়ন দেশগুলির উহাতে অংশ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। ইহা ভিন্ন অনুন্নত দেশসমূহ এবং উন্নত দেশসমূহের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা

GATT

উন্নত ও অনুন্নত দেশের পার্থক্য না রাখিবার প্রস্তাব

সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পক্ষে অনুচিত, এই নীতিও গৃহীত হয়।

উপরি-উক্ত নূতন নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে একটি **Committee on Trade and Development**, অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি GATT-এর অধীনে গঠিত হয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ হইতে ১৫ই জুন জেনিভা শহরে UNCTAD-এর প্রথম সম্মেলন বসে।

Committee on Trade and Development

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা যথা, প্রস্তুত দ্রব্য, কাঁচামাল, অঞ্চল হিসাবে অর্থনৈতিক জোটবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আর্থিক প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

UNCTAD I : ১৯৬৪ : জেনিভা

আঙ্ক্‌টাডের প্রথম সম্মেলনে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রস্তুত হইবে, এই আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত সেই আশা তাঁহাদের পূর্ণ হয় নাই। তথাপি এই সম্মেলনে মোট ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নত দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোন কোন দেশকে **most favoured nation** বলিয়া বিবেচনা করিয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান যুগধর্ম-বিরোধী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের মোট পরিমাণের পার্থক্য দূর করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। উন্নত দেশসমূহের ক্ষতি না ঘটাইয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার নীতিও স্বীকৃত হইয়াছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রস্তুত সামগ্রী যাহাতে উন্নত দেশসমূহের বাজারে স্থান পায় সেজন্য বর্তমান অসুবিধা দূর করিতে হইবে। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আঙ্ক্‌টাড্‌-১ অর্থাৎ প্রথম আঙ্ক্‌টাড্‌ ধনী ও দরিদ্র দেশসমূহের পরস্পর মিলিবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উন্নত দেশগুলির আভিজাত্য এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি একটা পরোক্ষ বিরোধিতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা প্রথম আঙ্ক্‌টাড্‌-এর পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

UNCTAD I-এর কার্যাদি

দ্বিতীয় আঙ্ক্টাড্ (UNCTAD II) অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে ২৯শে মার্চ (১৯৬৮) পর্যন্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য দূর করা। এজন্য সমগ্র পৃথিবীকে একটি অবিচ্ছেদ্য সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করিয়া ধনশালী দেশসমূহ যাহাতে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে অগ্রসর হয় সেই চেষ্টা করা এবং দরিদ্র দেশের প্রতি ধনশালী এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহ যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে তাহা প্রমাণ করা। এজন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের চারিটি সমস্যা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়াছিল : (১) সামগ্রী বিনিময়-সংক্রান্ত নীতি ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা, (২) শুল্ক স্থাপন ব্যাপারে দেশ এবং দেশের মধ্যে পার্থক্যের সমস্যা, (৩) সাহায্য-সহায়তার নীতি কি হইবে সেই সমস্যা এবং (৪) বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সমস্যা।

দ্বিতীয় আঙ্ক্টাড্ (UNCTAD II) ১৯৬৮

উদ্দেশ্য

সমস্যা

উন্নয়নশীল দেশসমূহ (মোট সংখ্যা ৭৭), দ্বিতীয় আঙ্ক্টাড্-এর ফলাফল সম্পর্কে প্রথমে খুবই উচ্চাশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু সমবেত দেশসমূহের ধনী দেশসমূহ, সাম্যবাদী দেশসমূহ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ—এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবার ফলে এই সম্মেলন প্রথম হইতেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন উন্নত দেশগুলি সেই সময়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, পাউণ্ড, স্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস, ব্রিটেনের ইওরোপীয় সাধারণ বাজারে (ECM) প্রবেশের চেষ্টা প্রভৃতির ফলে এই সম্মেলনে পূর্ণমাত্রায় মনোনিবেশের পরিস্থিতিতে ছিল না। ইহা ভিন্ন পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর বিরোধও দ্বিতীয় আঙ্ক্টাড্-এর বিফলতার জন্য দায়ী ছিল। ফ্রান্স ছিল ইংলণ্ডের বিরোধী; ফ্রান্স আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশসমূহের প্রশ্ন ও সমস্যা উত্থাপন করিয়া উন্নয়নশীল ৭৭টি রাষ্ট্রের সংহতি বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই ৭৭টি রাষ্ট্রের সংহতি বিনাশ করা অবশ্য সম্ভব নয় নাই। কাহারো কাহারো মতে আঙ্ক্টাড্-এর কার্যসূচী যেমন ছিল সুদীর্ঘ তেমনি ছিল সমস্যাসঙ্কুল। এজন্যই ইহার বিফলতা ঘটিয়াছিল। বস্তুত, এই সম্মেলন ধনী এবং দরিদ্র দেশের ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হইয়াছিল। উন্নয়নশীল দেশসমূহ ট্রেড্ ইউনিয়নের ন্যায় উন্নত দেশসমূহের উপর চাপ দিয়া নানাপ্রকার সুযোগ-

ফলাফল সম্পর্কে উচ্চাশা

বিফলতা

বিফলতার কারণ

সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাও এই সম্মেলনের বিফলতার জন্য দায়ী ছিল।

তথাপি একথা স্বীকার্য যে, দ্বিতীয় আঙ্কটাড্ (UNCTAD II) দরিদ্র দেশসমূহকে আরও অধিক মাত্রায় সংঘবদ্ধ করিয়াছিল। ধনী দেশসমূহ দরিদ্র দেশগুলির এই সংহতির ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এজন্য আলজিরিয়া উত্থাপিত দাবীসমূহ (Charter of Demands) ধনী দেশগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারে নাই এবং কতক পরিবর্তন করিয়া এই দাবী-সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে যে মত-পার্থক্য ছিল তাহা অনেক পরিমাণে এই সম্মেলনে দূরীভূত হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্ দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নানাপ্রকার বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের দিকে টানিতে সমর্থ হওয়াতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আঙ্কটাড্-এর তুলনায় তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।

সাফল্যের পরিমাণ

সাফল্যের পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বিতীয় আঙ্কটাড্ অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কোন নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যের অবসানের পরিকল্পনা এই সম্মেলনে এতটুকুও কার্যকরী হয় নাই।

উপসংহার

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গসমূহ

(Current Topics)

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি ও উহার আন্তর্জাতিক ফলাফল (Policy of Apartheid in South Africa : Its International Effects) : দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে **Afrikaner Nationalist** নামক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হয়। ডক্টর ড্যানিয়েল ম্যালান প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে **Apartheid** অর্থাৎ শ্বেতকায় ও কৃষ্ণবর্ণ লোকদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণ করেন। কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকাবাসিগণকে শিক্ষা-দীক্ষায় অপাংক্তেয় রাখিয়া তাহাদিগকে দৈহিক শ্রমের কাজ করান হয়। কল-কারখানায় প্রধানত মজুর ও কারিগর হিসাবে তাহারা কাজ করে। ফলে, কারখানা অঞ্চলেই তাহাদিগকে বসবাস করিতে হয়। শহরাঞ্চলে কারখানা অবস্থিত, কিন্তু শহরের যে-কোন অঞ্চলে বসবাস করিবার অধিকার কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের নাই। কেবলমাত্র আফ্রিকার আদিবাসী কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গ নহে, ভারতীয়, পাকিস্তানী তথা যে-কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকেই শহরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, শ্বেতকায় ব্যক্তিবর্গের বাসস্থান হইতে দূরে পৃথক স্থানে বসবাস করিতে হয়। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের বাসস্থানের অঞ্চলগুলিতে নাগরিক জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পল্লীতে তাহাদিগকে বাস করিতে হয়। শ্বেতকায়দের বাসস্থানের সহিত কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের বাসস্থানের কোন তুলনাই করা চলে না। শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনপ্রকার বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ। নূতন নূতন শহর গঠন করিয়া কেবল শ্বেতকায়-দিগকেই সেই সকল শহরে বসবাসের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রেজিস্ট্রেশন

ম্যালান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি

কৃষ্ণকায়দের প্রতি অবিচার

Apartheid বা পৃথকীকরণ নীতি

শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য

আইন পাস করিয়া কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে এবং পরিচয়পত্র বহন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সভা-সমিতি বা অপরাপর কোনপ্রকার অনুষ্ঠানে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়দের সম্মিলিত করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বপ্রকারে কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেত-কায়দের প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকায়দের ভোটে শ্বেতকায় তিনজন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ণসঙ্করদেরও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার নাকচ করা হইয়াছে (১৯৫৫)। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ভেরউড্ প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিলে ম্যালান-প্রবর্তিত বর্ণ বৈষম্য নীতি পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণকে ক্রীতদাস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দানের কোনও কল্পনা দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়গণ করিতে পারে না।

কৃষ্ণকায়দের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দমন-মূলক আইনের প্রচলন

এইভাবে বর্ণবৈষম্য নীতি ক্রমে অমানুষিক নির্যাতনে পরিণত হইতে থাকিলে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সার্পেভাইল নামক স্থানে কৃষ্ণকায়গণ এক প্রতিবাদ সভায় সমবেত হইলে ভেরউড্ সরকার সেই সভায় নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। পুলিশের গুলিতে স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধসহ ৬৭ জন সভাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা আফ্রিকার নূতন জালিয়ানওয়ালাবাগের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে, বলা যাইতে পারে।

ভেরউড্ সরকারের অত্যাচার

এদিকে কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র হইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের উপর অত্যাচার কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর অপরাপর রাষ্ট্র এবং উদারনৈতিক ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রকাশ্য নিন্দার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে, কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর অপরাপর সদস্যের সহিত ভেরউড্-এর তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এই সূত্রে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রকে কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয় (১৯৬১)। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়গণ ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ভেরউড্‌কেই পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হইবার সুযোগ দিয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমন্‌ওয়েল্‌থ ত্যাগ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এ দক্ষিণ-আফ্রিকার এই অমানুষিক ও দমনমূলক বর্ণবৈষম্য

নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের এই নীতির তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্স্ হইতে প্রাপ্ত ম্যাণ্ডেট অঞ্চল ত্যাগ করিতে জানান হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর এই নির্দেশ অমান্য করিয়া চলিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ কর্তৃক দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র নিন্দাবাদ

এই সকল সমালোচনা ও নিন্দাবাদ এবং অর্থনৈতিক অসহযোগ সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকা নিজ নীতি অপ্রতিহতভাবে চালাইয়া যাইতে দ্বিধা করিতেছে না।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের দমন-নীতি অপ্রতিহত

দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতি ভারতবাসী তথা ভারত সরকারের স্বভাবতই স্বার্থবিরোধী ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য নাটাল সরকারের সহিত ১৮৬০ ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার সেই দেশে শ্রমিক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারও এই চুক্তি অনুমোদন করিয়াছিলেন, কারণ ভারত তখন ব্রিটিশের অধীন ছিল। নাটাল দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পর ক্রমেই ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইতে থাকে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেপটাউন চুক্তি (**Cape Town Agreement**) দ্বারা দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দান করেন। কিন্তু ইহা কেবল কাগজে-কলমেই রহিয়া গেল, বস্তুত ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটিল না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে **Asiatic Land Tenure Act** ও **Indian Representation Act** দ্বারা ভারতীয়দের জমি ভোগ-দখল এবং ভোটাধিকার সম্পর্কে ঘোর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে ভারত সরকার ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্যাদি মানব-অধিকার (**Human Rights**) বিরোধী বলিয়া অভিযোগ করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া দীর্ঘ বাদানুবাদের পর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ একটি **Ad Hoc Political Committee** নিয়োগ করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধ

ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র

কেপটাউন চুক্তি

Asiatic Land Tenure ও Indian Representation আইন

Ad Hoc Political Committee

জানাইল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সেই কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাকে জাতিগত বৈষম্য-নীতি ত্যাগ করিতে এবং মানব-অধিকার স্বীকার করিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইয়া সাধারণ সভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তগত করা হইতেছে বলিয়া এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল।

কমিটি রিপোর্ট

ইহার পর আফ্রোশীয় দেশসমূহ দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে মানব-অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ পেশ করিলে এবিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইল (১৯৫২)। একটি পৃথক প্রস্তাবে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে মানব-অধিকারসমূহ মানিয়া চলিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। কমিশনের পর পর তিনটি রিপোর্টে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে মানব-অধিকার ভঙ্গের এমন কি, 'ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সনন্দের কয়েকটি শর্ত' লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করা হইল। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ দক্ষিণ-আফ্রিকার অধীনে অছি পরিষদ (Trusteeship Council) যে সকল স্থান স্থাপন করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিল। ইহাতেও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে কোনভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হইল না। বর্ণবৈষম্য নীতি ও পৃথকীকরণ নীতি (Policy of Apartheid) দক্ষিণ-আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এই অজুহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নির্দেশ অমান্য করিলেন। অছি পরিষদ যে-সকল স্থান দক্ষিণ-আফ্রিকার অভিভাবকত্বাধীনে স্থাপন করিয়াছিল সেগুলিও ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে আফ্রোশীয় দেশসমূহের অভিযোগ

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ নিযুক্ত কমিটি রিপোর্ট

দক্ষিণ-আফ্রিকা কর্তৃক ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নির্দেশ অবমাননা

এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গের নেতা প্রধানমন্ত্রী ভেরউড্ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচারকে এক শিল্পকলায় (art) পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করিবার জন্য সমবেত কৃষ্ণকায়দের উপর ভেরউড্-এর আদেশে গুলি চালনা করা হইয়াছিল (১৯৬০)। কৃষ্ণকায় বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা-বাসী ভারতীয়গণও শ্বেতাঙ্গ অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই। ভারতীয়গণও (বর্তমানে ভারতীয় ও পাকিস্তানী) দীর্ঘকাল পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে কর্মব্যপদেশে গিয়াছিল।

শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র কৃষ্ণকায় জনতার উপর গুলিবর্ষণ

ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের উপর অত্যাচার

তাহাদের অনেকে এখন দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু ভেরউড্ সরকার ভারতীয় ও পাকিস্তানীদিগকেও রেহাই দেয় নাই। ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয়। কমন্‌ওয়েলথ্ প্রধানমন্ত্রিসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য ও কৃষ্ণকায়দিগকে পৃথক অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও সমালোচনা করা হয়। ফলে, দক্ষিণ-আফ্রিকা কমন্‌ওয়েলথ্ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে (১৯৬১)। তথাপি কৃষ্ণকায়দের উপর অত্যাচারী নীতি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারত-পাক সম্পর্কে তিক্ততা: দক্ষিণ-আফ্রিকার কমন্‌ওয়েলথ্ ত্যাগ

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনের অত্যাচারী রূপ ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত কতকগুলি আইন হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্নাংশের জনসমাজের সোচ্চার ঘৃণা ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসী ও ভারতীয়দের পৃথকীকরণ নীতির (Apartheid) কঠোরতর-ভাবে প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভাতীয়দের শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন (Indian Education Bill) এবং পৃথক নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনের প্রবর্তন (Separate Representation of Votes Amendment Bill) কৃষ্ণকায়দের পৃথক এবং নিম্নপর্যায়ের মানুষ হিসাবে বিবেচনার আরও দুইটি উদাহরণ।

পৃথকীকরণ ও শ্রেণী-বৈষম্যের আরও উদাহরণ

কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই ধরনের পৃথকীকরণ ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ভেরউড্‌কে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর জাফেণ্ডাস্ (Tsafendas) নামে জনৈক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। হত্যার কারণ হিসাবে জানা যায় যে, ডক্টর ভেরউড্ শ্বেতকায় দরিদ্র ব্যক্তিদের অপেক্ষা কৃষ্ণকায় দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীর জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন, এজন্য জাফেণ্ডাস্ ডক্টর ভেরউড্-এর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিল। ডক্টর ভেরউড্-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর সর্বত্রই নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তির অপরাধের মূল কারণ অনুধাবন করিলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গগণ কৃষ্ণকায়দের কিভাবে দেখে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ডক্টর ভেরউড্ হত্যা

ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পুনরায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করে। ইহাতে বলা হয় যে, বর্ণবৈষম্য ও পৃথকীকরণ নীতি 'মানব-অধিকার' বিরোধী এবং নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ-আফ্রিকা এই বর্ণবৈষম্য নীতি যাহাতে ত্যাগ করে সেজন্য যথাবিহিত করিতে অনুরোধ জানান হয়। যে সকল রাষ্ট্র দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অপর কোনপ্রকার অর্থনৈতিক আদান-প্রদান তখনও করিতেছিল সেগুলির প্রতিও নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ককে (International Bank) আফ্রিকা যাহাতে কোনপ্রকার আর্থিক বা কারিগরী সাহায্য না পাইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হয়। ইহা ভিন্ন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জনসমাজ যাহাতে তাহাদের নায্য অধিকার লাভ করে সেজন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক—সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রস্তাব পাস করিবার পশ্চাতে আফ্রোশীয় রাষ্ট্রসমূহই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার তিনদিন পর (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭) দক্ষিণ-আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার (South-West Africa) উপর যে বে-আইনী অধিকার তখনও আঁকড়াইয়া রহিয়াছিল উহার নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপর দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিকার অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ কর্তৃক দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের নিন্দা

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সরকার এখনও তাহাদের অন্যায়মূলক বর্ণবৈষম্য নীতি ও পৃথকীকরণ নীতি (Apartheid) পূর্ণমাত্রায় চালাইয়া যাইতেছেন। তথাকার কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করিয়া দীর্ঘকাল তাহাদের উপর অন্যায়-অবিচার করা যে সম্ভব নহে, ইহা বলা বাহুল্য।

শ্বেতাঙ্গ শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার দুরাশা

দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার প্রস্তাব পাস করিয়াও ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর অধিকাংশ সদস্য দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহার জাতিগত বৈষম্য ও মানব-অধিকার-বিরোধী—এজন্য ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর আদর্শ-বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু

জাতিগত বৈষম্যনীতি ও মানব-অধিকার অস্বীকার-এর জন্য ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর আদর্শ ক্ষুণ্ণ

দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র এবিষয়ে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর ক্ষমতা অস্বীকার করিয়াছে এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই বলিয়া নিজ বৈষম্যমূলক নীতি অপরিবর্তিত রাখিয়াছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত ও পাকিস্তানের স্বার্থ এই ব্যাপারে সমভাবে জড়িত। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত এই দুই দেশের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই, ব্যবসায়-বাণিজ্যও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।

ভারতের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্পর্ক নাশ

মালয়েশিয়া (Malaysia): ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রির পর মালয়েশিয়া ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। এই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য-গুলি হইল মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক ও উত্তর-বোর্ণিও বা সাবা। এই সকল অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালয় স্বাধীনতা লাভ করে। সিঙ্গাপুর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করে এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট সেখানেও ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়া সিঙ্গাপুর সার্বভৌম রাষ্ট্র-মর্যাদা লাভ করে। সারবাক ও সাবা (উত্তর-বোর্ণিও) ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করে। কিন্তু এই দুই দেশেও পূর্ণস্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা অপরাপর এশীয় উপনিবেশগুলির ন্যায়-ই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার এই দুইটি উপনিবেশকেও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে এই দুইটি দেশও সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদালাভ করিবে স্থির হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক ও সাবা—এই কয়েকটি দেশ হইয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমান এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনে ব্রিটেনেরও যথেষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে সাম্যবাদী চীনের আক্রমণ ও গ্রাসের পক্ষে খুবই সুবিধা হইবে এই ভয় ব্রিটেন এবং মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক, সাবা প্রভৃতি দেশেরও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পর আত্ম-রক্ষার প্রশ্নই প্রধানত মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যুক্তি ছিল। ইহা ভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারেও অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের সুযোগ-

পূর্ব-ইতিহাস

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ—মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক ও সাবা (উত্তর-বোর্ণিও)

কমিউনিষ্ট্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য মালয়েশিয়ার গঠন

সুবিধা ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল অপেক্ষা অনেক কম, বলা বাহুল্য। এদিক দিয়াও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন ছিল।

টুঙ্কু আব্দুল রহমানের প্রস্তাব

উপরি-উক্ত কারণে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমান ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক, সাবা (উত্তর-বোর্ণিও) এবং ব্রুনেই-কে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইলে এই অঞ্চলকে সাম্যবাদী চীনের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতি হইতে মুক্ত রাখা সহজতর হইবে। ইহা ভিন্ন অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়াও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। ব্রিটিশ সরকারের এবিষয়ে উৎসাহী না হইবার কারণ ছিল না, কারণ সাম্যবাদী চীনের গ্রাস হইতে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করা তাঁহাদের সমস্যা ছিল। ইহার পর ব্রিটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জনমত জানিবার চেষ্টা করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট সিঙ্গাপুরে এক গণভোট গ্রহণ করা হয়। ইহাতে সিঙ্গাপুরের অধিবাসীরা মালয়ের সহিত সংযুক্তি বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থন করে।

সিঙ্গাপুরে গণভোট—মালয়ের সহিত সংযুক্তির আগ্রহ

লণ্ডন বৈঠক (জুলাই, ৮, ১৯৬৩)

ইহার পর গত ৮ই জুলাই (১৯৬৩) লণ্ডনে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে এক বৈঠক বসে। ইহাতে স্থির হয় যে, ৩১শে জুলাই (১৯৬৩) মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর-বোর্ণিও বা সাবা, সারবাক এবং ব্রুনেই লইয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। কিন্তু ব্রুনেই এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে অসম্মতি জানায়। ফলে ব্রুনেই ব্রিটিশ-আশ্রিত রাজ্য হিসাবেই থাকিবে স্থির হয়। যাহা হউক, লণ্ডনে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে এক দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

ব্রুনেই-র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে অসম্মতি

কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপানইস্ সারবাক ও উত্তর-বোর্ণিও বা সাবা রাজ্যের মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে উত্তর-বোর্ণিওর একাংশের উপর ফিলিপাইনস্-এর দাবি ছিল। মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে ফিলিপাইনস্-এর দাবি আর কার্যকরী করা যাইবে না, এই কারণেই ফিলিপাইনস্ ইহাতে বিরোধিতা করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অধিবেশনে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাইয়াছিল, কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, পরে এই

ইন্দোনেশিয়া-ফিলি-পাইনস্-এর আপত্তি

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা শুরু করে। ৮ই জুলাই (১৯৬৩) লণ্ডনে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস্-এর তরফ হইতে বলা হয় যে, সারবাক ও সাবা (উত্তর-বোর্ণিও)-এর জনসাধারণ মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে রাজী কিনা তাহা না জানিয়া এবিষয়ে কোন কিছু করা উচিত হইবে না। আর এরূপ প্রতিশ্রুতিও এই দুই দেশকে পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর প্রতিনিধিগণ সারবাক ও সাবার জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা কি তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া জানিয়াছেন যে, সারবাক ও সাবার অধিকাংশ লোকের মত হইল মালয়েশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত যোগদান করা। ফলে, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস্-এর বাধা আর টিকিল না। এমতাবস্থায় টুঙ্কু আব্দুল রহমান ঘোষণা করিলেন যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) মধ্য রাত্রির পর মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হইবে। এই তারিখটি বাছিয়া লইবার পশ্চাতে যুক্তি হইল এই যে, ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) হইতে ব্রিটিশ সরকার সারবাক ও সাবার সার্বভৌম স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি দেশ মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে, তজ্জন্যই ১৫ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রির পর হইতে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর তত্ত্বাবধানে গণ-ভোট—সারবাক ও সাবার জনসাধারণ কর্তৃক মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন

১৫ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রির পর হইতে মালয়েশিয়ার জন্ম

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এবং পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র খুশি হইয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য দুইটি—ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস্ ইহার বাদ সাধিতেছে। ফিলিপাইনস্-এর বিরোধিতা অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতার ন্যায় ততটা তীব্র নহে। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া ত' দূরের কথা, উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, থাইল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি কর্তৃক স্বীকৃত

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন লইয়া এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া ইহার বিরোধিতা করিতে দৃঢ় সংকল্প। এই ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষেই সামরিক প্রস্তুতি চলিতে থাকে। টুঙ্কু আব্দুল রহমান কমিউনিস্ট বিরোধী।

ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতার পশ্চাতে যুক্তি

চীনের গ্রাস হইতে এবং কমিউনিস্ট্ প্রাধান্য হইতে মালয় ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ রক্ষা করাই মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়া প্রচার করিতেছে যে, মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট্গণকে বাধাদানে সমর্থ হইবে না, ফলে, উত্তর-বোর্ণিও পর্যন্ত

ব্রিটেন কর্তৃক মালয়েশিয়া রক্ষার সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ

কমিউনিস্ট্ প্রাধান্য বিস্তৃত হইলে ইন্দোনেশিয়ার সমূহ বিপদ ঘটিবে। ইন্দোনেশিয়ার এই যুক্তিতে অবশ্য কেহই তেমন বিশ্বাসী হইতে পারিতেছেন না। বিশেষভাবে, ব্রিটেনের পক্ষ হইতে ডানকান স্যাণ্ডস্ (Duncan Sandys) ঘোষণা করিয়াছেন যে, বহিরাগত কোন আক্রমণ হইতে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য দান করিবে এবং মালয়েশিয়াকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এমতাবস্থায় মালয়েশিয়া চীনা কমিউনিস্ট্দের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে না এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া মালয়েশিয়ার বিরোধিতা করা ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা

যুক্তি কাহারো নিকট গ্রহণযোগ্য হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হইয়া মালয়, সিঙ্গাপুর, সারবাক ও সাবা পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসাবে থাকিলে কমিউনিস্ট্দের আক্রমণের পক্ষে তাহা আরও সুবিধাজনক হইত, বলা বাহুল্য। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার আপত্তির পশ্চাতে প্রকৃত যুক্তি কি তাহা এখনও স্পষ্ট হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমানের মতে, চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের কালে তিনি গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে দৃঢ়তা সহকারে সমর্থন জানাইয়াছিলেন, ইহা ইন্দোনেশিয়া তথা চীনপন্থীদের মনঃপূত হয় নাই। এজন্যই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরোধী। অনেকের মতে ইন্দোনেশীয় সরকার কমিউনিস্ট্ প্রভাবাধীন, এজন্য চীনকে সন্তুষ্ট রাখা উহার পক্ষে প্রয়োজন। চীন মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী, সুতরাং ইন্দোনেশিয়া উহার বিরোধিতা করিতেছে। যাহা হউক, মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র যে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তদুপরি মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মোট এক কোটি অধিবাসীর শতকরা ৪৩ ভাগ হইল চীনা। এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও

টুঙ্কু আব্দুল রহমানের ঘোষণা

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমানের বিস্তর অসুবিধা ও অস্বস্তির কারণ আছে। অবশ্য তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রগতিশীল, সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে এবং গণতন্ত্রের এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসাবে

বিশ্বের দরবারে নিজ পরিচয় দান করিবে। বর্তমানে মালয়েশিয়া পরিস্থিতি সঙ্কটপূর্ণ বলা বাহুল্য।

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সংঘর্ষ (Malaysia-Indonesian Conflict)ঃ মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কাল হইতে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস্, বিশেষভাবে ইন্দোনেশিয়া উহার শত্রুতা সাধন করিয়া চলিয়াছে। ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণ মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। পক্ষান্তরে টুঙ্কু আব্দুল রহমান দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, মালয়েশিয়া গণতন্ত্রের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের মোকাবিলা করিবে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণ মালয়েশিয়ার পন্টিয়ান নামক স্থানে একদল ইন্দোনেশীয় গেরিলা সৈন্য প্রেরণ করেন। মালয়েশিয়ার সেনাবাহিনী ইহাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। ইহার অল্পকালের মধ্যেই (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪) ইন্দোনেশীয় প্যারাস্থট বাহিনীর ৩০ জন সৈন্য কুয়ালালামপুরের কিছু দূরে অবতরণ করে। এইভাবে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, ইন্দোনেশিয়ার সমর্থক চীনা কমিউনিস্ট্ গণ সিঙ্গাপুরের মালয়জাতির লোকদের সহিত হাঙ্গামা শুরু করে। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া টুঙ্কু আব্দুল রহমান ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট আবেদন জানান। প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত ধরনের আক্রমণ চালাইতে থাকিলেও সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই, তাহার কারণ এই যে, ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়াকে বহিরাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকারও মালয়েশিয়া রক্ষার্থে সরাসরি ইন্দোনেশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন না। তথাপি ব্রিটিশ সরকার চারিখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও কতক সৈন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে পরিস্থিতির এক নূতন পরিবর্তন ঘটিল। মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সংঘর্ষ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশ সরকারের সেনা-বাহিনী ও যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণের প্রত্যুত্তর হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণকে সমর্থন করিতে লাগিল। এদিকে কমিউনিস্ট্ চীনও মালয়েশিয়া-ইন্দো-

প্রেসিডেন্ট্ স্থকর্ণর মালয়েশিয়া ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা

টুঙ্কু আব্দুল রহমান কর্তৃক ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর নিকট আবেদন

সিঙ্গাপুরে চীনা-মালয় হাঙ্গামা

নেশিয়া সংঘর্ষের মাধ্যমে সেই অঞ্চলে চীনা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট ছিল। সুতরাং মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া চীন-সোভিয়েত-ব্রিটিশ ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইল। এই সূত্রেই ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে টুঙ্কু আব্দুল রহমানের আবেদনের ভিত্তিতে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সিকিউরিটি কাউন্সিল যখন ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব পাস করিতে চাহিল তখন রাশিয়া ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া উহা বাতিল করিয়া দিল। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইয়াছিল উহা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

চীন-সোভিয়েত-ব্রিটেন-এর ঠাণ্ডা লড়াই

সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিন্দাসূচক প্রস্তাব—রুশ ভিটো

প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভিটো' না পাওয়া গেলে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধেই প্রস্তাব পাস হইত। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া সিকিউরিটি কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হইল। [সু]কর্ণ ইহার প্রতিবাদস্বরূপ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ হইতে অপসরণ করিলেন। ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ হইতে অপসরণ করিয়া সুকর্ণ মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করিবেন বলিয়া হয়ত মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মালয়েশিয়াকে বহিরাগত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। সুকর্ণ কর্তৃক মালয়েশিয়ার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নেরও অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুত, সুকর্ণর ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্ হইতে অপসরণ রাশিয়া ভাল চক্ষে দেখে [নাই]। ইহার ফলে একমাত্র কমিউনিস্ট্ চীন খুশি হইয়াছে, কারণ ইউনাইটেড্ [ন্যা]শন্‌স্-এর আওতা হইতে বাহির হইয়া আসিবার ফলে ইন্দোনেশিয়া চীনের সমগোত্রীয় হইয়াছে। কমিউনিস্ট্ চীনের প্রভাব সেইহেতু ইন্দোনেশিয়ায় বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টার বা সনন্দ অনুসারে (Articles 3—6 কোন সদস্যরাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারের বিরোধিতার শাস্তিস্বরূপ অথবা যে সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সদস্যরাষ্ট্রকে বহিষ্কার করিতে বা সাময়িকভাবে সাস্‌পেণ্ড

[সুক]র্ণর ইউনাইটেড্ [ন্যা]শন্‌স্ ত্যাগ

[রুশ ক]র্তৃক ইন্দো-[নেশি]য়ার সমর্থন

সুকর্ণর ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ ত্যাগের আই[নগত] তাৎপর্য

(suspend) করিতে পারা যায়। লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রথম ধারায় (Art. 1) সদস্য-পদভুক্তি ও সদস্যপদ-ত্যাগের সুস্পষ্ট বিধান আছে যে, কোন সদস্যরাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবে কিন্তু সেরূপ কোন ধারা বা ব্যবস্থা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারে নাই। তথাপি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর অন্যতম ত্রুটি বা দুর্বলতা হিসাবেই একথা বলা যাইতে পারে যে, কোন সদস্যরাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া গেলে উহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নাই। আর ইহাও সত্য যে, স্বেচ্ছায় ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর সদস্য-পদভুক্ত হইতে পারা গেলে, স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করিবার পন্থাও উন্মুক্ত থাকা সমীচীন।

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর চার্টারের দুর্বলতা

ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ পরিত্যাগী প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণ ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অপর একটি 'ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্' স্থাপন করিবার আস্ফালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই কারণে কমিউনিস্ট্ চীন ও পাকিস্তানের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে আফ্রোশীয় দেশসমূহের সমর্থনলাভে সুকর্ণ অত্যধিক সচেষ্ট হইলেন। এই কারণে জুন মাসে (১৯৬৫) আল্জেরিয়া বা আলজিয়ার্স-এ যে আফ্রোশীয় রাষ্ট্র প্রতিনিধি সম্মেলন হইবার কথা ছিল তাহাতে কমিউনিস্ট্ চীন-পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়া আঁতাতের মাধ্যমে এক নূতন নেতৃত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই সম্মেলনে রাশিয়ার ও মালয়েশিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চীন ও ইন্দোনেশিয়ার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আফ্রোশীয় সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে আল্জেরিয়ার প্রেসিডেণ্ট্ বেন বেলার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় ভারতসহ বহু আফ্রোশীয় দেশ এই সম্মেলন স্থগিত রাখিবার মত প্রকাশ করে। এই সম্মেলন যাহাতে হইতে পারে সেজন্য সুকর্ণ-চু-এন-লাই-আয়ুব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয়। আফ্রোশীয় নেতৃত্ব গ্রহণে এই তিন দেশের অপচেষ্টা, তাহাদের পশ্চাতে যে সমর্থন নাই তাহা-ই প্রমাণ করিয়াছিল। ইহার পর মালয়েশিয়ার সহিত ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট্ সুকর্ণও মিটমাট করিয়া লইতে আর তেমন অনিচ্ছুক ছিলেন না। সুকর্ণর পতনের পর ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিবাদের অবসান ঘটিয়াছে।

সুকর্ণ কর্তৃক পাণ্টা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ গঠনের হুমকি

পাক-চীন-ইন্দোনেশিয়া আঁতাত

আলজিয়ার্স-এ আফ্রোশীয় সম্মেলন, জুন, ১৯৬৫

সম্মেলন পরিত্যক্ত

পাক-চীন-ইন্দোনেশিয়ার নৈতিক পরাজয়